দেশের কথা

সখারাম গণেশ দেউস্কর

পরিবেশক
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট/কলকাতা-৭৩

DESHER KATHA

by

Sakharam Ganesh Deuskar

□ প্রথম কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৭

□ প্রকাশক

সমীরণ চৌধুরী

কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা-৭৩

□ মুদ্রাকর

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২০৯এ বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

'দেশের কথা' প্রসঙ্গে

জন্মসূত্রে বাঙালী না হয়েও বাংলার জাতীয় জাগরণে এবং বাংলা সাহিত্যে যার নিঃসপত্ন অধিকার ছিল তিনি সখারাম গণেশ দেউস্কর। মারাঠী ব্রাহ্মণ গণেশ সদাশিবের পুত্র সখারামের জন্ম হয় ১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে দেওঘরে। দেওঘর দীর্ঘকাল বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চল বলে পরিচিত। কাজেই একটা বাঙালী আবহাওয়ার মধ্যে সখারাম বড় হতে থাকলেন।

শৈশবেই মাতৃবিয়োগের কারণে তাঁর পিসিমা তাঁকে লালন-পালন করেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব সখারামের জীবন গঠনে প্রাথমিক উপকরণ যুগিয়েছিল।

কৌলিক প্রথানুসারে বেদাধ্যয়নের পর তিনি দেওঘর হাই ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হন। এ সময়ে (১৮৮৯) দেওঘর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন 'মাইকেল মধুসূদনের' জীবন বৃত্তান্ত গ্রন্থের সুখ্যাত লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু। তাঁর নিকট সান্নিধ্য সখারামের সাহিত্যজীবনে এবং দেশপ্রেমোদ্দীপনে যথেষ্ট সহায়তা দান করেছিল। বস্তুত পক্ষে এখন দেওঘরে ভূজন লেখকের 'বাঙ্গালা লেখক বলিয়া অপবাদ' গড়ে উঠেছিল। যোগীন্দ্রনাথ ছাড়া ব্রাহ্মসমাজের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সে সময়ে দেওঘরে বসবাস করতেন। মনীষী রাজনারায়ণ বসু থাকতেন দেওঘরে। অল্প বয়স থেকেই সখারাম এ সব ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে সম্পদশালী হন।

সখারামের কর্মজীবন আর্থিক দিক থেকে কোনোকালেই প্রসন্ন ছিল না। তবে তা কর্মময় ছিল সন্দেহ নাই। অর্থাভাবের জন্যই প্রবেশিকা পরীক্ষার অব্যবহিত পরে তাঁকে শিক্ষকতার কাজ নিতে হয় নিজের বিদ্যালয়েই পনেরো টাকা বেতনের। অবশ্য এ সময়ের মধ্যেই (১৮৯৩) একজন লেখক হিসেবে তিনি নিজেকে পরিচিত করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তারই ফলে কলকাতার গৌরবান্বিত সাময়িক পত্রিকা 'হিতবাদী'র সঙ্গে তিনি যুক্ত হতে পেরেছিলেন। 'হিতবাদী'র সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ। পত্রিকার আপৎকালে তিনি সখারামকে সহায় হিসেবে পেয়ে বাধিত হলেন। মাত্র ত্রিশ টাকা বেতনের 'প্রুফ রিডার' সখারাম নিজ কর্মদক্ষতায় অবশেষে এই পত্রিকার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়ে নব্বই টাকা বেতন অর্জনে সমর্থ হন। এই অর্থোপার্জনই যদি সখারামের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ত তাহলে তাঁর

জীবনী রচনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হ'ত না। তিলকপন্থী সখারামের তিলক-প্রীতি হিতবাদী কর্তৃপক্ষ পছন্দ করছেন না দেখে সম্পাদকের অর্থকরী চাকরি তিনি অনায়াসে ত্যাগ করে নিজের বিবেককে দায়মুক্ত করতে একটুও দ্বিধান্বিত হলেন না। এর মধ্যে 'হিতবাদী'র হিন্দী সংস্করণ 'হিতবার্তা'ও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সখারামের ভাগিনেয় পণ্ডিত বাবুরাও বিষ্ণু পড়ারকর এই সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন (স্মরণযোগ্য যে, ইনি 'দেশের কথা'র হিন্দী অনুবাদও করেন)। তাঁরা উভয়েই সরে এলেন। আসলে মডারেট বা মধ্যপন্থী নেতাদের সঙ্গে ন্যাশালিস্ট বা জাতীয়তাবাদীদের (এঁরা উগ্র বা এক্সট্রিমিস্টও ছিলেন) কোনো সমঝোতা ছিল না সে সময়ে। ফলে প্রথম দলের সুরেন্দ্রনাথ, ওয়াচা, মেটা প্রভৃতির সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল, তিলক, অরবিন্দ সখারামদের মতান্তর ঘটেই থাকতো।

যাই হোক—'হিতবাদী' ছেড়ে সখারাম এলেন বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ তথা ন্যাশনাল কাউন্সিলের বাংলা ভাষা ও ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে। ইতিহাসে তাঁর গভীর অনুরাগের প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর ঐতিহাসিক রচনাবলীতে। বাংলা ভাষাতেও তাঁর অধিকার ছিল তর্কাতীত। সে সময়ে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদেরও বাংলা পড়তে হত। তাঁর ক্লাসে উভয় বিভাগের ছাত্রদের কেউ অনুপস্থিত থাকতেন না। তাঁর জনৈক ছাত্র নগেন্দ্রকুমার গুহরায় সাক্ষ্য দিয়েছেন ('হিতবাদী' বিশেষ সখারাম স্মৃতিসংখ্যা) 'বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপনার মধ্য দিয়া আমরা তাঁহার নিকট হইতে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতাম। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা (Culture and Civilisation)। ঐতিহাসিক তথ্য ও রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিতেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। সাহিত্য ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যের জন্যই তাঁর খ্যাতি ছিল বেশী।'

এখানে কর্মরত অবস্থাতেই তাঁর 'দেশের কথা' প্রকাশিত হয় এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যখন এর পঞ্চম সংস্করণ (১৯০৮-এ প্রকাশিত) ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে তখন তাঁর মত একজন শিক্ষককে কর্মে বহাল রাখার প্রশ্নে জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দ্বিধাগ্রস্ত হন। বুঝতে পেরে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সখারাম শিক্ষকতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। আবার 'হিতবাদী'র সঙ্গে যুক্ত হলেও পুত্র ও পত্নীর মৃত্যু তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যকে উদ্ধার করার জন্য পিতৃভূমি কঁরোগ্রামে চলে যান। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর সকালে—মাত্র ৪৩ বছরের অপরিণত জীবনে তিনি চলে গেলেন।

সখারামের জীবন তাঁর ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কেন্দ্রেই আবর্তিত না হয়ে দেশের বৃহত্তর সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। শিবাজী-উৎসব প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশে দেশপ্রেমের জোয়ার আনতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। সে জন্যেই 'শিবাজীর মহত্ত্ব' নামে কুড়ি পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা এবং পরে রবীন্দ্রনাথের সুখ্যাত 'শিবাজী উৎসব' সম্বলিত ৪০ পৃষ্ঠার 'শিবাজীর দীক্ষা' পুস্তিকা (প্রেমতোষ বসু কর্তৃক প্রচারিত) রচনাপূর্বক তিনি শিবাজী-উৎসব-সমিতির তরফে বিনামূল্যে প্রচার করেন। একটা স্বদেশপ্রেমের জোয়ার তাঁর মধ্যে নিত্য প্রবহমান ছিল বলেই তিনি 'মহামতি রাণাডে, 'ঝাঁসীর রাজকুমার, 'বাজীরাও' এবং 'আনন্দীবাঈ'-এর দীর্ঘ জীবনচরিতগুলি রচনা করেছিলেন। তাঁর তিলকের জীবনীও খুবই উল্লেখযোগ্য।

এ সব জেনে পাঠক হয়তো তাঁকে বঙ্গভাষায় মহারাষ্ট্রীয় লেখক বলে ভুল করতে পারেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর শেষ পুস্তক 'ধ্বংসোন্মুখ জাতি'র প্রতিবাদ 'বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ' একই সঙ্গে তাঁর বঙ্গদেশ ও হিন্দুপ্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বেঙ্গলি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি নিবন্ধ A Dying Race নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে তাঁর মূল বক্তব্য বাংলায় 'হিন্দুসমাজ (নিবেদন-পত্র)' নামে ছাপিয়ে তার পঁচিশ হাজার কপি বিনামূল্যে প্রচার করে ঘোষণা করেন যে 'বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের আসন্নকাল উপস্থিত।' তাঁর বক্তব্যের প্রথম প্রতিবাদ করেন কিশোরীলাল সরকার অমৃতবাজার পত্রিকায় 'A Dying Race—How Dying' নামে প্রবন্ধ লিখে। তখন উপেন্দ্রনাথ নিজে আপন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'ধ্বংসোন্মুখ জাতি' ছাপিয়ে পুনশ্চ পঁচিশ হাজার কপি বিতরণ করলেন। এরই তীব্র প্রতিবাদ করে সখারাম এই শেষ পুস্তকটি রচনা করে জানান হিন্দুজাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কোনো প্রকার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু সখারাম এসব রচনা সত্ত্বেও সুপরিচিত হয়ে আছেন তাঁর দুটি গ্রন্থের জন্য। একটি তাঁর 'দেশের কথা'; অন্যটি 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত'। 'দেশের কথা' আলোচনার আগে অন্য বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই।

'তিলকের মোকদ্দমা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। ৪ অক্টোবর ১৯০৮)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪+৭৬+২১০+৪৪। গ্রন্থকার নিজেই ছিলেন এর প্রকাশক। বইটি জাতীয় নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের

জীবনী। কিন্তু এতে বিশেষ যে ঘটনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তা ছিল অভিযুক্ত ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীর সপক্ষে সমর্থন করায় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিলকের বিরুদ্ধে সরকার যে মোকদ্দমা করে তার আনুপূর্বিক বিবরণ। ব্রিটিশ সরকার বইটিকে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন (Proscribed Indian Book No. 199, Proscribed Publication BEN B67)।

আগেই বলেছি 'দেশের কথা' সখারামের সবচেয়ে আলোচিত ও আদৃত পুস্তক। প্রথমে এটি দুটি ভাগে প্রকাশিত হয় (১৯০৪)। ১ম ভাগ ১৩১১ সাল (১৬ জুন ১৯০৪) এবং পরিশিষ্ট ভাগ (২৩ অক্টোবর ১৯০৭) ১৩১৪ সালে যথাক্রমে ৩৪২ ও ৩৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত ছিল। প্রথম চারটি সংরক্ষণে মোট দশ হাজার খণ্ড পুস্তকের প্রকাশ এর জনপ্রিয়তাকে বোঝায়। ৪র্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন থেকে আমরা জানতে পেরেছি জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ সালের প্রথম সংস্করণে এক হাজার, আশ্বিন ১৩১২ সালের দ্বিতীয় সংস্করণে দু'হাজার, মাঘ ১৩১২ সালের —মাত্র ৪ মাসের ব্যবধানে— তৃতীয় সংস্করণে আরও পাঁচ হাজার এবং আশ্বিন ১৩১৪ সালের চতুর্থ সংস্করণে দু হাজার খণ্ড ছাপানো হয়। স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ বা ১৩১২ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এর চাহিদা তুঙ্গে উঠেছিল।

পঞ্চম সংস্করণে (১৯০৮) 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' নামে একটি নতুন পরিচ্ছেদ যুক্ত হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকার বইটিকে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন (২৮. ৯. ১৯১০ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে)। নির্দেশনামাটি ছিল নিম্নরূপ :

POLITICAL / NOTIFICATION

No. 2840 P D.—

The 22nd September 1910—Whereas it appears to the Lieutenant Governor that a Bengali book entitled "Desher Katha" written and published by Sakharam Ganesh Deoshar, contains words of the nature described in Section 4, Sub-section (1), of the Indian Press Act (1 of 1910), inasmuch as they have a tendency to excite disaffection towards His Majesty or the Government by law in British India ;

Now, therefore, in exercise of power conferred by Section 12, Sub-section (1), of the said Act, the Lieutenant

Governor hereby declares all copies of the said book forfieted to His Majesty.

E. V. LEVINGE
Off g. Chief Secy. to the
Government of Bengal.

বইটি বাজেয়াপ্ত হল কিন্তু এর জনপ্রিয়তার ইতিহাস স্বয়ং গ্রন্থকারই বইয়ের পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি লিখেছেন—'বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে এরূপ নীরস বিষয়পূর্ণ পুস্তকের সমাদর হইবে, তাহা পূর্বে কল্পনা করিতে পারি নাই। তাঁহাদিগের সুবিধার্থে দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের আকার বহুল রূপে বৃদ্ধি করিয়াও মূল্য পূর্ববৎ রাখা হয়। পরন্তু বার আনা মূল্যে 'দেশের কথা'র একটি 'সুলভ সংস্করণ'ও প্রকাশ করিতে সাহসী হই। প্রতিটি সংস্করণেই সখারাম বইটিতে নানা তথ্য সংযোজনাপূর্বক বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করে থাকতেন। কিন্তু তাতে দাম বাড়ানোর পরিবর্তে দাম কমানোর দিকেই তিনি সচেষ্ট থাকতেন। যেমন পঞ্চম সংস্করণের 'চতুঃশতাধিকে পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকের রাজ-সংস্করণের মূল্য পাচসিকা স্থলে এক টাকা ও সুলভ সংস্করণের মূল্য বার আনা স্থলে আট আনা মাত্র' করেছিলেন।

বইটি বাজেয়াপ্ত হলে 'হিন্দী হিতবার্তা' গ্রন্থকারকে বাংলা সরকারের খামখেয়ালীপূর্ণ আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করতে পরামর্শ দেয়। সখারাম মামলা রুজুও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যু পরবর্তী প্রত্যাশিত বিচার প্রহসনকে আর সংঘটিত হতে দেয় নি।

সখারামের 'দেশের কথা' ভারতের বৃটিশ শাসনের না-পছন্দের প্রধান কারণগুলি তুলে ধরেছিল। বৃটিশ অপশাসনে সাধারণ প্রজাগণ রক্তশূন্য হয়ে পড়েছিল। ভারতের সমস্ত সম্পদ ব্রিটিশ অপহরণ করে নিজেদের দেশের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছিল। ফলে ভারতীয় বাণিজ্য এবং শিল্পে অবশ্যম্ভাবী অপমৃত্যু ঘনিয়ে আসছিল। কোথায় শাসক দল ভারতীয় জনগণকে কৃষিতে স্বয়ম্ভর করবে—তার পরিবর্তে তাদের ক্রয়ক্ষমতার অবনতি ঘটিয়ে প্রায় অনাহারে বা অর্ধাহারে রাখার পরিস্থিতি গড়ে তুলেছিল! এবং সানন্দে তারা সে সময়ে এদেশের উৎপন্ন চাউল অন্যত্র রপ্তানী করে দিচ্ছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নৌরজী প্রমুখের তথ্য আহরণ করে সখারাম দেখিয়ে দিয়েছিলেন কি ভাবে এদেশের সম্পদ ব্রিটেনে চলে যাচ্ছে। এর ফলে ভারত যে শুধু মানসিক বা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল তাই নয়, ভারতের ভাস্কর, স্থপতি, বয়ন-শিল্পী সকলেই ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছিল তাদের দক্ষতা।

বুদ্ধিজীবী ভারতের ক্ষতিও তারা করছিল। নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সমাজে কেবল একদল 'কেরাণী' তৈরী করছিল। মর্যাদাযুক্ত কোনো পদই ভারতীয়ের জন্য খোলা ছিল না। ভারতের বিদ্যার্জনকে তারা কিছুমাত্র মূল্য দিত না। পরন্তু বিচার ব্যবস্থাটি ভারতীয়দের জন্য ভিন্নতর ব্যবস্থা যেন একটা শ্বাসরোধকারী পরিবেশ গড়ে তুলেছিল।

এই বৃটিশ অপশাসকদের সঙ্গে মিশনারীরা যোগ দিয়ে হিন্দুধর্মেরও ভিত্তি-ভূমিকে নড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। যুবচিত্তকে তারা করে দিয়েছিল বিভ্রান্ত। মদ্যপানকে শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে প্রচার করে যুবশক্তির মধ্যে এনে দিয়েছিল অবক্ষয়। সে কারণেই বোধ করি লর্ড বার্জ হ্যামিল্টন সাক্ষাতে বলেছিলেন—'Our Government never will be popular in India · Our Government never can be popular in India' ('দেশের কথা'য় উদ্ধৃত)।

'দেশের কথা' রচিত হয়েছিল জাতীয় মহাসমিতির আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য। বইটি লেখার জন্য সখারাম অজস্র তথ্য বিভিন্ন জনের রচনা, সাময়িক পত্র এবং অন্যান্য সূত্র থেকে আহরণ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের The Economic History of India (১৯০১), দাদাভাই নৌরজীর 'Poverty and our British rule in India, জন ডিগ্‌বির The Prosperous British India—A Revolution from official Records (London 19 1) প্রভৃতি বই তাঁকে অজস্র তথ্য সরবরাহ করেছে। কিন্তু বইটিকে শুধুমাত্র তথ্যবাহী ভাবলে ভুল হবে। কারণ তৎকালীন আন্দোলন এবং জীবন এতে প্রাণ পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার যে ইতিহাস পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল 'দেশের কথা' সেই বঞ্চনারই তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস। তাছাড়া 'দেশের কথা' আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' অথবা অক্ষয়কুমার দত্তের 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' প্রবন্ধের কথা। এই বই সেই সব ঋদ্ধ-চিন্তারই উত্তরকালীন ফসল। 'কৃষকের সর্বনাশ' এই বইয়ের একটি মূল্যবান পরিচ্ছেদ। এক সময়ে এই পরিচ্ছেদ (মূল প্রথম সংস্করণের ৯৭-১৪৪ পৃষ্ঠা) পৃথক করে নিয়ে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল মূল বই প্রকাশের এক মাসের পরই।

'দেশের কথা'র একটি সমালোচনা লিখে দীনেশচন্দ্র সেন নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ বইটিতে কেবলমাত্র ব্রিটিশের দোষদর্শন থাকায় এর মধ্যে ক্ষুদ্র স্বদেশবোধ লক্ষ্য করেছিলেন

বলে বইটি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হতে পারেন নি। আমাদের মনে হয় 'দেশের কথা'র বেশ কিছু অংশ 'হিতবাদী'র সম্পাদকীয় হিসাবে রচিত হয়ে থাকায় প্রাসঙ্গিকতাচ্যুতি ঘটেছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে। তাছাড়া আজকের দিনে হয়তো এর সমস্ত বিষয়টিকে খুব একটা প্রাসঙ্গিক মনে নাও হতে পারে। কিন্তু ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী তাদের অপশাসনে ভারতের যে চিরস্থায়ী ক্ষতি করে গেছে তার কারণ অনুসন্ধান এবং যে বিষয়গুলি এখনও পর্যন্ত জ্বলন্ত তার জন্যে এই বই পড়তেই হবে। সে কারণেই এর পুনর্মুদ্রণের প্রাসঙ্গিকতা আছেই। ডঃ মহাদেব প্রসাদ সাহা এক সময়ে এর একটি পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করেছিলেন। এখন কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন এই দুষ্প্রাপ্য বইয়ের পুনর্বার পুনর্মুদ্রণ ঘটিয়ে একালের পাঠকের সঙ্গে এই বইয়ের সেতুবন্ধন করলেন।

এখন আমরা দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য এবং তদুপরি রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩১১ সংখ্যা থেকে উদ্ধার করে দিয়ে সম্পাদকীয় রচনার সমাপ্তি ঘটালাম। ভরসা করি 'দেশের কথা' দেশের মানুষ পুনশ্চ সাদরে গ্রহণ করবেন। পাঠকদের সুবিধার্থে পুরানো আনা-পাই-এর হিসাব বর্তমান প্রচলিত 'পয়সা'র মানে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

বোজভিলা, বর্ধমান — বারিদবরণ ঘোষ

ভাদ্র, ১৩৯৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত সমালোচনা
দেশের কথা

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীযুক্ত সখারাম দেউস্কর মহাশয়ের রচিত 'দেশের কথা' নামক পুস্তকের সমালোচনা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার আরম্ভে তিনি লিখিতেছেন :

'এই পুস্তকের বিষয়গুলি মৌলিক নহে। ভারতহিতৈষী ডিগ্‌বি প্রভৃতি ইংরেজগণ এবং দাদাভাই নরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভারতের সুসন্তানগণ যে-সকল বিষয় লইয়া বহুবৎসর যাবৎ আলোচনা করিতেছেন তাহাই মূলত অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অস্পষ্টভাবে আমাদের ধারণায় ছিল, এই পুস্তকখানি পড়িয়া তাহা সুস্পষ্ট জীবন্ত এবং আকারপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'কোনো সাধুপুষ্পিত সুন্দর উদ্যান দাবদগ্ধ হইয়া গেলে কিংবা কোনো সুদর্শন পরিচিত বন্ধুর হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, বর্তমান চিত্রে অঙ্কিত ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে, অথচ দেউস্করমহাশয় কোনো উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন নাই— কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেন্সাস ও স্ট্যাটিস্টিক্স্ হইতে সমুদ্ধৃত কথা নিঃশব্দে একটি মর্মচ্ছেদী দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইবে। এই দৃশ্য একটি বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায়—প্রভেদ এই যে, ইহাতে কাল্পনিক দুঃখের কথা নাই, ইহা আমাদের নিজেদের দুঃখদারিদ্র্য ও মৃত্যুর চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। গ্রন্থকার ভিষকের ন্যায় আমাদের ক্ষতস্থানটি জাগাইয়া তুলিয়া বেদনাবোধের সঞ্চার করিয়াছেন।'

ইহার অনতিদূর পরেই তিনি লিখিতেছেন—

'দেউস্কর মহাশয় বলেন, পুনঃপুনঃ আন্দোলন করিলে গবর্ণমেণ্ট্ অবশ্যই আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন।'

শিক্ষাটা কি এই হইল। ইতিহাসে প্রমাণ হইতেছে, প্রবল জাতি ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া দুর্বলজাতির স্বত্ব নষ্ট করিতেছে ; ইহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সেই প্রবল জাতির নিকট পুনঃপুন আন্দোলন করিলেই লোপ্ত্রদ্রব্য ফিরিয়া পাওয়া যায়। ব্যাপারটা এতই সহজ ?

ইহার উত্তরে আন্দোলনের দল বলিবেন, তা ছাড়া আর কী করিব। একটা তো কিছু করা চাই।

আমরা বলি, যদি কিছু করতেই হয় তো ওই অরণ্যে রোদনটাই নয়। আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা এই ইতিহাস হইতে লাভ করিবার বিষয় কী দেখিলে। আমরা বলিব, লাভের বিষয় দেখিয়াছি, কিন্তু সেটা দরখাস্তপত্রিকা নহে। আমাদের লাভ এই যে: ইংরাজের আদর্শ আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছিল। স্বদেশের সকল দিক হইতে আমাদের হৃদয় বিমুখ হইতেছিল। মুখে আস্ফালন করিয়া যাহাই বলি আমাদের অন্তঃকরণ বলিতেছিল, বিলাতি সভ্যতার মতো সভ্যতা আর নাই। এই কারণে আমাদের দেশের আদর্শ কী, শক্তি কোথায়, তাহা যথার্থভাবে বিচার করিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না। প্যাট্রিয়টিজম্-মূলক সভ্যতার চেহারা ইতিহাসে উত্তরোত্তর যতই উৎকট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ততই আমাদের হৃদয়ের উদ্ধার হইতেছে। ক্রমশই আমাদের দেশ যথার্থভাবে আমাদের হৃদয়কে পাইতেছে। ইহাই পরম লাভ। ধনলাভের চেয়ে ইহা অল্প লাভ নহে।

অন্যপক্ষ বলিবেন, তবে দেশহিতৈষিটাকে তোমরা ভালোই বল না। আমরা বলি, দেশহিতৈষিতা কাহাকে বলে তাহা লইয়া এত তর্কের বিষয় আছে যে, কেবল ওই নামটাকে লইয়া মুখে মুখে লোফালুফি করিয়া কোনো ফল নাই। প্যাট্রিয়টিজ্‌মের প্রতিশব্দ দেশহিতৈষিতা নহে। জিনিসটা বিদেশী, নামটাও বিদেশী, থাকিলে ক্ষতি নাই। যদি কোনো বাংলা শব্দই চালাইতে হয়, তবে 'স্বাদেশিকতা' কথাটা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্বাদেশিকতার ভাবধারা এই যে, স্বদেশের ঊর্ধ্বে আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না সেইখানেই ধর্ম বল, দয়া বল, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে—কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল, সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে ব্যাপারটা হয় তাহাই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্ শব্দের বাচ্য হইয়াছে।

স্বার্থপরতা কখনোই ধর্মের জন্য আপনাকে সংযত করে না, স্বার্থের জন্যই করে। ইংরাজ কখনোই এ কথা ভাবে না যে, পৃথিবীতে ফরাসি সভ্যতার একটা উপকারিতা আছে, অতএব সে সভ্যতায় আঘাত করিলে সমস্ত মানবের, সুতরাং আমাদেরও ক্ষতি। নিজের পেট ভরাইবার জন্য আবশ্যক হইলে ফরাসিকে সে বটিকার মতো গিলিয়া ফেলিতে পারে, দ্বিধামাত্র করে না। তাহার দ্বিধার একমাত্র কারণ, আমারও গায়ে জোর আছে, ফরাসিও নেহাৎ ক্ষীণজীবী নহে, অতএব কী জানি লাভ করিতে গিয়া মূলধন-সুদ্ধ হারানো অসম্ভব নহে। এ স্থলে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য এশিয়া-আফ্রিকার ডালপালা সমস্ত মুড়াইয়া খাইলে কোনো দোষ দেখি না। অতএব তিব্বতে শান্তিদূত প্রেরণের ব্যবস্থাকালে কপোলযুগ লজ্জায় রক্তিমবর্ণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্বার্থপরতাকে যদি ধর্মের আসনের প্রান্তে বসাইয়া কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে অবশেষে সে একদিন ধর্মকে ঠেলা মারিয়া ফেলিবেই। স্বদেশীয় স্বার্থপরতা আজ সেইজন্য কেবলই পৃথিবীময় তাল ঠুকিয়া-ঠুকিয়া দেবতাকে সুদ্ধ ভয় দেখাইয়া স্তম্ভিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী Sven Hedin'এর নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইংরাজের তিব্বত-আক্রমণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"The English campaign in Tibet is a fresh proof of the Imperialist brutality which seems to characterise the political tendencies of our times, and in face of which the position of the smaller states appears precarious. A small

state which does not possess the power to defend itself is doomed to decay, whether it is Christian or not. If our priests taught the people the meaning of the words 'Love thy neighbours as thyself', 'Thou shalt not steal', 'Thou shalt do not murder', 'Peace on earth and goodwill towards men', instead of losing themselves and their hearers in unfathomable and completely useless dogmas, such an injustice as the present one would be impossible But probably such really Christian feeling are nonsense in modern polity. And the same Christians send our missionaries to Japan. In the name of truth one ought to protect the Asiatics from such Christianity."

এ-সকল কথার তাৎপর্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। টেলিগ্রাফ রেলগাড়ি ও বড়ো বড়ো ইস্কুলই যে সভ্যতার প্রকৃত উপকরণ ও লক্ষণ নহে তাহা নিশ্চয় জানিয়া যথার্থ মনুষ্যত্বলাভের জন্য অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে—তখন জ্ঞান হইতেও পারে যে, মনুষ্যত্বচর্চার জন্য পাশ্চাত্য শস্ত্রধারীদের ছাত্রত্ব স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে। তখন নিজের দেশের আদর্শ ও নিজের শক্তিকে নিতান্ত অবজ্ঞেয় বলিয়া মনে হইবে না।

কিন্তু অন্নের অভাবে কৃশ হইয়া, তেজের অভাবে ম্লান হইয়া, ঝরিয়া মরিয়া পড়িলে তখন তোমার দেশের আদর্শই বা কোথায় ধর্মই বা কোথায়। আদর্শ রক্ষা করিতে গেলেও যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাহার অবাধ চর্চার স্থল কোথায়। কাজেই সেজন্য দরখাস্ত করিতেই হয়, শুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় রেজোল্যুশন পাস না করিলে চলেই না।

এক দিকে স্বদেশীয় স্বার্থপরতার সংঘাত আক্রমণ করিলে অপর দিকেও স্বদেশীয় স্বার্থরক্ষার উদ্যম স্বভাবতই জাগিয়া উঠে। এমনি করিয়া ইংরাজিতে যাহাকে নেশন, অর্থাৎ পোলিটিকাল স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায় বলে, তাহার উদ্ভব হইতে থাকে।

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহার উদ্ভব না হইয়া থাকিতেই পারে না। সুতরাং এই সময়েই আমাদের মোহমুক্ত হওয়া দরকার। অনিবার্য প্রয়োজনে যাহা আমাকে লইতেই হইবে তাহার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় মুগ্ধভাব থাকা কিছু নয়। এ কথা যেন না মনে করি, জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরম লাভ। তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে—মনুষ্যত্বকে ন্যাশনালত্বের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে। ন্যাশনালত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে

পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নিদয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে, ন্যাশনালত্ব-সুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে; কারণ, স্বার্থপরতার স্বভাবই এই যে, সে ক্রমশই সংকীর্ণতার দিকে আকর্ষণ করে। তাহার প্রমাণ, বোয়ার যুদ্ধে ইংরাজের তরফের রসদের মধ্যে রাশি রাশি ভেজাল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষেও সেইরূপ দেখা গেছে। মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মই যে অমোঘ—ধর্মের নিয়ম যে অমোঘ নহে – তাহা নয়।

বাল্যশিক্ষার প্রভাব বড়ো কম নয়। ভারতবর্ষের অস্থিমাংস লইয়াও দীনেশবাবুর ন্যায় মনীষী ব্যক্তি 'দেশের কথা'র সমালোচনার ছলে এক জায়গায় লিখিয়াছেন—

'গবর্মেন্ট্ যখন এক চক্ষে ভারতবাসীর হিত ও ভাবী উন্নতির দিকে লক্ষ্য করেন তখন তাঁহার আর-একটা চক্ষু সাগরমেখলা শ্বেতদ্বিপাধিষ্ঠাত্রী বাণিজ্যলক্ষ্মীর চরণনখরপ্রান্তে আবদ্ধ থাকিবে, ইহ্ আমরা কোনোক্রমেই অন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারিব না।'

দুটি চোখের ঠিক একটি চোখ সাগরের এ পারে এবং একটি চোখ ও পারে রাখিলে ন্যায়দণ্ড কতকটা সিধা থাকিত। কিন্তু দেউস্কর মহাশয়ের গ্রন্থখানি কি তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। আসল কথা, আমরা আজকাল অনেকেই মনে করি, ন্যাশনালিটির স্পর্শমণির স্পর্শে সমস্ত অন্যায় সোনার চাঁদ হইয়া উঠে।

যাহা হউক, আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে—কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্যপদার্থটি, যে প্রাণপদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে— আমাদের চিত্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে; আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে। এ কার্যে স্বদেশের দিকে আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়, স্বদেশের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই - যাহা শিক্ষা ও অবস্থার গুণে অন্য দিকে ধাবিত হইয়াছে তাহাকে ঘরের দিকে ফিরাইতে হইবে। আশা করি, দেউস্কর মহাশয়ের বইখানি আমাদিগকে সেই পথে যাত্রার সহায়তা করিবে—আমাদিগকে পুনঃপুন নিষ্ফল আন্দোলনের দিকেই উৎসাহিত করিবে না।

শ্রাবণ ১৩১১, বঙ্গদর্শন। অপিচ দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী বিশ্বভারতী সংস্করণ, দশম খণ্ড, পৃঃ ৬১৯-৬২৩।

আমাদের দেশ

সমুদ্র-বলয়াঙ্কিতা হিমাদ্রিকৃতশেখরা ভারতভূমির বিস্তার ১৩,৮৮,৯৭২ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৭২ বর্গ মাইল স্থান ইদানীং ইংরাজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন রহিয়াছে। এই অংশকে 'বৃটিশ ভারত' বলে। সরকারি কাগজপত্রে ব্রহ্মদেশ ও বেলুচিস্থানকেও বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের পরিমাণ ১,৬৮,৫৫০ বর্গ মাইল। বৃটিশ বেলুচিস্থান আয়তনে ২২,৪০০ বর্গ মাইলের অধিক নহে। ভারতবর্ষে সর্বশুদ্ধ ২১৩টি করদ রাজ্য আছে। তন্মধ্যে মধ্যভারতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্বসমেত ৮০টি, রাজপুতনায় ২০টি, পাঞ্জাবে ৩৪টি, মধ্যপ্রদেশে ১৫টি, মাদ্রাজ অঞ্চলে ৫টি, বোম্বাই প্রদেশে ২০টি, বঙ্গে ৪টি, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ২টি, কাশ্মীরে ১টি, মহীশূরে ৮টি, হায়দ্রাবাদে ১৯টি ও বরোদায় ৬টি অবস্থিত। করদ দেশীয় রাজ্যগুলির পরিমাণ সর্বশুদ্ধ ৫,৯৫,০০০ বর্গ মাইল।

বর্তমানকালে ভারতবর্ষে সর্বসমেত ২৮,৪২,৩৪,৭০০ লোকের বাস। এই জনসংখ্যা সমগ্র ভূমণ্ডলের লোকসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। পূর্বোক্ত ২৮½ কোটি লোকেব মধ্যে ২২,১০,৫৩,১৩২ জন বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষে ও অবশিষ্ট ৬,৩১,৮১,৫৭০ জন দেশীয় হিন্দু-মুসলমান করদ নৃপতিদিগের অধীনতায় বাস করে। ব্রহ্মদেশ ও বৃটিশ বেলুচিস্থানের লোকসংখ্যা ১ কোটি ৩২ হাজার। ভারতবর্ষে ২০,৭১,৪৭,০২৬ হিন্দু, ৬,২১,০০,০০ মুসলমান ও ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ইউরোপীয়ানের বাস। বৃটিশ ভারতে ২২,০৯,২৮,১০০ হিন্দু-মুসলমান (১১,২২,৪৪,৯০০ পুরুষ এবং ১০,৮৭,৬৩,২০০ স্ত্রীলোক) বাস করে।* এই ২২ কোটি ৯ লক্ষাধিক হিন্দু-মুসলমানের সুখ-দুঃখের কথাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইংরাজ শাসনের দোষ-গুণ

"It is better to follow the real truth of things than an imaginary view of them."—Machiavelli.

* সমগ্র ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ২০,৭১,৪৭,০২৬ (১০,৫১.৮৮,৯৫৫ জন পুরুষ ও ১০,১৯,৫৮,০৭১ স্ত্রীলোক)। তন্মধ্যে দেশীয় করদ-রাজ্যসমূহে ৪,৮৫,৪৫,৮৩৮ হিন্দুর বাস। মুসলমানের সংখ্যা ৬,২৪,৫৮,০৭৭ (৩,২২,৫৭,৬১০ পুরুষ ও ৩,০২,০০,৪৬৭ স্ত্রীলোক। ইহাদিগের মধ্যে ৩,৩৯,৪৪৬ জন ব্রহ্মদেশের ও ৮৬,৫৩,৫৬০ দেশীয় রাজ্যের (বৃটিশ-বেলুচিস্থানসহ) অধিবাসী। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ৯৪,৭৬,৭৫৯। তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশেই ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার বৌদ্ধের বাস। শিখদিগের সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ। আর্যসমাজের মতাবলম্বী ৯২,৪১১ জন, ব্রাহ্ম ৪০৫০ জন (তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ১৭০১), খৃষ্টান ২৯ হাজার, ২৫০ জন সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রায় এক লক্ষ।

ভারতবাসী এককালে সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও দৈবের বিড়ম্বনায় ও আত্ম-কর্ম-দোষে আজ পরাধীন, পরানুগ্রহ-জীবী। কবি গাহিয়াছেন,—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে!"

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-লেখক লর্ড মেকলে বলিয়াছেন,—

The heaviest of all yokes is the yoke of the stranger.

ফলতঃ পর-বশতার অপেক্ষা গুরুতর দুঃখ আর নাই। কিন্তু মূর্খের প্রভু হওয়া অপেক্ষা পণ্ডিতের গোলামী করা ভাল, ইহাও এ দেশের চিরন্তন প্রবাদ। ইংরাজ রাজত্বে আমরা এ প্রবাদের সত্যতা পদে পদে উপলব্ধি করিতেছি। ভারতবর্ষ আজ বহু শতাব্দী "পর-দাস-দশায়" যাপন করিতেছে, কিন্তু বর্তমানকালে ভারতবাসী যেরূপ দাসত্বে কালক্ষেপ করিতেছে, তাহা বহুলাংশে বরণীয়, সন্দেহ নাই। ইংরাজ বৈদেশিক রাজা হইলেও বহুগুণে গুণবান্ ও সভ্য-জাতিনিচয়ের শীর্ষস্থানীয়। অন্ততঃ ভারতবাসীর পক্ষে যে সকল গুণ শিক্ষা করা বর্তমান অবস্থায় বিশেষ আবশ্যক, ইংরাজের সে সকল গুণ যথেষ্ট আছে। সুতরাং ইংরাজের সাহচর্যে ভারতবাসী যে একদিকে বিশেষ লাভবান হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যতদিন ভারতবাসী পরাধীন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইবে, ততদিন যেন তাহাদিগকে ইংরাজের অধীন হইয়াই থাকিতে হয়।

শ্বেতদ্বীপবাসী ইংরাজ সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়া এই বিশাল ভূমিখণ্ডবাসী জনসমাজের মধ্যে শান্তি-স্থাপন করিয়াছেন, দেশীয় দস্যুতস্করের হস্ত হইতে লোকের ধন-প্রাণ-রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভীতি দূর করিয়াছেন, প্রজাকুলের ন্যায়-বিচারলাভের পথ বহুলপরিমাণে পরিস্কৃত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাবা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিতরণে ভারতবর্ষ-বাসীর বহুল কু-সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাবে এদেশবাসী, বৃটিশ প্রজার প্রকৃত অধিকার কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। তাহাদিগের ন্যায্য অধিকার হইতে কেহ তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিলে, তাহারা প্রতিপক্ষকে আন্দোলনাদি বিধি-সঙ্গত উপায়ে নিরস্ত করিতে শিক্ষা করিয়াছে। ভারত গবর্নমেণ্ট যথোচিত সুবিধা প্রদান করিলে তাহারা স্বদেশের শাসন-কার্যে নানা-প্রকারে রাজপুরুষদিগের সহায়তা ও দেশের মঙ্গলের জন্য আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিবে, এ আকাঙ্ক্ষা শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে। ইংরাজ রাজ্যে তাহাদিগের এই আকাঙ্ক্ষা কখনই অপূর্ণ থাকিবে না, এ বিশ্বাসও পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে।

এই দেশের সমস্ত রাজনীতিক আন্দোলনই এই ধারণার প্রাবল্য-বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে। উদার-প্রকৃতি ইংরাজ রাজনীতিকেরা ভারতবাসীর এই মনোভাবের পুষ্টিসাধনে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

ইংরাজের অনেক গুণ নীতিবাদীর চক্ষে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু পররাষ্ট্র-বিজয় ও সাম্রাজ্যরক্ষা-কার্যে সে সকল গুণের আবশ্যকতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইংরাজের সাহায্যে যদি আমরা সেই সকল গুণের অধিকারী হইতে পারি তাহা হইলে ভারতবর্ষের এই ত্রিশ কোটি বুদ্ধিমান, শ্রমশীল ও মিতাচারসম্পন্ন জাতিব দুঃসাধ্য কায· বোধ হয় জগতে আর কিছুই থাকিবে না। ইংরাজ অধ্যাপকের টোলে অধীনতা, অন্নকষ্ট ও অপমানাদি ভোগ করিয়াও যদি আমরা তাঁহাদিগের প্রদত্ত উৎকৃষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি, যদি উপযুক্ত গুরুর যোগ্য শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমাদিগের এই কষ্টবহুল গুরু-গৃহ-বাস সম্পূর্ণ সার্থক হইবে। উদার-চরিত ইংরাজও শিষ্যের যোগ্যতা-দর্শনে প্রীতিলাভ করিবেন।

মহামতি গ্লাডস্টোন বলিতেন,—

The worst thing you can do to a nation is to flatter it.

এই কারণে, ইংরাজ জাতির শুধু গুণ-বর্ণনা করিয়া নিরস্ত হওয়া কর্তব্য নহে। ইংরাজ-চরিত্রে গুণের ন্যায় কতিপয় গুরুতর দোষও বিদ্যমান। কুটিলতা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ও বিজাতীয়ের প্রতি ঘৃণা প্রভৃতি তাঁহাদিগের দোষ সর্বত্র বিশ্রুত। ইংরাজ-চরিত্রের এই সকল দোষেও আমাদিগের সামান্য উপকার সাধিত হয় নাই। ভাবতবাসীর সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও ধর্মগত বিশেষত্ব রক্ষার পক্ষে ইংরাজের এই সকল দোষ বিশেষ সহায়তা করিতেছে। বিজেতার সহিত সম্পূর্ণ সম্মিলন, কখনই বিজিতদিগের মঙ্গলকর নহে। আকবরের সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত হওয়ায় শৌর্যশালী রাজপুত জাতির কিরূপ অধোগতি হইয়াছিল তাহা ইতিহাসপাঠকেব অবিদিত নাই। হিন্দু-ইউরোপীয়ানের মধ্যে শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপন মঙ্গলকর হইবে বলিয়া পূর্বে অনেকে মনে করিয়াছিলেন, অনেক অনুকরণপ্রিয় সংস্কারক এই প্রথার প্রবর্তনের জন্য নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদিগের অনেকেরই চক্ষু ফুটিতেছে। ইংরাজ-চরিত্রের বিজাতি-বিদ্বেষই যে এইরূপ ঘটনার কারণ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অওরঙ্গজেবের বিধর্মি-পীড়নের ফলে সেকালের হিন্দুগণ মহম্মদীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও অধিকতর সধর্মপরায়ণ হইয়াছিলেন, স্থানে স্থানে শক্তি-সংগ্রহ করিয়া হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে ইংরাজদিগের অহঙ্কার, স্বার্থপরতা

ও 'নেটিভ'-বিদ্বেষের ফলে হিন্দু মুসলমানের ক্রমশঃ অবস্থান্তর ঘটিতেছে। শ্বেতাঙ্গেরা ভারতবাসীর ধর্মে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের হস্তে ব্যক্তিগতভাবে ভারতবাসীকে পদে পদেই লাঞ্ছিত হইতে হইতেছে। ঘরে বাহিরে, পথে-ঘাটে, চারিদিকে এই অপমান ও লাঞ্ছনার দৃশ্য ভারতবাসী সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছে। ইহার ফল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ জাতীয় ইতিহাসে কোন না কোন আকারে নিশ্চিত পরিদৃষ্ট হইবে। এখনই পরিবর্তনের সূচনা পরিলক্ষিত হইতেছে। পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা ও জীবন-যাপন-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি ভারতবর্ষ-বাসীর পূর্বে যেরূপ অনুরাগ দৃষ্ট হইত, এক্ষণে আর সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। বরং নানা স্থলে বিপরীত ভাবই দেখা যাইতেছে। ইংরাজ-জাতির চরিত্রগত যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছি, এ সকল তাহারই অনিবার্য ফল।

এইরূপে ইংরাজের দোষে-গুণে আমাদের জাতীয় জীবনে অভিনব পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছে। ইংরাজের সংসর্গে এই প্রাচীন মেধাবী জাতি জরা-পরিত্যাগপূর্বক ক্রমশঃ নবযৌবনের বল লাভে অগ্রসর হইতেছে। এই বিশাল ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘর্ষে সর্বত্র নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। একদিকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিযোগিতা অন্য দিকে দারিদ্র্য, নৈরাশ্য ও উদ্বেগ, একদিকে জ্ঞানালোকের বিস্তারে কুসংস্কারের উচ্ছেদ, অন্য দিকে ধর্মবিশ্বাসের অভাবে সহিষ্ণুতার হ্রাস, একদিকে সংবাদপত্র, গ্রন্থ প্রচার ও সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্বদেশের মঙ্গলসাধনে দেশবাসীর যত্ন, অপর দিকে মত-ভেদ ও সুযোগ্য নেতার অভাবে সে চেষ্টার বিফলতা প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতবর্ষের নিদ্রাভঙ্গ সূচিত হইতেছে।

ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে পূর্বোক্তপ্রকারে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে, ইংরাজের ন্যায় সহৃদয় সুসভ্য জাতির দোষগুণের আশ্রয়ে ভারত-বাসী যে নূতন জাতীয় শিক্ষা লাভ করিতেছে, এশিয়ার কোনও দেশের ভাগ্যে তাহা অদ্যাপি ঘটে নাই। নবজীবন-লাভ-ক্ষেত্রে অধুনা ভারতবর্ষই বিস্তীর্ণ (জাপান-বর্জিত) এশিয়া খণ্ডের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে সুসভ্য ইংরাজের ইহাই অক্ষয় মহাকীর্তি। যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজ হইতে দাসত্ব-প্রথার উন্মূলন করিয়াছিলেন, এই মহান গৌরব তাঁহাদিগেরই যোগ্য। প্রায় সপ্ততি বৎসর পূর্বে মহামতি মেকলে ভারতীয় সমাজে এবংপ্রকার নবজীবন-সূচনার সম্ভাবনা অনুভব করিয়া সদর্পে বলিয়াছিলেন,—

We are free, we are civilised, to little purpose, if we grudge to any portion of the human race an equal measure

of freedom and civilisation. Are we to keep the people of India ignorant in order that we may keep them submissive? Or do we think that we can give them knowledge without awakening ambition? Or do we mean to awaken ambition and to provide it with no legitimate vent? Who will answer any of these questions in the affirmative?······I have no fears. The path of duty is plain before us and it is also the path of wisdom, of national prosperity, of national honour. ······It may be that the public mind of India may expand under our system till it has out-grown the system;······they may in some future age demand European in institutions. Whether such a day will ever come I know not. But never will I attempt to avert or to retard it. Whenever it comes, *it will be the proudest day in English history. It would indeed be a title to glory all our own.*

আমরা যদি মানবসমাজের অংশবিশেষকে আমাদিগের সভ্যতা ও স্বাধীনতার সমান অধিকারপ্রদানে কুণ্ঠা প্রকাশ করি, তাহা হইলে অকারণে আমরা সভ্যতা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। ভারতবাসিগণকে চিরকাল ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাধীন রাখিবার উদ্দেশে তাহাদিগকে অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন রাখা কি আমাদিগের উচিত? অথবা আমরা ইহাদিগকে জ্ঞানালোক প্রদান করিব, কিন্তু জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগের মনে উচ্চাভিলাষ উদ্দীপ্ত হইতে দিব না, ইহাই কি আমাদিগের অভিপ্রায়? কিংবা উচ্চাভিলাষ উদ্দীপ্ত হইলেও ন্যায়সঙ্গতভাবে তাহার পূরণ করিব না, ইহাই কি আমাদিগের মনোগত ভাব? কে এই সকল প্রশ্নের একটিরও উত্তরে "হাঁ" বলিতে পারেন? ···আমার মনে কোনই আশঙ্কা হয় না। আমাদিগের সরল কর্তব্য-পথ পুরোভাগে প্রসারিত রহিয়াছে। এই পথই জাতীয় জ্ঞান, জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় সম্মানের পক্ষে প্রশস্ত। হয়ত আমাদিগের প্রবর্তিত শিক্ষাদান পদ্ধতির ফলে কালক্রমে ভারতবাসী জনসাধারণের চিত্তের এরূপ বিকাশ ঘটিবে যে, এই পদ্ধতিতে তাহারা আর সন্তুষ্ট থাকিবে না।······ ভবিষ্যতে হয়ত তাহারা সম্পূর্ণ-ভাবে ইউরোপীয় শাসন-প্রণালীর প্রবর্তন প্রার্থনা করিতে পারে। এরূপ দিন কখনও উপস্থিত হইবে কি না, আমি জানি না! কিন্তু আমি কখনও এরূপ সময়ের আগমনে বাধা প্রদান অথবা যাহাতে ভারতের এরূপ অবস্থা কখনও উপস্থিত না হয়, তাহার চেষ্টা করিব না। যেদিন সত্য সত্য ভারতের সেই অবস্থা উপস্থিত হইবে, ইংলণ্ডের ইতিহাসে সেই দিন

সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক বলিয়া কীর্তিত হইবে। বস্তুতঃ আমরাই সম্পূর্ণভাবে সেই উচ্চ গৌরবের অধিকারী হইব।

এই মহীয়সী বাণী উদার হৃদয় তেজস্বী ইংরাজেরই উপযুক্ত। ভারতীয় সমাজের নবজীবনলাভ-সম্বন্ধে মেকলের এই ভবিষ্যদ্বাণী এতদিনে সফল হইয়াছে। দীর্ঘকালের নিদ্রামগ্ন ভারতবাসী অজ্ঞান ও আলস্য পরিত্যাগপূর্বক পশ্চাত্যজ্ঞানালোকদীপ্ত কর্তব্যমার্গে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠায় সেই যোগ্যতার প্রথম পরিচয়প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জাতীয় মহাসমিতির জন্মগ্রহণের পর হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী শিক্ষিত জনগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইতেছে, ভারতের শুভাশুভ সম্বন্ধে মতভেদ দূরীভূত হইয়া ক্রমশঃ তাঁহাদিগের ঐকমত্য সঙ্ঘটিত হইতেছে। কংগ্রেসের আদর্শে সামাজিক সমিতি, শিল্প-প্রদর্শনী, প্রাদেশিক সমিতি প্রভৃতি অভিনব সভা-সমিতি সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। কায়স্থ, জৈন, বৈশ্য, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরাও আপনাদিগের সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য সভা-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। মুসলমানদিগের শিক্ষা-সমিতিও কংগ্রেসেরই অন্যতর ফল। এক জাতীয় মহা-সমিতির প্রভাবে সমগ্র ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে নূতন কর্মস্রোতের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই ভারতে ইংরাজ-শাসনের সুফল; এলফিনস্টোন, বেন্টিঙ্ক ও রিপণ প্রভৃতি মনীষী শাসনকর্তাদিগের অক্ষয় কীর্তি, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মেকলে প্রভৃতি দূরদর্শী রাজনীতিকগণ ভারতবর্ষ শাসনের যে প্রণালী নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, ভারতবর্ষস্থিত সকল শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ যদি তাহার অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে আজ বৃটিশ ভারতীয় প্রজাবৃন্দের সুখ-সমৃদ্ধির সীমা থাকিত না। যদি পার্লামেণ্টের ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রণীত বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইত, তাহা হইলে বৃটিশশাসন ভারতে সকল প্রকারেই সর্বজনপ্রিয় হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইল না। ভূতপূর্ব গবর্নর জেনারেল লর্ড লিটন বাহাদুর তাঁহার একখানি গোপনীয় মন্তব্যপত্রে লিখিয়াছেন,—

No sooner was the Act passed than the Government began to devise means for practically avoiding the fulfilment of it.

এই আইন পাস হইতে না হইতে (ভারতবর্ষীয়) গবর্নমেণ্ট উহা প্রতিপালনের দায় হইতে অব্যাহতিলাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পার্লামেণ্টের আদিষ্ট এই বিধানে যোগ্য ভারতবাসীকে উচ্চতম রাজকার্যেও নিযুক্ত হইবার অধিকার দান করা হইয়াছিল। এতদ্‌প্রসঙ্গে লিটন মহোদয় আরও লিখিয়াছিলেন,—ভারতবাসীর পার্লামেণ্ট হইতে প্রাপ্ত অধিকার বিফল করিবার জন্য আমাদিগকে (রাজপুরুষদিগকে) কুটিল পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

We have had to choose between prohibiting them and cheating them, and we have chosen the least straightforward course.

প্রত্যক্ষভাবে ভারতবাসীর নিয়োগে বাধাদান বা প্রবঞ্চনা দ্বারা তাহাদিগের গতিরোধ ভিন্ন আমাদিগের অন্য উপায় ছিল না। এতদুভয়ের মধ্যে আমরা শেষোক্ত কুটিল উপায়ের অবলম্বনই সঙ্গত মনে করিয়াছি।

এই বলিয়া লর্ড লিটন বাহাদুর উদাহরণস্বরূপ সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষার্থী ভারতীয় যুবকদিগের বয়স-হ্রাস-বিষয়ক নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় ইংরাজ শাসনের ইতিহাসে এই প্রকার ঘটনা বিরল নহে।

ডিউক অব্ আর্জিল (Argyll) ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই সকল প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

We have not fulfilled our duty or the promises and engagements which we have made.

আমরা (ভারতবর্ষ সম্বন্ধে) আমাদিগের কর্তব্যপালন করি নাই, আমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা রক্ষা করি নাই।

খৃঃ ৮৮৩ অব্দে লর্ড নর্থব্রুক মহোদয় ১৮৩৩ সালের পার্লামেণ্টের প্রদত্ত আদেশ ও ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণাপত্রের প্রতিশ্রুতিসমূহ কার্যে পরিণত করা হইতেছে না বলিয়া অভিযোগ করিলে ভূতপূর্ব ভারতসচিব লর্ড সল্সবরি ঐ সকল আদেশ ও প্রতিশ্রুতিকে সর্বজনসমক্ষে অম্লান বদনে Political hypocrisy বা "রাজনীতিক কপটতা" বলিয়া উড়াইয়া দেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ রাজপুরুষই বলিয়াছিলেন,—

India must be bled.

"ভারতবাসীর শোণিত-শোষিত হইবেই!"

এইরূপে একদিকে পার্লামেণ্ট ও বৃটিশ মনীষীগণ ভারতবাসীর উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতেছিলেন, অন্যদিকে বহুসংখ্যক কুটিল-প্রকৃতি ও অবৈধ-ক্ষমতাপ্রিয় রাজপুরুষ ভারতবাসীদিগের উন্নতিমার্গে সযত্ন কণ্টকারোপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই কারণে ভারতবাসী বৃটিশ শাসনে বাঞ্ছিত সুখসমৃদ্ধি লাভ

করিতে পারিল না। তাহারা বৃটিশ প্রজার প্রকৃত অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিল। ভারতে বৃটিশ শাসনের সুফলের সঙ্গে সঙ্গে—শান্তি প্রতিষ্ঠা, ন্যায়-বিচার ও জ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, দুর্নীতিপরায়ণ রাজপুরুষদিগের দুর্ব্যবহারে যে প্রজাকুলের স্বাস্থ্য, সম্পত্তি ও চরিত্রগত অবনতির সূত্রপাত হইবে, একথা দূরদর্শী নীতি-বিশারদ ব্যক্তিগণ বহুপূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

The consequence of the conquest of India by British arms would be, in place of raising, to debase the whole people."
—Sir Thomas Munro.

বৃটিশ জাতির দ্বারা ভারতবর্ষ বিজয়ের ফলে, উন্নতির পরিবর্তে সমগ্র ভারতবাসীর অধোগতি সাধিত হইবে।

স্যার টমাস মনরোর এই ভবিষ্যদ্বাণী বহু অংশে ফলবতী হইয়াছে। ভূতপূর্ব গবর্নর জেনারেল স্যার জন শোর মহোদয় বলিয়াছিলেন,—

"There is reason to conclude that the benefits are more than counterbalanced by evils inseparable from the system of a remote foreign dominion."

ইংরাজ শাসনে ভারতবাসীর উপকার অপেক্ষা অপকার যে বহুগুণে অধিক হইতেছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ আছে। দূরস্থিত বৈদেশিক রাজশক্তির শাসনফলে এরূপ অপকার অনিবার্য।

মিঃ মেরিডিথ টাউনসেণ্ড প্রণীত Asia and Europe নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত মন্তব্য দৃষ্টিগোচর হইবে,—

"It is the active classes who have to be considered, and to them our rule is not, and cannot be a rule without prodigious drawbacks······The greatest one of all is the loss of the interestingness of life. It would be hard to explain to average Englishman how 'interesting Indian life must have been before our advent ; how completely open was every career to the bold, the enterprising or the ambitious······Life was full of dramatic changes. I firmly believe that to the immense majority of the active classes of India the old time was a happy time."

ভারতের কর্মশীল জনসাধারণের উন্নতির পক্ষে আমাদিগের শাসন ভয়ঙ্কর

বিঘ্নসঙ্কুল; আমাদিগের শাসনে এই বিঘ্ন তিরোহিত হইতে পারে না। ইংরাজ-শাসনে, তাহাদিগের জীবনে সরস ঘটনা-বৈচিত্র্যের অভাব ঘটিয়াছে; ইহাই তাহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি। আমাদিগের আগমনের পূর্বে ভারতবাসীর জীবন কিরূপ মনোহর বৈচিত্র্যময় ছিল, সাহসী, উৎসাহপরায়ণ ও উচ্চাভিলাষ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে সর্ববিষয়ে সাফল্যলাভ কিরূপ সহজ ছিল, তাহা সাধারণ শ্রেণীর ইংরাজদিগকে বুঝান কঠিন। ভারতবাসীর জীবন তখন নাটকের ন্যায় ঘটনাবহুল ও পরিবর্তনশীল ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অন্ততঃ কর্মশীল ভারতবাসীগণের অধিকাংশ ইংরাজের আগমনের পূর্বে পরম সুখে দিনযাপন করিত।

বর্তমানকালের রাজপুরুষেরা যে এ-কথা বুঝিতে পারিতেছেন না, তাহা নহে। ভূতপূর্ব ভারত সচিব লর্ড জর্জ হ্যামিল্‌টন স্বীকার করিয়াছেন,—

"Our Government never will be popular in India." "Our Government never can be popular in India."

(The Times, 16. 6. 99)

অর্থাৎ আমাদিগের শাসন ভারতবর্ষে কখনও জন-প্রিয় হইবে না—কখনও জন-প্রিয় হইতে পারে না।

ভারতীয় প্রজার বিধাতৃ-পুরুষের মুখে এরূপ নিষ্ঠুর বাণী শ্রবণ করিলে হৃদয়ে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হয়!

ইংরাজের শাসনপ্রণালী যে সকল দোষে দুষ্ট হওয়ায় ভারতীয় প্রজাকুলের অবনতির কারণ-স্বরূপ হইয়াছে, তৎসমূহের নিরাকরণ না ঘটিলে বৃটিশ শাসন এদেশবাসীর সুখকর হইবে না। এই কারণে বৃটিশ শাসনপদ্ধতির দোষ-গুণের ও তৎফলাফলের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। আলোচনা ভিন্ন কখনও দোষের সংশোধন হয় না।

দেশের অবস্থা

"কহিতে বুক চায় দু'ভাগ হ'তে।
নয়নে উথলে জল-স্রোত শতে॥"

ইংরাজ ত্রিবিধ সংগ্রামে ভারতবর্ষ জয় করিয়া নির্বিঘ্নে শাসন-দণ্ডের পরিচালন করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের সংগ্রামকে আমরা "বাহুযুদ্ধ" নামে অভিহিত করিতে পারি। রাজনীতিক কূট কৌশলে, ও অভিনব অস্ত্র-শস্ত্রের বলে, ইংরাজ এদেশে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তাহা এই প্রকার সংগ্রামের ফল। প্রাচীন কাল হইতে ইংরাজের আগমন কাল পর্যন্ত এদেশে এইরূপ সংগ্রামই রাজ্যলাভের

একমাত্র উপায় বলিয়া পরিগণিত ছিল। দেশবাসীর বাহুবল বিনষ্ট বা বিনত হইলেই এত দিন বিজেতারা সন্তুষ্ট হইতেন। এই কারণে এই প্রকার যুদ্ধকে "বাহু-যুদ্ধ" নামে অভিহিত করিয়াছি। ইহাকে ""শারীর যুদ্ধ" নামেও আখ্যাত করিতে পারা যায়।

ইংরাজের এদেশে পদার্পণের পর হইতে ভারতবাসী এক অভিনব সংগ্রামের পরিচয় প্রাপ্ত হইল। এই সমরে আহুত হইয়া তাহারা আপনাদিগের ধন-বল হারাইল। পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, আমরা "বাণিজ্য-সংগ্রামের" কথা বলিতেছি। বণিক-রাজ ইংরাজের সহিত বাণিজ্য-যুদ্ধে আমরা কতদূর বিপন্ন হইয়াছি, তাহা অনেকেরই সুবিদিত আছে। একশত বৎসর পূর্বে যে ভারতবর্ষ অশেষ শিল্প-পণ্যের প্রধান উৎপত্তি-স্থান ছিল, এশিয়া ও ইউরোপের বিপণী-শ্রেণী যাহার শিল্প-সামগ্রীতে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকিয়া বৈদেশিকদিগের বিস্ময় ও অসূয়া উৎপাদন করিত, সেই ভারতবর্ষের অধিবাসীরা এখন সামান্য সূচীসূত্র-ক্রীড়নক হইতে যন্ত্র-যানাদির উপকরণ পর্যন্ত,—জীবনযাত্রা ও সমাজযাত্রা-নির্বাহোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যের জন্য নিতান্ত দীনের মত পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছেন। এদেশে এক্ষণে ইংরাজের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভারতবাসীর বাহুবল ও অস্ত্রবল-হ্রাসের সহিত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজের "বাহু-যুদ্ধ" ইদানীং স্থগিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদিগের বাণিজ্য-সংগ্রামের অদ্যাপি বিরাম হয় নাই, কখনও হইবে কি না, ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন। বাষ্পীয় শকট, তাড়িত বার্তাবহ, পণ্যবাহী অর্ণবপোত ও অবাধ বাণিজ্যনীতি এই সমরের প্রধান অস্ত্র। প্রবল রাজশক্তির দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত শ্বেতাঙ্গ বণিকসমাজ এই সমরের যুযুৎসু। দুর্বল ভারতবাসীর ধন-হরণ ও ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যাদির বিনাশ ইহার প্রধান লক্ষ্য। এই সংগ্রামে দিন দিন আমাদিগের ধনবল হ্রাস পাইতেছে। দুর্ভিক্ষ আমাদিগের নিত্য-সহচর হইয়াছে। দেশবৎসল কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

"নিজ অন্ন পরে কর-পণ্যে দিলে!
পরিবর্ত ধনে দুর্ভিক্ষ নিলে!!"

ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে নেত্রপাত করিলে, দুর্ভিক্ষের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই কিরূপ ঘনিষ্ঠ হইতেছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইবে। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সর্বত্র একপ্রকার অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, ইংরাজী ইতিহাসে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ শতবৎসরের মধ্যে ভারতে চারিবারের অধিক দুর্ভিক্ষ-পাত হয় নাই। দুর্ভিক্ষের বিক্রমও এক একটি প্রদেশেই আবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে ইংরাজের শাসন ক্রমশঃ বিস্তারলাভ

করিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসও আপনার আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদে বা ১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কালে সমগ্র বৃটিশ ভারতে দশ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষজনিত অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। উহার দ্বিতীয় পাদে পাচ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এদেশে সিপাহীবিদ্রোহ সংঘটন ও পরিণামে সমগ্র ভারতে ইংরাজ-শসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেই পঞ্চবিংশ বৎসরে দুর্ভিক্ষও আপনার শাসন এদেশে সুদৃঢ় করিয়াছে। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, খৃষ্টীয় ১৮৫০ অব্দ হইতে ১৮৭৫ অব্দের মধ্যে বৃটিশ ভারতে ছয়বার দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে পঞ্চাশ লক্ষ ভারতবাসী জঠর-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের দুর্ভিক্ষ-কাহিনী অধিকতর শোকাবহ। এই পঞ্চবিংশ বর্ষের মধ্যে এদেশে অষ্টাদশবার দুর্ভিক্ষ-দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই মহানলে প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ মহাপ্রাণী ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শুদ্ধ বিগত দশবৎসরেই এক কোটি ৯০ লক্ষ ভারত-সন্তান "হা অন্ন! হা অন্ন!" করিয়া বিষম যন্ত্রণায় প্রাণ-বিসর্জন করিয়াছে। এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার বর্ণনা-প্রসঙ্গে, "দুর্ভিক্ষ-নিহত" হতভাগ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া মহামতি উইলিয়ম ডিগ্‌বী, সি. আই. ই. মহোদয় গভীর খেদ সহকারে বলিয়াছেন,—

You have died. You have died uselessly.

"তোমরা মরিরাছ। তোমরা অনর্থক মরিয়াছ!"

সাধারণের বিশ্বাস যুদ্ধে যেরূপ লোক-ক্ষয় হইয়া থাকে, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে এই ধারণার ভ্রমাত্মকতা প্রতিপন্ন হইবে। ডিগ্‌বি মহাশয় দেখাইয়াছেন, বিগত ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এক শত সাত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহে সর্বসমেত ৫০ লক্ষের অধিক লোক নিহত হয় নাই। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে, ভারতে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ লোক অনশনে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে।

তৃণাভাবে গো-মেষ-মহিষাদি যে কত মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ফলতঃ ভারতের দুর্ভিক্ষ সর্বলোকের ভয়প্রদ মহাসমর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "ভারতীয় দুর্ভিক্ষের সহিত ইংরেজের বাণিজ্য-সংগ্রামের সম্বন্ধ কি? দেবতা বৃষ্টি না দিলে ক্ষেত্রের শস্য ক্ষেত্রে পুড়িয়া যায়। দেবতা বিরূপ হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে।" যাঁহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহারা এ বিষয়ের সম্যক্ তত্ত্ব অবগত নহেন। এই বিশাল ভারত-ভূমির সর্বত্র

কখনও এককালে অনাবৃষ্টি হয় না—অন্ততঃ বিগত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে এরূপ অভাবনীয় ঘটনা কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। ভারতের এক অংশে অনাবৃষ্টি হইলেও অন্য অংশে সুবৃষ্টির কখনও অভাব হয় না। সুবৃষ্টি হইলে ভারতের এক চতুর্থাংশ ভূমিতে এত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে যে, তাহাতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশসমূহের অধিবাসীদিগের অনশন-মৃত্যু অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। দেশের সর্বত্র রেলপথের বিস্তার হওয়ায় এক প্রদেশের অন্ন অল্প সময়ের মধ্যে অন্য প্রদেশে প্রেরণ করাও কষ্ট-সাধ্য নহে। রাজপুরুষেরা বলেন, দুর্ভিক্ষকালে অন্নবহনের সৌকর্যবিধানের উদ্দেশ্যেই বহু ব্যয় ও ক্ষতি-স্বীকার করিয়া এ দেশের সর্বত্র রেলপথ নির্মাণ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এতৎ সত্ত্বেও ভারতে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আসল কথা এই যে, শস্যাভাব ভারতীয় দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ নহে। পৃথিবীতে এরূপ অনেক দেশ আছে, যেখান জন-সংখ্যার অনুপাতে শস্যোৎপাদন-যোগ্য ভূমির পরিমাণ অতি সামান্য। বিলাতেই কৃষি-যোগ্য ভূমির অভাব অত্যন্ত অধিক। তথায় যে শস্যাদি উৎপন্ন হয়, তাহাতে সমগ্র ইংলণ্ডবাসীর ৯১ দিনের অধিক উদর-পূর্তি হওয়া অসম্ভব। তথাপি বৎসরের অবশিষ্ট ২৭৪ দিন ইংলণ্ড-বাসীকে অনশনে যাপন করিতে হয় না। জর্মানির অবস্থাও অনেকাংশে এইরূপ। তত্রত্য লোকদিগকে যদি স্বদেশোৎপন্ন শস্যের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে বৎসরের মধ্যে ১০২ দিন তাহাদিগের অন্নাভাব ঘটে। হল্যাণ্ড, মার্কিন প্রভৃতি দেশে সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি ঘটিয়া কৃষিকার্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তথাপি সে সকল দেশে কখনও দুর্ভিক্ষ-পাত হইয়াছে, এরূপ কথা শুনা যায় না।

সুতরাং দেশে শস্যাভাব ঘটিলেই যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, এমন কথা বলা অসঙ্গত। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায় বা দৈবের বিড়ম্বনায় অন্নকষ্টের সম্ভাবনা হইলে সভ্যজাতি মাত্রেই দূরদেশ হইতে শস্য আনয়ন করিয়া আপনাদিগের প্রয়োজন-সিদ্ধি করিয়া থাকেন। আমাদিগের ভারতবর্ষ হইতেই প্রতি বৎসর প্রায় ১৬½ কোটি টাকার গোধূম-তণ্ডুলাদি সমুদ্র-পথে ঐ সকল দেশে গমন করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। ইউরোপীয় দেশসমূহের লোকেরা সহস্র-যোজন-দূরবর্তী দেশ হইতে শস্যসংগ্রহ-পূর্বক সুখ ও স্বচ্ছন্দতা-সহকারে কালযাপন করে, আর ভারত-সন্তান গৃহপার্শ্বে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র থাকিতেও দলে দলে অনশনে প্রাণত্যাগ করে।

ভারতবাসীর ধন-বলের অভাবই এদেশে ঘনঘন দুর্ভিক্ষ-ঘটনার প্রধান কারণ। ভারতে অন্নাভাব অপেক্ষা অর্থাভাব সমধিক প্রবল। ইংরাজের বাণিজ্য-সংগ্রামে

জর্জরিত হইয়া আমরা এরূপ কপর্দক শূন্য হইয়া পড়িয়াছি যে, এক বৎসর দৈব দুর্বিপাকে ক্ষেত্রের শস্য ক্ষেত্রে মরিয়া গেলে আমাদের আর আত্ম-রক্ষার উপায় থাকে না। দেশের শিল্প-বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় কৃষিই এখন শতকরা ৮৫ জনের একমাত্র উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। অনাবৃষ্টি-হেতু কৃষি নিষ্ফল হইলে লোকে এখন একেবারে সম্বল-শূন্য হইয়া পড়ে। অন্য স্থান হইতে শস্য-ক্রয় করিবার জন্য যেরূপ অর্থ-বলের প্রয়োজন, সেরূপ অর্থ-বল অনেকেরই নাই। দেশবাসীর নিকট যদি শস্য-ক্রয়োপযোগী অর্থ থাকিত, তাহা হইলে ঘোর দুর্ভিক্ষের বৎসরেও আমাদের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ গোধূম-তণ্ডুলাদি বিদেশে রপ্তানি হইত কেন? লোকের তণ্ডুল কিনিবার শক্তি থাকিলে দুর্ভিক্ষ-কালে কখনই রাজানুগ্রহজীবীর (পুওর হাউস বা সরকারি অন্নসত্রে ও রিলিফ আশ্রয়-গ্রহণকারীর) সংখ্যা এত অধিক হইত না। পূর্বে দেশে শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হেতু লোকের অর্থোপার্জনের বহু পথ উন্মুক্ত ছিল, অর্থ-সঙ্গতি অধিক ছিল। তখন কৃষকের সংখ্যা অল্প ও কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকায় কৃষিকার্যেও যথেষ্ট অর্থাগম হইত। এই সকল কারণে, সেকালে দেশে দুর্ভিক্ষ-পাত হইলেও তাহার পরিণাম এখনকার মত ভয়াবহ হইত না। ইদানীং ইংরাজের সহিত বাণিজ্য-সংঘর্ষে বিপন্ন হওয়ায় লোকের ধনবল দিন দিন যতই কমিয়া আসিতেছে, ততই দেশে দুর্ভিক্ষের ভীষণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাবতে অর্থের দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইলেই অন্নের দুর্ভিক্ষও বিরল হইবে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আর্ল ক্রোমার মহোদয় গবর্নমেণ্টের আদেশে ভারতবাসীর আয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, গড়ে ভারতবাসীর আয় প্রতি জনে বার্ষিক ২৭ টাকা মাত্র। সেই সময়ে পার্শী-প্রবর শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদিগের বার্ষিক আয় গড়ে জনপ্রতি ২০ টাকার অধিক নহে। ইহার পর লর্ড ডাফরিনের আদেশক্রমে এদেশবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একবার অনুসন্ধান হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা সত্ত্বেও সে অনুসন্ধানের বিবরণ ও ফল এদেশের কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই। কিছুদিন হইল, মিঃ ডিগ্‌বী মহোদয়ের চেষ্টায় উহার কতিপয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল অংশে এদেশের লোকের দুরবস্থার যে শোচনীয় চিত্র প্রকটিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কোনও হৃদয়বান ব্যক্তিই অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, গত ১৯০১ সালের মার্চ মাসে লর্ড কার্জন বাহাদুর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, বিগত দশ বৎসরের দুর্ভিক্ষাদিজনিত অসীম ক্ষতি সত্ত্বেও ইদানীং বৃটিশ ভারতীয় প্রজার বার্ষিক আয়

গড়ে জনপ্রতি অন্যূন ৩০ টাকা হইয়াছে। কিন্তু ডিগ্‌বী মহোদয় অশেষ শ্রম-সহকারে তাঁহার মতের বিশেষভাবে সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সরকারি গণনায় বহুল ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। মিঃ ডিগ্‌বীর গণনামতে এক্ষণে বৃটিশ শাসনাধীন ভারত-সন্তানের বার্ষিক আয় গড়ে প্রতিজনে ঊর্ধ্ব সংখ্যায় ১৮'৫৬ মাত্র!

এই আয়ের অধিকাংশই কৃষিলব্ধ। ইহার প্রায় এক-সপ্তমাংশ ২'৪৩ রাজকর প্রদানে ব্যয়িত হয়। আয়ের অনুপাতে ইংলণ্ডবাসীকে প্রতি পাউণ্ডে ১ শিলিং ৮ পেন্স বা ১'২৫ টাকা ও ভারতবাসীকে (বার্ষিক আয় গড়ে ৩০ টাকা বলিয়া স্বীকার করিলে) দুই শিলিং চাব পেন্স বা একটাকা পঁচাত্তর পয়সা করিয়া ট্যাক্স দিতে হয়। সে যাহা হউক, মিঃ ডিগ্‌বীর হিসাবে এদেশের ধনী, দরিদ্র, বালক, বৃদ্ধ সকলের বার্ষিক আয় (ট্যাক্স বাদে) গড়ে প্রতি জনে ১৫।১৬ টাকার অধিক নহে। সঞ্চিত অর্থের হিসাব করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতবাসীর সঞ্চিত ধনের পরিমাণ নগদ ও অলঙ্কারাদিতে গড়ে জনপ্রতি ১৪ টাকা মাত্র।

ইহার সহিত একবার শিল্প-বাণিজ্য প্রধান পাশ্চাত্য দেশসমূহের অধিবাসিবৃন্দের আয়েব তুলনা করুন,—

দেশ	বার্ষিক আয় প্রতিজনে	দেশ	বার্ষিক আয় প্রতিজনে
রুশিয়া	১১ পাউণ্ড	জর্মানি	২২ পাউণ্ড
ইটালি	১২ ,,	ক্যানাডা	২৬ ,,
অষ্ট্রিয়া	১৫ ,,	ফ্রান্স	২৭ ,,
স্পেন	১৬ ,,	বেলজিয়াম	২৮ ,,
সুইজারল্যাণ্ড	১৯ ,,	যুক্তরাজ্য (মার্কিন)	৩৯ ,,
নরওয়ে	২০ ,,	অস্ট্রেলিয়া	৪০ ,,
হল্যাণ্ড	২২ ,,	স্কট্‌ল্যাণ্ড	৪৫ ,,

ইংলণ্ডবাসীর বার্ষিক আয় ও সঞ্চিত ধনের পরিমাণ গড়ে জনপ্রতি যথাক্রমে ৪২ ও ৩০০ পাউণ্ড! (আমাদের ১৫ টাকায় বিলাতী এক পাউণ্ড হয়)।

উল্লিখিত আয়ের সহিত তুলনা করিলে লর্ড কর্জন বাহাদুরের নির্দিষ্ট ভারতবাসীর (বার্ষিক ত্রিশ টাকা) আয়ও অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। পাশ্চাত্যদেশসমূহে জীবিকানির্বাহ ভারতের ন্যায় স্বল্প-ব্যয়সাধ্য নহে, এ-কথা স্বীকার করি। তথাপি ভারতবাসীর বর্তমান আয় যে স্বচ্ছন্দতার সহিত জীবিকা-নির্বাহের উপযোগী নহে, এ-কথাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ হণ্টার সাহেব বরমিংহাম নগরে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে চারিকোটি লোক অর্ধাশনে জীবন-যাপন করে। সে সময়ে বৃটিশ ভারতের লোকসংখ্যা বিংশতি কোটিরও ন্যূন ছিল। বঙ্গের ভূতপূর্ব ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট বাহাদুর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সেটেলমেণ্ট অফিসররূপে কার্য করিবার সময় দেশবাসীর অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক বলিয়াছিলেন,—

"I do not hesitatte to say that half our agricultural population never know from year's end to year's end what it is to have their hunger fully satisfied."

অর্থাৎ বৃটিশ ভারতীয় কৃষিজীবী প্রজার অর্ধাংশ সংবৎসরের মধ্যে এক দিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তিতে যে কিরূপ সুখ, তাহা ইহারা কখনও জানিতে পারে না।

বৃটিশ ভারতে প্রায় বিংশতি কোটি লোক কৃষিকার্য করিয়া জীবন-ধারণ করে। স্যার চার্লস ইলিয়টের উক্তি অনুসারে এই বিংশ কোটির মধ্যে দশ কোটি লোক চিরকাল অর্ধাশনে যাপন করে। ইলিয়ট মহোদয় যখন এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন এদেশে বিশ কোটি লোক কৃষিজীবী ছিল না সত্য; কিন্তু এলাহাবাদের অর্ধ-সরকারি সংবাদপত্র "পাইওনীয়ার" ১৮৯৩ সালে মে মাসে ভারতীয় দারিদ্র্যপ্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে দশ কোটি ভারত প্রজার অর্ধাশনের কথাই সপ্রমাণ হয়। উক্ত পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন,—

Nearly one hundred millions of people in British India are living in extreme poverty.

অর্থাৎ বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের প্রায় দশ কোটি লোক দারিদ্র্যে কাল-যাপন করে।

যে সমাজ এইরূপ ঘোর দারিদ্র্যে নিপীড়িত, সে সমাজে আধি-ব্যাধির প্রকোপ সহজেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বৃটিশ ভারতেও নিত্য নব রোগের সঞ্চার হইতেছে। ভারতবাসীর শরীর ক্রমেই ব্যাধি-মন্দিরে পরিণত হইতেছে। প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর কারণ যে, অন্নকষ্ট ও দারিদ্র্য, এ কথা বিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকে। যে সকল দেশের লোকের পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ-সংগ্রহে অর্থের অভাব হয় না, সে সকল দেশে প্লেগের প্রকোপ দেখিতে পাই না। পূর্বে ইউরোপে ঘন ঘন প্লেগের আবির্ভাব হইত ও তাহাতে সহস্র সহস্র নরনারী প্রাণত্যাগ করিত। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্যে পাশ্চাত্য ভূ-খণ্ডের দারিদ্র্য দূরীভূত

হইবার পর হইতে আর তথায় প্লেগের বিক্রম প্রকাশ পায় না। ফল কথা, সমাজের ধনবল যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে, মহামারীর প্রকোপও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকে।

দারিদ্র্য-বশতঃ জ্বরের প্রভাবও ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারি মেডিকেল রিপোর্টে প্রকাশ যে—

Fever is a euphemism for insufficient food, scanty clothing and unfit dwelling.

পুষ্টিকর খাদ্য ও পর্যাপ্ত বস্ত্রের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানই জ্বর রোগের প্রধান কারণ। প্রতি বৎসর ভারতে অন্যূন পাঁচ কোটি লোক জ্বরের যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এই পাঁচ কোটির মধ্যে ৫০ লক্ষের অধিক লোক ইহধাম পরিত্যাগ করে। দশ বৎসর পূর্বে জ্বর রোগে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা এখনকার অপেক্ষা প্রায় ১৫ লক্ষ কম ছিল! ভারতবাসীর অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, এই দুর্ঘটনা হইতেও তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

অর্থাভাব, অন্ন-কষ্ট ও আধি-ব্যাধির পরিমাপ-বৃদ্ধির সহিত ভারতবাসীর আয়ুঃক্ষয়ও ঘটিতেছে। ইংলণ্ডবাসীর জীবনকালের পরিমাণ গড়ে ৪০ বৎসর বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ভারতবাসীর আয়ুষ্কাল যে ইদানীং গড়ে ২৩ বৎসরের অধিক নহে, মহামতি ডিগ্‌বী তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতাকালে সরকারি রিপোর্ট অবলম্বনে দেখাইয়াছেন যে, বিগত বিংশতি বৎসর হইতে ক্রমাগত ভারতবাসীর মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ শাসনাধীন প্রদেশে গড়ে হাজার করা ২৩ জন মরিয়াছিল। ১৮৮৫ খৃঃ প্রতি সহস্র জনের মধ্যে ২৬ জন, ১৮৮৯ খৃঃ ২৮ জন, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৩২ জন, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৩৫ জন, ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ৩৬ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে!

বৃটিশ ভারতীয় প্রজাগণের দিন দিন কিরূপ বংশ-ক্ষয় হইতেছে, তাহা নিম্নের তালিকায় নেত্রপাত করিলে উপলব্ধ হইবে,—

১৮৭০	সাল	——	১৮,৫৫,৩৭,৮৫৯	লোকসংখ্যা
১৮৮১	,,	——	১৯,৮৭,৯০,৮৫৩	,,
১৮৯১	,,	——	২২,১১,৭২,৯৫২	,,
১৯০১	,,	——	২৩,১০,৮৫,১৩১	,,

ইংলণ্ডীয় যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি বৎসরে গড়ে প্রতি সহস্রে ২৮ জন

এবং ইটালি ও জার্মানিতে যথাক্রমে ৩৫ ও ৩৬ জন করিয়া লোক বৃদ্ধি পায়। তথাপি ঐ সকল দেশে ভারতের ন্যায় সকলে বিবাহ করিয়া দাম্পত্য-জীবনযাপন করিতে বাধ্য হয় না; রমণীগণও গর্ভধারণ ও সন্তান-পালনের ক্লেশ স্বীকারে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৮৮৪ খৃঃ অনুমান করিয়াছিলেন বৃটিশ ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে গড়ে প্রতি সহস্রে ১০ হইতে ১৫ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহহীন দাম্পত্যজীবন-প্রিয় শান্তিপূর্ণ উর্বর দেশে শতকরা বৎসরে ১.৫০ হিসাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া কিছুই অধিক নহে। এতদনুসারে ১৯০১ সালের লোক-গণনায় বৃটিশ ভারতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ২৮ কোটি ২১ লক্ষ, ৭৯ হাজার ৮৮৬ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাহা হয় নাই, তদপেক্ষা ৫ কোটি ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৫৪ কম হইয়াছে। ১৮৮১ সালের লোক-গণনার সময় ব্রহ্মদেশের লোকসংখ্যা ৯২.২৫ লক্ষ। এই জনসংখ্যা বাদ দিলে ১৮৯১ ও ১৯০১ সালের পরিমাণ আরও কমিয়া যাইবে।

সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বিগত দশ বৎসরে, শতকরা গড়ে ২.৫০ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী দশ বৎসরে (১৮৮১—১৮৯১ খৃঃ) কেবল বৃটিশ ভারতেই জনসংখ্যা শতকরা ১১.২৫ হারে বাড়িয়াছিল: দেশীয় রাজ্যসমূহের বৃদ্ধির হার এতদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। বঙ্গদেশের লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির হারও বিগত ত্রিশ বৎসরে অনেক কমিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ, প্রথম দশ বৎসরে শতকরা ১১.৫০ জন, পরবর্তী দশ বৎসরে ৭.২৫ জন ছিল। শেষ দশ বৎসরে উহা পাচ জনে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ বঙ্গদেশে ত্রিশ বৎসরে বৃদ্ধির হার অর্ধেক কমিয়াছে!

কেবল যে জনসংখ্যাই দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, তাহা নহে। গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও ভারতবর্ষে ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। অস্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা চল্লিশ লক্ষ মাত্র, অথচ তত্রত্য পশুর সংখ্যা ১১ কোটি ৩৫.৫০ লক্ষেরও অধিক। তদনুপাতে ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষি-প্রধান ও জনবহুল দেশে ২৬১৮০ কোটি গৃহপালিত পশু থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সমগ্র বৃটিশ ভারতে এক্ষণে গো-মেষ-মহিষ-অশ্ব-অশ্বতর-ছাগাদিতে পূর্ণ দশকোটি পশুর অধিক বিদ্যমান নাই। গৃহপালিত ও কৃষিকার্যোপযোগী পশুর বংশ যে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, বিগত দশ বৎসরের সরকারি রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

অর্থাভাবে যেমন কৃষিকার্যোপযোগী পশুকুলের হ্রাস হইতেছে, সেইরূপ কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ও উৎকর্ষ কমিয়া যাইতেছে। বৃটিশ ভারতে গোধূম, ইক্ষু, কার্পাস, পাট, নীল ও সর্ষপাদির আবাদ বিগত দশ বৎসর হইতে কমিতেছে।

১৮৯১ সাল হইতে ইক্ষুর অবনতি ঘটিয়াছে। ১৮৯৩ হইতে কার্পাস ও সর্ষপাদির চাষ কমিয়া গিয়াছে। আজকাল ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর যে তুলা বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহার পাঁচ ভাগের চারি ভাগ দেশীয় করদ রাজ্যসমূহে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৮৯০।৯১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ভারতে সর্বশুদ্ধ ৫৮৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৯০ হাজার বিঘা ভূমি কর্ষিত হইয়াছিল। ১৮৯৯ সালে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ৫৯৯ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬১ হাজার বিঘা হয়। ইহার মধ্যে ব্রহ্মদেশ, সিন্ধু, আসাম, কুর্গ ও আজমীর প্রভৃতি দেশে এক কোটি ষাট লক্ষ কুড়ি হাজার বিঘা নূতন ভূমিতে চাষ হইয়াছে। এই নূতন আবাদী জমির পরিমাণ বাদ দিলে দৃষ্ট হইবে যে, বৃটিশ ভারতীয় পুরাতন প্রদেশগুলিতে বিগত দশ বৎসরে ৯৭,৮০,০০০ বিঘা জমি কমিয়াছে অর্থাৎ কৃষিকার্যের অযোগ্য হইয়াছে, মাননীয় অধ্যাপক গোখলে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

মিঃ ডিগ্‌বী বলেন, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের পর বৃটিশ ভারতে চার কোটি আশী লক্ষ বিঘা জমি বাড়িয়াছে ; তথাপি ভারতের কৃষিলব্ধ আয় বিংশতি বৎসর পূর্বের আয়ের অপেক্ষা ৬৪,২১,৬৫,৪৩৮ টাকা কম হইয়াছে। লোকের যদি পূর্ববৎ অর্থবল থাকিত, প্রতিবৎসর সার দিয়া ভূমির উৎকর্ষ রক্ষা করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে কৃষিযোগ্য ভূমির এরূপ অপকর্ষ ও বিলোপ ঘটিত না।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ স্যামুয়েল স্মিথ বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন,—"ভারতীয় আয়করের তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, সেখানে প্রতি সাত শত জনের মধ্যে একজনমাত্র লোকের আয় বার্ষিক পাঁচ শত টাকা।" স্মিথ মহোদয় যদি জানিতেন যে, এদেশের এসেসার মহাশয়েরা সরকারের আয় বাড়াইয়া আপনাদিগের পদোন্নতি ঘটাইবার আশায় কত স্বল্পবিত্ত লোকের নিকট হইতেও অন্যায়ভাবে আয়কর আদায়ের চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বলিতেন যে, ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে হাজার করা একজনের আয় পাঁচ শত টাকা! এদেশে ধনীর সংখ্যা কিরূপ বিরল, ইহা হইতেই তাহা সকলের বোধগম্য হইবে।

ভারতবাসীর দারিদ্র্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে পার্লামেণ্টের অন্যতম সদস্য মিঃ জে. সেমুর (Mr. J. Seymour Keay) মহোদয়ের সংগৃহীত আর একটি তালিকার প্রতি মনোযোগ করিতে হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ সেমুর দেখাইয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে ধনবানের সংখ্যা এইরূপ—

সংখ্যা	পদ	বার্ষিক আয়
১০,০০০	রাজা, মহারাজা, জমিদার আদি	৫০,০০০ টাকা
৭১,০০০	ব্যবসায়ী মহাজন আদি	১০,০০০ "
৭,৫০,০০০	দোকানদার আদি	১,০০০ "

(এই ৮,৩৫,০০০ জনের মোট আয় ২০০ কোটি টাকা।)

এই সকল ধনশালী ব্যক্তির অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী। যে সকল রাজা, জমিদার ও মহাজন বৃটিশ ভারতে বাস করেন, তাঁহাদিগের আয় ধরিয়া ডিগ্‌বী মহোদয় দেখাইয়াছেন যে, বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবাসীর আয় প্রতিজনে গড়ে বাৎসরিক ১৮'৫৬ মাত্র! এক্ষণে বড়লোকদিগের (অর্থাৎ যাঁহাদিগের আয় বাৎসরিক সহস্র মুদ্রার অধিক) আয় বাদ দিলে ভারতীয় সাধারণ প্রজার আয় গড়ে ১৮'৫৬ টাকার অপেক্ষা অনেক কম হইবে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

এই প্রসঙ্গে ট্যাক্সের কথাও একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভারতবাসীকে গড়ে প্রতিজনে বার্ষিক দুই টাকা তেতাল্লিশ পয়সা কর দিতে হয়। ইহা অবশ্য সরকারী পক্ষের কথা। কিন্তু এই দুই টাকা তেতাল্লিশ পয়সায় "ছোট খাটো" অপ্রত্যক্ষ করের সমাবেশ করা হয় নাই। বিগত নবেম্বর মাসে বিলাতের এক স্থানে বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত দেখাইয়াছেন যে, বৃটিশ শাসিত ভারতের অধিবাসীকে গড়ে জনপ্রতি বার্ষিক সর্বসমেত সাড়ে তিন টাকা কর দিতে হয়। ইংলণ্ডে এইরূপ আয়ে এক টাকা পচাত্তর পয়সার অধিক কর গৃহীত হয় না। সামান্য আয়ে রাজাকে এইরূপ উচ্চ হারে কর দিতে হইলে সকল দেশেই প্রজার অন্ন-কষ্ট স্বভাবতঃ বৃদ্ধি হইতে পারে।

আসামের ভূতপূর্ব কমিশনার কটন সাহেব তাঁহার নব-ভারত (New India) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

The resources of India will vie with those of America itself. The dimensions of Indian trade are already enormous and yet *no country is more poor than this.*

ভারতের নৈসর্গিক সম্পদ (খনি, অরণ্য ও কৃষিজাত ধন) আমেরিকার অপেক্ষাও অধিক। এখানকার বাণিজ্যও বহু বিস্তৃত ; তথাপি ভারতের অপেক্ষা অধিকতর দরিদ্র দেশ পৃথিবীতে আর নাই।

কেন এরূপ হইয়াছে, ভারতভূমি রত্ন-গর্ভা হইলেও কেন তাহার সন্তানগণ ঘোর দারিদ্র-ভোগ করিতেছে, তাহার কারণ নির্দেশ-স্থলে মিঃ ডিগ্‌বী বলিয়াছেন,—

Because among other things we have destroyed native industries, and, besides, have taken from India since 1834-35 (according to a calculation made by that sane and moderate journal, the *Economist* two years ago. (in 1898).

more than ten thousand millions of Rupees.

India, on the other hand, has entirely lost her much more than ten thousand millions : this, with interest, and if circulated in the ordinary way among her people, at 5 p.c. interest value only would, by this time, have been of the value at least of *fifty thousand millions of Rupees.*

ভাবার্থ—ভারতবাসীর দারিদ্র্যের অন্যান্য কারণের মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম, ভারতীয় শিল্পের বিনাশ ও দ্বিতীয়, ভারতের ধন-শোষণ। আমরা (ইংরাজেরা) ভারতবর্ষীয় শিল্পের বিনাশ-সাধন করিয়াছি ও ১৮৩৪।৩৫ সাল হইতে ১৮৯৮ খৃঃ পর্যন্ত (ইকনমিস্ট পত্র-সম্পাদকের গণনানুসারে) এক সহস্র কোটি মুদ্রা ভারতবাসীর নিকট হইতে আদায় করিয়াছি। এই সহস্র কোটি মুদ্রা যদি ভারতবর্ষেই থাকিত ও শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদে ভারতবাসী কৃষক ও শিল্পীদিগকে ধার দিতে পারা যাইত, তাহা হইলে এতদিনে উহার পরিমাণ সুদ সহ ন্যূনকল্পে পঞ্চ সহস্র কোটি মুদ্রা হইত।

এতদ্ভিন্ন এদেশে বিলাতী মহাজনদিগের বহু শত কোটি টাকা খাটিতেছে। ইহার সুদ ও লভ্যাংশ-স্বরূপে এত দিনে কত টাকা বিদেশে গিয়াছে, তাহা নির্ধারণ করা সহজ-সাধ্য নহে। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে নগদ প্রায় এক সহস্র কোটি মুদ্রা প্রেরিত হইয়াছে। আজকাল এদেশ হইতে যে টাকা বিদেশে যাইতেছে, তাহার পরিমাণ শ্রবণ করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। এই বিষয়ের তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, রাজস্বে ও বিলাতী মহাজনের লাভে এদেশ হইতে বৎসরে পঞ্চশত কোটি মুদ্রা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। যে দেশ হইতে প্রতি বৎসর এরূপ অজস্র ধারায় অর্থহানি ঘটিতে থাকে, সে দেশে দশ কোটি লোক অর্দ্ধাশনে দিন-যাপন করিতে বাধ্য হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। দুর্ভিক্ষই বা সেই দেশবাসীর নিত্যসহচর না হইবে, কেন। অধ্যাপক সিলি তাঁহার Expansion of England নামক গ্রন্থে ভারতীয় দরিদ্র জন-সাধারণের দুরবস্থা-দর্শনে লিখিয়াছেন,—

Their susceptibilities dulled and their very wishes crushed out by want.

অর্থাৎ তাহাদিগের বোধ-শক্তি অবসন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বাসনা পর্যন্ত অভাবের পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে! শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ জাতীয় মহাসমিতির বিগত উনবিংশ অধিবেশন-কালে বলিয়াছেন, মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতন-কালে এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক অন্তর্বিগ্রহ ও অরাজকতার জন্য প্রাণ

হারাইত, এখন লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষজনিত অনশন-ক্লেশে জীবন বিসর্জন করিতে বাধ্য হইতেছে। ফলতঃ জনসাধারণের ভাগ্যে সেকাল ও একালে বিশেষ কিছুই প্রভেদ ঘটে নাই। তাঁহার উক্তি এই,—

We cannot forget that there is another side of the balance sheet. After all it makes but little difference whether millions of lives are lost on account of war and anarchy or whether the same result is brought about by famine and starvation.

মানসিক অবনতি

নীতি-শাস্ত্রবিদেরা বলিয়াছেন,—

"বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং।
ক্ষীণা জনা নিষ্করুণা ভবন্তি॥"

বৃটিশ ভারতের অধিবাসিগণ দিন দিন যেরূপ "অন্নের কাঙ্গাল" হইয়া উঠিতেছে, কদর্য অন্ন-ভক্ষণে ও অতিশ্রমে ক্রমশঃ যেরূপ ক্ষীণ-কায় ও হীনবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ধর্ম নীতি-বিষয়ে তাহাদিগের যে ক্রমে উন্নতি ঘটিবে, এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র। তথাপি সুখের বিষয় এই যে, পূর্বকালীন ঋষিদিগের পুণ্য-ফলে এখনও ভারতবাসীর মধ্যে পৃথিবীর অপর সকল দেশের অধিবাসী অপেক্ষা সমধিক সাত্ত্বিক ভাব পরিলক্ষিত হয়।

পাশ্চাত্য দেশের অপরাধের তালিকার সহিত তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, ভারতে অপরাধের ও অপরাধীর সংখ্যা অতি সামান্য: এদেশে অপরাধের প্রকৃতিও পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় পৈশাচিক নহে। ধনশালী ইংলণ্ডে বাৎসরিক চৌর্যাপরাধের সংখ্যা গড়ে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অন্যূন ৫ গুণ অধিক। নরহত্যাদির ন্যায় গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হইয়া যাহারা এদেশ হইতে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত হয়, তাহাদিগের মুখশ্রী দর্শনে বিস্মিত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ চার্লস ডারউইন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, তাহাদিগের বদনমণ্ডলে মহানুভবতার ছায়া পরিদৃষ্ট হয় (Such noble-looking persons) তিনি আরও লিখিয়াছেন,—

These men are quiet and well conducted; from their outward conduct, their *cleanliness* and faithful observance of their strange religious rites, it is impossible to look at them with the same eyes as on our wretched convicts,—*Voyage Round the World*, p. 484.

যে দেশের নির্বাসিত কয়েদীদিগের মধ্যেও সুনীতির এরূপ সদ্ভাব পরিদৃষ্ট হয়, সে দেশে সাধারণ জন-সমাজের নীতিজ্ঞান ও চরিত্রবল কিরূপ অধিক, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।* ফলতঃ ধর্ম-প্রাণ ভারতবাসীর বুভুক্ষা ও ক্ষীণতা দূরীভূত হইলে তাহাদিগের চরিত্র-বল নিঃসন্দেহ অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে।

দারিদ্র্য বহু অনর্থের মূল। নির্ধন অবস্থায় মনুষ্যের চিত্ত-বৃত্তি-নিচয়ের অবনতি ঘটে, সমাজের সঙ্ঘ-শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, বাহুবলের হ্রাসের সহিত পরশ্রীকাতরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জীবন-সংগ্রাম তীব্রতর হইলে নীচতা, মিথ্যাচরণ, অসাধুতা প্রভৃতি দোষের প্রাবল্য ঘটে, বুদ্ধি-বৃত্তির বিশেষ বিকাশ বা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া হয় না, অধ্যাপক হাক্সলি, কিড ও রোমানিস প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুবিজ্ঞ দাদাভাই নৌরোজী তাঁহার "Moral Poverty of India" নামক প্রসিদ্ধ নিবন্ধে লিখিয়াছেন,—

For the same cause of the deplarable drain, besides the material exhaustion of India, the *moral loss* to her is no less sad and lamentable. With material wealth go also the wisdom and experience of the country.

ইহার ভাবার্থ এই যে, ইংরাজের ধনহরণ-নীতির ফলে ভারতবর্ষের কেবল আর্থিক ক্ষতিই সাধিত হয় নাই, ধনক্ষয়ের পরিণামে দেশবাসীর সুনীতির যে হানি হইয়াছে, তাহাও সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। সকল দেশেই অর্থনাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর জ্ঞান ও বহুদর্শিতা বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

* দুঃখের বিষয়, একথা অনেকে আজকাল স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। জাতীয় মহাসমিতির দশম অধিবেশনের সভাপতি মিঃ আলফ্রেড ওয়েব মহোদয়ের যত্নে সংগৃহীত ও বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র আনন্দ রাও, বি. এ, মহাশয়ের চেষ্টায় প্রকাশিত The people of India নামক পুস্তকে ভারতবাসীর নীতিজ্ঞান ও চরিত্রবল-বিষয়ে প্রায় ৭৫ জন বিভিন্ন শ্রেণীর সুপ্রসিদ্ধ শ্বেতাঙ্গের মতামত উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার প্রথম ৭ পৃষ্ঠা হইতে এস্থলে তিনটি মত উদ্ধৃত হইল,—

Their whole social system postulates an exceptional integrity,—*W. C. Bennett.* I find among my acquaintances who have long resided in India, that after travelling over Europe they have reason to think more highly of the natives of India every day.—General *J. Briggs.* I should say that the morality among the higher classes of the Hindus was of a high standard, and among the middling and lower classes remarkably so; there is less of immorality than you would see in many countries in Europe.—*Sir G. B. Clark,* G.C.S.I.

অপর মতগুলিও এতদপেক্ষা কোন অংশে ভারতবর্ষবাসীর স্বল্প-প্রশংসাসূচক নহে।

প্রবন্ধান্তরে তিনি বলিয়াছেন,—

All the talent and nobility of the intellect and soul which Nature gives to every country, is to India a *lost treasure.* There is, thus, a triple evil—loss of wealth, wisdom and work, to India under the present system of administration.

অর্থাৎ প্রকৃতি সকল দেশের অধিবাসীকেই স্বভাবতঃ যে বুদ্ধি-বৈভব ও মহানুভবতা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা ভারতবাসীর পক্ষে "বিনষ্ট সম্পত্তির" ন্যায় (পরহস্তগত ধনের ন্যায়) হইয়াছে। বর্তমান শাসন-প্রণালীর দোষে ভারতবর্ষের অর্থবল, জ্ঞানবল ও কার্যদক্ষতা, এই ত্রিবিধ শক্তির যুগপৎ বিলোপ ঘটিয়াছে।

বৃদ্ধ নৌরোজীর এই আক্ষেপপূর্ণ উক্তি পাঠ করিলে স্যার টমাস মনরোর ভবিষ্যদ্বাণী (পত্রাঙ্ক ৮ দেখুন) ফলবতী হয় নাই, এ কথা কে বলিতে পারে? ইংরাজ যদি ভারতবর্ষকে মোগলদিগের ন্যায় স্বদেশে পরিণত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতবাসীকে এই প্রকার বাণিজ্যসংগ্রামে লিপ্ত হইয়া সর্বস্ব হারাইতে হইত না। ইংরাজের সভ্যতানুমোদিত শাসন ভারতবাসীর নিকট নিঃসন্দেহ অধিকতর প্রীতিকর (popular) হইত।

ধনবল, বুদ্ধিবল ও কার্যদক্ষতার বিনাশ ঘটায় বৃটিশ ভারতীয় প্রজা যেরূপ শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে, দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ এখনও সেরূপ হয় নাই। মিঃ ডিগ্‌বী বলেন,—

The Feudatory States are greedy absorbers of the precious metals. The people in them are more prosperous than are the people of British provinces.

অর্থাৎ দেশীয় করদ রাজ্যসমূহের লোকেরাই বিদেশাগত বহুমূল্য রত্নাদির প্রধান ক্রেতা। তাহারা বৃটিশ ভারতীয় প্রজার অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধিশালী।

শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী ভারতের ভিন্ন ভিন্ন করদ রাজ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। তিনিও ডিগ্‌বী মহোদয়ের মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাণিজ্যপ্রধান বোম্বাই নগরীতে কোটি কোটি টাকার ব্যবসায় চলিতেছে। তন্মধ্যে দেশীয় মূলধনের পরিমাণ দশ কোটি টাকার অধিক নহে। এই দশ কোটি টাকার অধিকাংশই দেশীয় রাজ্যসমূহের বণিকদিগের ধনভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত। বৃটিশ ভারতীয় বণিকদিগের ধনবল এরূপ সামান্য যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য আবশ্যক মূলধন সংগ্রহ করা তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে!

দেশীয় রাজ্যে স্থিত প্রজাগণের অবস্থা সম্বন্ধে ডাক্তার লিটনার বিলাতের "ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে" বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন,—

The joyous laughter of freemen you hear in the Native States—you do not hear it in our territory. I am very sorry to say so but the truth is this—that our greater or more foreign civilisation is of a *crushing* kind. In a Native State a man feels he has his own Raja : there is something to look to, men may rise not only in their own states, but their are also openings in them for natives of every part of India.

অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যের স্বাধীন প্রজাবৃন্দের মুখে যে সদানন্দময় কলহাস্য শ্রুতি-গোচর হয়, তাহা আমাদিগের (ইংরাজদিগের) শাসিত প্রদেশে শুনিতে পাওয়া যায় না, এ-কথা আমাকে অতীব দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমাদিগের এই বিরাট বা নিতান্ত বিদেশীয় সভ্যতা ভারতবাসীর পক্ষে সর্বনাশকরী হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা এই ভাবিয়া গৌরবান্বিত হয় যে, তাহাদিগের নিজের রাজা আছে এবং রাজ্য মধ্যে তাহাদিগের অবধানের যোগ্য কিছু আছে। লোকে যে কেবল নিজের রাজার রাজ্যেই উন্নতিলাভ করিতে পারে, তাহা নহে—দেশীয় রাজ্যে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকেরই উন্নতির দ্বার অবারিত রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতাসমুজ্জ্বল বৃটিশ ভারতে কৃষ্ণবর্ণ প্রজার উন্নতির দ্বার দেশীয় রাজ্যের ন্যায় অবারিত নহে। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্ন-প্রকাশ দূরের কথা, কৃষিলব্ধ ধনের সাহায্যেও যাহাতে এদেশের লোকে সম্যক্ উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে না পারে, সেদিকেও বৈদেশিক রাজপুরুষেরা লক্ষ্য রাখিয়া ভূমির রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। এই স্বার্থমূলক ব্যবস্থার সমর্থনকল্পে বিবিধ কাল্পনিক যুক্তির অবতারণা করিয়া মান্দ্রাজের রেভিনিউ বোর্ডের জনৈক ভূতপূর্ব প্রবীণ সদস্য পরিশেষে স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিয়াছেন যে,—

The quality of condition, in respect of wealth in land : this general distribution of the soil among a yeomanry, therefore, if it be not most adapted to agricultural improvement is best adapted to attain improvement in the state of property, manners, and institutions. which prevail in India :

and it will be found still more adapted to the situation of the country, governed by a few strangers, where *pride, high ideas and ambitious thoughts must be stifled.* It is very proper that in England a good share of the produce of the earth should be appropriated to support certain families in affluence to produce senators, sages, and heroes for the service and defence of the state or in other words, that great part of the rent should go to an opulent nobility and gentry, who are to serve their country in parliament, in the army and navy, in the department of science and liberal professions. *The leisure, independence, and high ideas which the enjoyment of this rent affords, has enabled them to raise Britain to the pinnacle of glory. Long may they enjoy it ;—but in India, that haughty spirit, independence and deep thought which the possession of great wealth sometimes gives ought to be suppressed.* They are directly adverse to our power and interest..... *We do not want generals, statesmen, and legislators; we want industrious husbandmen.*'

Considering politcally, therefore, the general distribution of land among a number of small proprietors, who cannot easily combine against Government, is an object of importance.

If the ryot is put on such a footing, that their lands are saleable, and that they ought to pay whether they cultivate or not, the revenue will be secure —*Fifth Report of Select Committee of Parliament on the affairs of the E. I. Co*, pp. 999-91, Appdx.

লর্ড বেণ্টিক যখন মাদ্রাজের শাসনকর্তা তখন তত্রত্য বোর্ড অব রেভিনিউর সদস্য মিঃ থ্যাকারে ভূমির বন্দোবস্ত বিষয়ক ব্যবস্থার নির্ধারণ প্রসঙ্গে জমিদারী বন্দোবস্ত প্রথার বিরুদ্ধে উক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। গবর্নমেণ্ট ও কৃষিজীবী প্রজার মধ্যবর্তী প্রতিপত্তিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অস্তিত্বলোপের

আবশ্যকতা প্রতিপাদনকালে তিনি এই সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তির ভাবার্থ এইরূপ,—"দেশের সাধারণ কৃষকদিগের মধ্যে সমস্ত ভূমির বণ্টনের ব্যবস্থা করিলে কৃষিকার্যেয় বিশেষ উন্নতি ঘটিবার সুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু ভারতের বর্তমান অবস্থার ও পদ্ধতির উপযোগিনী উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণেই হইবে। বিশেষতঃ স্বল্পসংখ্যক বিদেশীয়দের আধিপত্য রক্ষণার্থ এই দেশের লোকের আত্মগৌরব, মহদ্ভাব ও যশোলাভাকাঙ্ক্ষার সম্যক বিনাশসাধন যখন নিতান্ত আবশ্যক, তখন ভূমির উক্ত প্রকার বন্দোবস্তই এদেশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। ইংলণ্ডের ন্যায় দেশে স্ব-রাজ্যের সংরক্ষণ ও সেবার জন্য যাহাতে রাজনীতিজ্ঞ, রণকুশল ও সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগের অভ্যুদয় ও পরিপোষণ হয়, তদুদ্দেশ্যে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত পরিবারকে ভূমিজাত সম্পদের অধিকাংশ গ্রহণ করিবার সুবিধা দেওয়া অতীব যুক্তিসঙ্গত। এই ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে যখন পার্লামেণ্ট মহাসভার এবং সৈনিক ও নৌ-বিভাগের কার্যে যোগদান করিয়া বা ভদ্রজনোচিত উপজীবিকা ও বিজ্ঞানানুশীলনের দ্বারা দেশের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে, তখন ভূমির উপস্বত্বের বহুল অংশ ইঁহাদিগেরই হস্তগত হওয়া উচিত। এই ভূমিজাত সম্পদের কল্যাণে অন্ন-চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় ইঁহারা যে প্রচুর অবসর লাভ, চিত্তবৃত্তির স্বাধীনতা ও উন্নত চিন্তা-প্রণালীর অধিকারী হইয়াছেন, তাহাতেই বৃটেন আজ জাতীয় গৌরবের উচ্চ শিখরে স্থান লাভ করিয়াছে। চিরকাল বৃটেন এই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকুক, ইহাই প্রার্থনীয়, কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। সম্পদ ও সচ্ছলতার আনুকূল্য ঘটিলে মানবের চিত্তক্ষেত্রে যে অদম্য তেজস্বিতা, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও গভীর চিন্তাশীলতা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষে তাহার দমন করিতে হইবে। ভারতবাসীর এই সকল ভাব আমাদিগের আধিপত্য ও স্বার্থের নিতান্ত প্রতিকূল। ভারতবাসীর মধ্যে সমরকুশল সেনাপতি, বিচক্ষণ রাজনীতিক, ও সুবিজ্ঞ ব্যবস্থা-প্রণেতার আবির্ভাব আমরা চাহি না, আমরা কেবল শ্রমশীল কৃষক-সম্প্রদায় চাই।

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের অধিকারী কৃষকগণ সহজে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমবেত হইতে পারে না। এই কারণে জমিদার-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না করিয়া জনসাধারণের মধ্যে সমস্ত জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া দেওয়াই রাজনীতিসঙ্গত কার্য। ইহাতে নিয়মিতরূপে রাজস্ব আদায়ের কিছু অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে বটে; কিন্তু সেজন্য খাজনা বাকী পড়িলেই জমি বিক্রয় হইয়া যাইবে, কৃষক জমি আবাদ করুক না করুক, সরকারকে খাজনা দিতেই হইবে—এইরূপ নিয়ম করিলে সরকারী খাজনা বাকী পড়িবার আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মিঃ থ্যাকারে স্পষ্ট ভাষায় যেরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এই বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভকালে কোনও রাজপুরুষ সেরূপ ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের হৃদয়ে যে এই ভাব প্রবল নহে, এমন কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অন্তর্গত সীতাপুর বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার মিঃ এচ. এস. বয় ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন,—

For some reason it is not desired for the present that the standard of comfort should be very materially raised.

কোন বিশেষ কারণে, ইদানীং প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

মিঃ ডিগ্‌বী বলেন, ভারতের প্রত্যেক বড় লাট, ছোট লাট, চীফ কমিশনার, ও তাঁহাদের অধীন রাজপুরুষগণ কার্যতঃ এই ভাবের—মিঃ থ্যাকারের এই কুটিল নীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। ইহাদিগেরই কার্যফলে ভারতবাসীর এরূপ সামাজিক, মানসিক ও জাতীয় অবনতি ঘটিয়াছে! তিনি আরও বলিয়াছেন, থ্যাকারে ও তাঁহার মতানুগামী রাজপুরুষগণ এদেশবাসীকে কৃষক-সম্প্রদায়ে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ যত্নপ্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই বৃটিশ ভারতে সমর-কুশল সেনাপতি, বিচক্ষণ রাজনীতিক, সুবিজ্ঞ ব্যবস্থা-প্রণেতা প্রভৃতির আবির্ভাব হয় নাই। নচেৎ মোগলদিগের আমলে যে সমাজে বহুসংখ্যক রাজকার্য-ধুরন্ধর পুরুষরত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৃটিশ শাসনকালে সেই সমাজে অধিকাংশ স্থলেই 'ঘটিরাম' ভিন্ন অন্য কাহারও উদয় হইতেছে না কেন? বৃটিশ ভারতে স্যার সালার জঙ্গ, স্যার টি. মাধব রাও, স্যার দিনকর রাও, স্যার কে. শেষাদ্রি আয়ার, শ্রীযুক্ত কৃপারাম (জম্মু), পণ্ডিত মনফুল (আলোয়ার), ফয়েজ আলি খাঁ (কোটা), মাধব রাও বারবী (কোল্‌হাপুর) প্রভৃতির ন্যায় জটিল-রাজকার্য-পরিচালনক্ষম ব্যক্তিও দেখিতে পাই না কেন? দেশীয় রাজ্যগুলি না থাকিলে ইহাদিগকে আমরা আদৌ দেখিতে পাইতাম কি না, সন্দেহ। বৃটিশ রাজ্যে বাস করিতে বাধ্য হইলে ইহাদিগকেও হয়ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগিরি করিয়াই জীবনক্ষয় করিতে হইত।

অধুনাতন কালের রাজপুরুষেরা আমাদিগকে রাজকার্যে অযোগ্য, উচ্চ জ্ঞানমার্গে অনধিকারী ও শুকপক্ষীবৎ পণ্ডিত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমাদিগের যোগ্যতা-সম্বন্ধে পার্লামেন্টের প্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধান-সমিতির প্রশ্নের উত্তরে মিঃ রবার্ট রিকার্ডস বলিয়াছিলেন,—

The improvements introduced by Europeans are *limited* in comparison with what might be the case if the natives of India were sufficiently encouraged ; but in their present state of extreme poverty and almost slavery, it is not reasonable to expect that any great improvement can flow from them. One of the greatest improvements, however, of which the mind of man is susceptible, has been made by Natives from their own exertions. Their acquirement of knowledge, and particularly of the English language, and English literature, ... is quite astonishing. It may even be questioned whether so great a progress in the attainment of knowledge has ever been made *under like circumstances in any of the countries of Europe*. (Qn. 2807).

ভারতবাসীকে স্বদেশের উন্নতি করিবার যথোচিত অবসর ও উৎসাহ প্রদান করিলে ভারতের যে উন্নতি হইতে পারিত, তাহার তুলনায় ইউরোপীয়দিগের কৃত ভারতে জ্ঞানবিজ্ঞানাদি-বিষয়ক উন্নতি অতি সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভারতবাসীর বর্ত্তমান অতি দরিদ্র ও দাসবৎ অবস্থায় তাহাদিগের নিকট কোনও প্রকার বিশেষ উন্নতিরই আশা করা যাইতে পারে না। মানুষ বুদ্ধিবলে যে সকল উন্নতি করিতে সমর্থ, তৎসমূহের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ উন্নতি ভারতবাসী সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাতেই করিয়াছে। জ্ঞানার্জন বিষয়ে—বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তিলাভ-বিষয়ে তাহারা যে সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা অতীব বিস্ময়কর। জ্ঞানোপার্জন সম্বন্ধে, এরূপ প্রতিকূল অবস্থায়, ইউরোপের কোনও জাতি ঈদৃশ উন্নতিসাধন করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

যে সমাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও এইরূপ প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছে, যে সমাজে মহাত্মা শিবাজী, রাণা প্রতাপ, মহারাজ রণজিৎ সিংহ, বীরশ্রেষ্ঠ বাজীরাও, হোলকর, শিন্দে, নানা ফড়নবীস, প্রতাপাদিত্য, আলিবর্দ্দী খাঁ, হায়দার আলি, টিপু সুলতান, মহারাজ টোডর মল্ল, মান সিংহ প্রভৃতি যশস্বী পুরুষগণের সমুদ্ভব হইয়াছিল, যে সমাজে এখনও স্যার টি. মাধব রাও, স্যার সালার জঙ্গ, স্যার কে. আয়ার,* শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, ৺কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায়

* In statesmanship unhappily permitted to exist only in the Feudatory States and not in the British Provinces, there are few in Europe, Asia and America to surpass the achievements of Sir Salar Jung the first, Sir T. Madhav Rau, Sir K. Sheshadree Ayer—to refer only to the departed — *Prosperous British India*.

রাজকার্যবিশারদ ব্যক্তি ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের ন্যায় সেনানী দেশীয় ও ও বিদেশীয় রাজ্যের আশ্রয়চ্ছায়ায় প্রাদুর্ভূত হইতেছেন, সেই সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতাদীপ্ত বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে হাইকোর্টের জজিয়তি অপেক্ষা উচ্চতর কার্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য লোকের অভাব-সংঘটন কি ইংরাজ শাসনের পক্ষে ঘোর লজ্জাজনক ব্যাপার নহে? ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতীয় সমাজের নিকট যদি পাশ্চাত্য আদর্শসম্মত রণকুশল সেনাপতি, সুবিজ্ঞ ব্যবহার-বিশারদ পণ্ডিত ও বিচক্ষণ রাজনীতিক চাহিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই এতদিন তাহা প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষীয় সমাজে এ সকলের আবির্ভাব কামনা করেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন, ভারতে শ্রমশীল কৃষক-সম্প্রদায়ের বাহুল্য; কাজেই ভারতের শতকরা ৮৫ জন আজ কৃষিজীবী—তাহারও অর্দ্ধাংশ চিরকাল অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব কলেক্টার ডবলিউ চ্যাপলিন সাহেব ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন,—

I am afraid the nature o' our Government is not calculated for much improvement...... It is, in fact, adverse to improvement.

আমাদের শাসনের প্রকৃতি বিশেষ উন্নতির অনুকূল নহে। বরং উহা উন্নতির প্রতিকূল।

মিঃ চ্যাপলিনের এই উক্তি এদেশের সঙ্কীর্ণ-চিত্ত রাজপুরুষগণের যত্নে কি বহু পরিমাণে বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইতেছে না? যাঁহারা উন্নতির অবকাশ দান করিলে, কি এ দেশের অনেক সুযোগ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাজকার্যের উচ্চতর বিভাগে আপনাদিগের স্বাভাবিকী প্রতিভার বিস্ময়কর বিকাশ দেখাইতে পারিতেন না?

গবর্ণমেণ্ট উদারতা-প্রকাশ করিলে এদেশের রাজকার্য-পরিচালনক্ষম যোগ্য ব্যক্তির অভাব সহজেই দূর হইতে পারে। কিন্তু অনেক রাজপুরুষই যে এদেশীয় ব্যক্তিদিগকে উন্নতির অবকাশদান করিতে অনিচ্ছুক, রুড়কি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ইতিহাসের পর্যালোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই কলেজ দেশীয়দিগের অর্থে স্থাপিত হইলেও ইহাতে দেশীয় যুবকদিগের প্রবেশের পথ রাজপুরুষেরা প্রথম অবধি কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখন ত ঐ কলেজে বাঙ্গালী ও মহারাষ্ট্রীয় শিক্ষার্থীদিগের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপেই নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু ইহার পূর্বেও যখন সকল শ্রেণীর দেশীয় যুবকের ঐ কলেজে শিক্ষালাভের অধিকার

ছিল, তখনও গবর্নমেণ্ট তাহাদিগের প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই – তাহাদিগকে অবাধে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেন নাই।

প্রথমতঃ দেশীয়গণকে পরীক্ষায় যথারীতি পাস করানই হইত না। তাহার পর যাহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইত, তাহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক লোককেও চাকুরী দেওয়া হইত না। শ্রীযুক্ত নৌরোজী মহাশয় দেখাইয়াছেন, যে সময়ের মধ্যে ৯৬ জন শ্বেতাঙ্গ যুবক পাস হইয়াছে ও তাহাদিগের ৮৬ জন বড় চাকুরী পাইয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে দেশীয় যুবকদিগের ষোল জনের ভাগ্যে পরীক্ষায় সাফল্য ও কেবল সাত জনের ভাগ্যে চাকুরী লাভ (তাহাও নিম্ন শ্রেণীতে) ঘটিয়াছে! এ ক্ষেত্রে দেশীয় ছাত্রদিগের বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে রবার্ট রিকার্ডসের মন্তব্য কতদূর প্রযোজ্য হইতে পারে, সে বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে, তাঁহাকে ঐ রুড়কি কলেজেরই তদানীন্তন অধ্যক্ষ ল্যাং সাহেবের রিপোর্ট পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ১৮৭০-৭১ সালের রিপোর্টে তিনি একস্থলে বলিয়াছেন,—

That the Natives of this country, *under favourable conditions* are capable of excellence both as architects and builders, the beauty and solidity of many of the historical monuments of the country fully testify and that they could compete with European skill in the choice and composition of building materials, may be proved by comparing an old terrace roof at Delhi or Lahore with an Allahabad gunshed or many a recent barrack.

ভাবার্থ—যথোচিত আনুকূল্য বা উৎসাহ পাইলে এদেশীয় ছাত্রেরা যে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-শিল্পে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারে, তাহা এ দেশের ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ ও মন্দিরাদির শিল্প-সুষমা ও দৃঢ়তা অবলোকন করিলে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয়। তাহারা যে হর্ম্যাদির উপকরণ-নির্বাচন ও তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সংযোগবিষয়েও ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষতা করিতে সমর্থ, তাহা দিল্লী বা লাহোরের যে কোনও পুরাতন সৌধশিখরের সহিত এলাহাবাদের অস্ত্রাগারের বা অধুনাতম অধিকাংশ সেনানিবাসের তুলনা করিলেই সপ্রমাণ হইবে।*

সহৃদয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই মন্তব্যে কর্তৃপক্ষের যে আনুকূল্যে এ দেশীয় ছাত্রদিগের বিশেষ উন্নতি ঘটিতে পারে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সে আনুকূল্যলাভ

* স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'সীতারাম' উপন্যাসে "উদয়গিরির বর্ণনাপ্রসঙ্গে দেশীয় স্থাপত্য-শিল্পীদিগের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক বঙ্গবাসীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত।

দুরে থাকুক, এক্ষণে বোম্বাই ও বঙ্গদেশীয় যুবকদিগের রুড়কি কলেজে প্রবেশের পথও রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মিঃ থ্যাকারে (২৩ পৃঃ) ও লর্ড লিটনের উক্তি (৬ পৃঃ) ভারতবাসীর স্মৃতিপথে পুনঃ পুনঃ উদিত হওয়া বিচিত্র নহে।

বৃটিশ ভারতীয় প্রজা কার্যদক্ষতা-প্রকাশের কত অল্প অবকাশ প্রাপ্ত হয়, নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে তাহা উপলব্ধ হইবে।

বিভাগ	বেতন	বৈদেশিক	দেশীয়
সার্ভে	৩০০-২,২০০ টাকা	১৩০	২
”	১৬০-৩০০ ”	৩৫	১০
সরকারী টেলিগ্রাফ	৫০০ ”	৫১	১
ইণ্ডো	৫০০ এর অধিক	১৩	—
টাকশাল	৫০০ ”	৬	—
ডাক	৫০০ এর অধিক	৯	১
জিওলজি-সার্ভে	৫০০ ”	১২	২
পররাষ্ট্র-বিভাগ	৫০০ ”	১১৯	৩
রাজস্ব	৫০০ ”	৪৫	১৪
বিবিধ ”	৫০০ ”	২২	—

ভারত গবর্নমেণ্টের অধীন উচ্চ বেতনের পদসমূহে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদিগের কিরূপ বাহুল্য, উল্লিখিত তালিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট সমূহের অধীন সকল বিভাগেই উচ্চ পদে বৈদেশিকদিগের সংখ্যাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়।

বিগত ১৮৯৮ সালে ভারতবর্ষে, শুদ্ধ সিবিল বিভাগেই সর্বসমেত ৮০০০ বৈদেশিক শ্বেতাঙ্গ উচ্চ বেতনের পদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহাদিগকে বার্ষিক ৮,০০,০০,০০০ টাকা দিতে হইত। অধুনা ইঁহাদিগের সংখ্যা ও বেতনের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামরিক বিভাগের ব্যয় স্বতন্ত্র।

ইহাতে এক দিকে দেশের রাশি রাশি অর্থ বিদেশীয়গণের হস্তগত হইতেছে* অপর দিকে দেশবাসীর বুদ্ধি-বৃত্তি-বিকাশের—উন্নতি ও অভিজ্ঞতা-লাভের পথ

* এদেশে এক এক জন সিবিলিয়ান পোষণ করিতে গড়ে প্রায় ১৭০০ জন ভারতবাসীর বার্ষিক উপার্জন ব্যয়িত হইয়া যায়। ইহার পরিণাম সম্বন্ধে জনৈক সহৃদয় সিবিলিয়ান বলিয়াছেন,—

There is a constant drawing away of the wealth of India to England, as Englishmen grow fat on accumulations made in India, while the Indian remains as lean as ever.—*Mr. R. N. Cust.*

নিরুদ্ধ হইতেছে, কার্যে উৎসাহ কমিয়া যাইতেছে। ফলে দেশের যে ঘোরতর ক্ষতি হইতেছে, যেরূপ খরবেগে ভারতবাসীর মানসিক শক্তির হানি ঘটতেছে, একটি দৃষ্টান্তে তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে। মনে করুন, আজ যদি ভারতবাসী কোনও প্রকারে মূলধন-সংগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণভাবে আপনাদিগের তত্ত্বাবধানে একটি বৃহৎ রেলপথ খুলিবার সংকল্প করে, তাহা হইলে কি কেবল অভিজ্ঞ ও কার্যদক্ষ দেশীয়ের অভাবেই সে সংকল্প অসম্পূর্ণ রাখিতে হয় না? সরকারী রেলবিভাগের উচ্চপদে যদি দেশীয়ের প্রবেশাধিকার থাকিত, যদি স্বদেশে রেল নির্মাণ ও পরিচালন কার্যে তাহারা অভিজ্ঞতা-লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে কি তাহদিগের সংকল্প বিফল হইতে পারিত? ফলকথা, রাজশক্তি এসব বিষয়ে দেশবাসীর অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের পথ নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সকল বিভাগই আমাদিগের উন্নতির প্রতিকূলতা করিতেছেন ; কাজেই আমাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে মহৎ-বাসনাসমূহ অঙ্কুরিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইতেছে না, আমাদিগের আর্থিক ও মানসিক শক্তির দিন দিন হ্রাস হইতেছে।

এই সকল কারণে মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখলে মহোদয় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে, কি আধুনিক কি প্রাচীন, কি সভ্য কি অসভ্য কোন রাজ্যেই পরাধীন জাতির প্রতি রাজশক্তির এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় না, দেশবাসীর বিরুদ্ধে উচ্চ রাজকার্যে প্রবেশের দ্বার এরূপ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিবার প্রয়াস ইতঃপূর্বে কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় নাই। মিঃ আর. এন. কস, নামক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান বলিয়াছেন,—

Akber made fuller use of the subject races, we made none ; it is the jealousy of the middle-class Briton, the hungry Scot, that wants his salary, that shuts out all Native aspirations.—*Linguistic and Oriental Essays.*

ভাবার্থ—আকবর রাজ-কার্য্যে তাঁহার প্রজাবর্গের যথাসম্ভব নিয়োগ করিয়া তাহাদিগের প্রতিভার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহা করি না। পরশ্রীকাতর মধ্যবিত্ত বৃটনেরা ও ক্ষুধিত স্কচেরা এদেশের বড় চাকুরীগুলি চায়—কাজেই ভারতবাসীর সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির পথই রুদ্ধ হইয়াছে।

যাঁহারা রাজকার্যের উচ্চতর বিভাগে জীবন-যাপন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হন, সকল দেশেই তাঁহাদিগের উপার্জিত অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার দ্বারা জাতীয় জ্ঞান (National intellect) বৃদ্ধির সহায়তা হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্দৈবপীড়িত ভারতবাসীর কষ্টসঞ্চিত অর্থে যে অষ্ট সহস্র শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের আজীবন দেহপুষ্টি

ঘটিয়া থাকে, তাঁহাদিগের জ্ঞান ও বহুদর্শিতায় ভারতীয় জনসমাজ অতি সামান্য পরিমাণেও উপকৃত হয় কি না, সন্দেহ। কারণ, যখন পরিণত বয়সে ইঁহারা রাজকার্য হইতে অবসরলাভ করেন ও সমাজ ইঁহাদিগের নিকট দীর্ঘকালের বহুদর্শিতাসঞ্চিত জ্ঞানের অংশলাভ করিবার আশা করিতে থাকে, সেই সময়ে ইঁহারা বৃত্তিগ্রহণপূর্বক স্বদেশে গমন করিয়া অকিঞ্চিৎকর আমোদ-প্রমোদে কালক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হন। যে দেশের কল্যাণে তাঁহাদিগের দারিদ্র্য দূরীভূত ও রাশি রাশি অর্থ সঞ্চিত হয়, সেই দেশের সম্বন্ধে বৃদ্ধ বয়সে যে কোনও কর্তব্য আছে, এ কথা তাঁহাদিগের মনে স্বপ্নেও উদিত হয় না। এ দেশে বাসকালেও জনসাধারণের সহিত মিশিবার চেষ্টা করা অনেকে পদমর্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করেন। কাজেই চিরকাল ইহাদিগকে শোণিতদানে পোষণ করিয়াও ভারতবাসী ইঁহাদিগের নিকট জাতীয় জ্ঞান-বৃদ্ধি-বিষয়ে কোনও প্রকার উল্লেখযোগ্য সহায়তাপ্রাপ্ত হয় না। অবশ্য, মিঃ হিউম, কটন, ডিগ্‌বী, থরবরন প্রভৃতি দুই-চারিজন সহৃদয় ইংরাজ এস্বপ্রকার ঘটনার ব্যভিচারস্থল। কতিপয় মহানুভব ইংরাজ এদেশে কখনও পদার্পণ না করিয়াও ভারতবাসীর দুঃখদারিদ্র্যের আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই উভয় শ্রেণীর মহাজনেরাই আমাদিগের ধন্যবাদভাজন।

ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা-বিভাগের উচ্চ পদসমূহে যদি বহুসংখ্যক দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিয়োগ হইত, তাহা হইলে তাঁহারা আজীবন রাজসেবা করিয়া যে কার্যকুশলতা, বহুদর্শিতা ও দেশের অবস্থাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন, দেশের যুবক-সমাজ বহু-পরিমাণে তাহার অংশভাগী হইতে পারিত। বৃদ্ধদিগের আজীবন সংগৃহীত জ্ঞান নানা সূত্রে উত্তর-বংশীয়দিগের মধ্যে সঞ্চারিত হইত। সকল দেশেই এই নিয়মে সমাজের জ্ঞান ও বহুদর্শিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের গবর্নমেন্টের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার দোষে ভারতীয় সমাজে এই নিয়মে জ্ঞান বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হইয়াছে।

এ দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ সামান্য কেরানীগিরি করিয়াই বার্ধক্যে উপনীত হইতে বাধ্য হন, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আপনাদিগের কার্যদক্ষতা বা বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শনের যথোচিত অবসরপ্রাপ্ত হন না। এরূপ অবস্থায় দেশের যুবকসমাজ কেবল পুস্তকগতা বিদ্যার সাহায্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে বা কার্যক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে, এরূপ আশা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ যে দেশের বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদিগকে তেজস্বিতা বা অধ্যবসায় শিক্ষা দিবার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা নাই, ক্ষীণজীবী কেরানীকুল, এবং রেভিনিউ (রাজস্ব), জুডিশিয়াল (বিচার), ইঞ্জিনীয়ারিং (স্থাপত্য ও পূর্ত) ও মেডিকেল (চিকিৎসা)

বিভাগীয় নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীর দল সৃষ্টি করিবার দিকেই যে দেশের শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষীয়গণের সমধিক দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়, সে দেশের যুবকসমাজ যখন অযোগ্যতার জন্য তিরস্কৃত হয়, তখন ভূত-ধাত্রী ধরিত্রীকে দ্বিধা হইবার নিমিত্ত সকাতর প্রার্থনা করিতে স্বতই প্রবৃত্তি জন্মে। শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী অতি দুঃখেই ভারত-সচিব মহোদয়কে বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে—

The young man has no place in his country.

অর্থাৎ স্বদেশে যুবকদিগের স্থান নাই।

এইরূপে একদিকে, কার্যক্ষেত্রে রাজশক্তির অনুকূলতা, পদোন্নতি, স্বদেশসেবার কার্যমূলক শিক্ষা ও বহুদর্শিতা প্রভৃতি লাভের যথোচিত সুবিধা না পাওয়ায় ও অপর দিকে ঘোর দারিদ্র্যে নিপীড়িত হওয়ায় ভারতীয় জনসমাজ দিন দিন চরিত্র-গৌরবে হীন হইতেছে। দুঃখের বিষয়, গবর্নমেণ্ট তথাপি এ বিষয়ে প্রজাপুঞ্জের সহায়তায় অগ্রসর নহেন। ১৮৯২ সাল পর্যন্ত দেশীয়দিগের পদোন্নতি বিষয়ে যে অবস্থা ছিল, অদ্যাপি তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। বিগত দশ বৎসরে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাদিগকে বিনিময়ের ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; পক্ষান্তরে মাসিক পঞ্চাশ টাকার অধিক বেতনের পদ হইতেও কালা আদমিকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে। এই দুর্মূল্যতার দিনে মাসিক পঞ্চাশ টাকাই এখন সাধারণ ভারতবাসীর কঠোর পরিশ্রমের ও যোগ্যতার চরম পুরস্কারে পরিণত হইতেছে। এই সকল সুবিধা সত্ত্বেও যদি আমাদের উত্তর-বংশীয়গণের জ্ঞানবল, চরিত্রবল, কার্যকুশলতা ও যোগ্যতা না বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে আর কিসে বৃদ্ধি পাইবে।

দূরদর্শী রাজপুরুষেরাও এ সকল কথা অস্বীকার করেন নাই। স্যার হেনরী ষ্টাচি সর্বপ্রথম এ বিষয়ে স্বীয় মত কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন,—

We place the European beyond the reach of temptation. To the Native, a man whose ancestors perhaps bore high command, we assign some ministerial office, with a poor stipend of twenty or thirty rupees a month. Then we pro-onounce that the Indians are corrupt.

ভাবার্থ—আমরা ইউরোপীয়দিগকে মোট বেতন দিয়া তাঁহাদিগের প্রলোভনে পতিত হইবার সম্ভাবনা দূরীভূত করিয়া থাকি। কিন্তু যে সকল দেশীয়ের পূর্বপুরুষেরা পূর্বে হয়ত বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তাহাদিগকে কুড়ি-ত্রিশ টাকা মাহিনায় সামান্য কার্যে নিযুক্ত করি, এবং তাহার পর বলি,—ভারতবাসীরা উৎকোচ-গ্রাহী বা দুর্নীতিপরায়ণ।

এখন discontented B.A.s বলিয়া রাজপুরুষেরা এ দেশের শিক্ষিত-সমাজের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছেন। কিন্তু যে কারণে এই অসন্তোষের উৎপত্তি অনিবার্য হইবে, তাহা বহুদিন পূর্বে কর্নেল ওয়াকার নামক জনৈক রাজপুরুষ বুঝিতে পারিয়া কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন যে—

It is vain to expect that men will ever be satisfied with merely having their property secured, while all the paths of honourable ambition are shut against them. *This mortifying exclusion stifles talents, humbles family pride, and depresses all but the week and worthless.* By the higher classes of society it is considered as a severe injustice......So long as this source of hostility remains, the British administration will always be regarded as *imposing a yoke.*

ভাবার্থ—লোকের গৌরবকর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া, কেবল তাহাদিগের ধন-প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিলেই যে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিবে, এরূপ আশা করা বৃথা। উচ্চ পদলাভের পথে কণ্টকারোপ করিলে মনুষ্যের স্বভাবতই মর্মপীড়া উপস্থিত হয়, প্রজ্ঞা নষ্ট হয়, বংশ-গৌরব হ্রাস পায়, এবং নিতান্ত দুর্বল ও অপদার্থ ব্যক্তি ভিন্ন সকলেরই চিত্তে ক্ষুন্নতা জন্মে। উক্ত শ্রেণীর লোকেরা এইপ্রকার ঘটনাকে ঘোর অন্যায় বলিয়া মনে করেন। যতদিন পর্যন্ত এইরূপ ভাব বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন বৃটিশ শাসন তাঁহাদিগের নিকট দুঃসহ গুরুভারের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে।

ওয়াকার মহোদয় এ কথাও বলিতে বিস্মৃত হন নাই যে, অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ,—

Often undervalue the qualifications of the Natives from the motives of prejudice or interest.

হয় কুসংস্কারের বশীভূত, না হয়, স্বার্থপরতার দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভারতবাসীকে অযোগ্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়া থাকেন। বৃটিশ ভারতীয় রাজপুরুষদিগের অবৈধ ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ভারতবাসীর অসন্তোষের বিষয় অবগত হইয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট মহাসভা উচ্চ রাজপদে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে এক আদেশ প্রচার করেন। সে আদেশ কর্তব্যপরায়ণ রাজপুরুষদিগের দ্বারা কিরূপে অবজ্ঞাত হইয়াছে, লর্ড লিটন মহোদয়ের পত্র হইতে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি।

রাজার অবজ্ঞায় প্রজাকুলের নৈতিক চরিত্রের কিরূপ অবনতি হয়, বিজ্ঞবর স্যার টমাস মনরোর পশ্চাল্লিখিত মন্তব্যে মনোযোগ করিলে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

We profess to seek their improvement, but propose means the most adverse to success. The advocates of improvement do not seen to have perceived the great springs on which it depends,...... but they are ardent in their zeal for enllgntening them by the general diffusion of knowledge.

No conceit more wild and absurd than this was ever engendered in the darkest ages; for what is in every age and in every country the great stimulus to the pursuit of knowledge, but the prospect of fame or wealth or power? ..... Our books alone will do little or nothing; *dry simple literature will never improve the character of a nation.* To produce this effect, it must open the road to wealth and honour and public employment. Without the prospect of such reward no attainments in science will ever raise the character of a people.

This is true of every nation as well as of India; it is true of our own. Let *Britain* be subjected by a foreign power tomorrow, let the people be excluded from all share in the government, from public honours, from every office of high trust or emolyment and let them in every situation be considered as unworthy of trust, and all their knowledge and all their literature, sacred and profane, would not save them from becoming, *in another generation or two a low minded, deceitful and dishonest race.*

......In proportion as we exclude from higher offices, and a share in managment of public affairs, we lessen their interest in the concerns of community and degrade their character.

ভাবার্থ—আমরা (ইংরাজেরা) মুখে বলি, ভারতবাসীর উন্নতি চাই, কিন্তু কার্যতঃ এমন উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করি, যাহাতে সাফল্যলাভ সুদূরপরাহত হয়। যে মূল তত্ত্ব উন্নতির প্রাণস্বরূপ, উন্নতিবাদের পক্ষ সমর্থক মহাশয়েরা তাহার সম্যক পরিচয় অবগত নহেন বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি

ইহাদিগের সহানুভূতি ও বিশ্বাস নাই, অথচ উন্নতির কামনায় জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোক-বিস্তারের জন্য ইহারা বিশেষ ব্যস্ত।

অতি অসভ্যতার যুগেও এতদপেক্ষা অধিকতর অদ্ভুত ও যুক্তি-বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া কেহ কখনও অহঙ্কৃত হয় নাই। ধন, যশঃ, ক্ষমতা বা উচ্চপদলাভের প্রত্যাশা ভিন্ন কোনও দেশে কোনও কালে কি সাধারণের জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্তি হইয়াছে ?

কেবল ইংরাজী বই পড়িলে কোনও ফলোদয় হইবে না। শুদ্ধ নীরস সাহিত্যের চর্চা করিয়া কখনও কোনও জাতির চরিত্র উন্নত হয় না। সমাজের চরিত্র-বল বৃদ্ধি করিতে হইলে ধন, মান ও উচ্চ রাজকার্যলাভের পথ সরল করিতে হইবে। এই প্রকার পুরস্কার-লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত চর্চাতেও কোনও জাতির চরিত্রগত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

এমন কি, আমাদিগের নিজের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। ইংলণ্ডকেই যদি কল্য পরকীয় শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে দেওয়া যায়, তত্রত্য অধিবাসীদিগকে রাজকার্য-নির্বাহের অংশগ্রহণে, সাধারণের প্রদত্ত সম্মানলাভে ও উচ্চপদে বা লাভজনক কার্যে যদি বঞ্চিত করা যায়, প্রত্যেক বিষয়েই যদি তাহাদিগকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া অবহেলা করা যায়, তাহা হইলে, তাহাদিগাক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য যতই পবিত্র হউক না কেন, উহা তাহাদিগকে অধঃপতনের হস্ত হইতে কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না—দুই এক পুরুষেই তাহারা নীচ-প্রকৃতি, প্রবঞ্চক ও অসাধু জাতিতে পরিণত হইবে।

ফলতঃ যে পরিমাণে আমরা উচ্চ পদ ও রাজকার্য হইতে ভারতবাসীকে বঞ্চিত করিব, সেই পরিমাণে সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি কমিয়া যাইবে, তাহাদের চরিত্রবলের হানি হইবে।

ভারতবাসী বুদ্ধিবিকাশের অবসরলাভে বঞ্চিত হওয়ায় যেরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার বিষয় স্মরণ করিয়াই কটন সাহেব লিখিয়াছেন,—

It is not a spectacle which is likely to reconcile an Indian patriot to the loss of the subtle and refined Oriental arts, the very secrets of which has passed away, to the loss of innumerable weavers ....or to the loss of that constructive genius and mechanical ability which designed the canal system on Upper India and the Taj at Agra.

আমাদিগের শাসনে এ দেশের প্রতি সূক্ষ্ম ও সুসংস্কৃত প্রাচ্য-শিল্পের বিনাশ

ঘটিয়াছে, সমাজ হইতে সে সকল শিল্প-রচনার বিদ্যা পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার ফলে অসংখ্য তন্তুবায় অন্নাভাবে গতাসু বা হীনদশাপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে প্রতিভা উত্তর-ভারতের জল-প্রণালী নির্মাণ-কৌশলের উদ্ভাবন করিয়াছিল, এবং আগ্রার তাজমহলে অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিল, আমাদিগের দোষে সে প্রতিভার বিলোপ সাধিত হইয়াছে। কোন দেশভক্ত ভারতবাসীরই নিকট এ দৃশ্য প্রীতিকর হইতে পারে না।

সহৃদয় মেরিডিথ টাউনসেণ্ড মহোদয় তাঁহার "এশিয়া ও ইউরোপ" গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

One of these (prodigious drawbacks of British rule), of which they are fully conscious, is the gradual decay of much of which they were proud, the slow death......of Indian art. Indian culture, Indian military spirit. Architecture, engineering, *literary skill* are all perishing out, so perishing that Anglo Indians doubt whether Indians have the capacity to be architects, though they built Benares; or engineers, though they dug the artificial lakes of Tanjore or poets, though the people sit for hours or days listening to rhapsodists as they recite poem, which move them as Tennyson certainly does not our common people.

বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষের যে সকল অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতবাসীর বহু গৌরবের শিল্প, জ্ঞান ও বীরভাবের ক্রমিক বিলোপ একটি উল্লেখের যোগ্য ঘটনা। ভারতের স্থাপত্য-বিদ্যা, হর্ম্য-বিজ্ঞান, সাহিত্য-রচনা-কৌশল প্রভৃতি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। এখন এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে যে, ভারতবাসীর যে এ সকল বিষয় আয়ত্ত করিবার শক্তি আছে, তাহা ভারতপ্রবাসী ইংরাজেরাও সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। অথচ ভারতবর্ষেই হর্ম্যবিদ্‌গণ বারাণসীর ন্যায় সুন্দর নগরীর নির্মাণ করিয়াছেন, এদেশেরই ইঞ্জিনীয়ারেরা তাঞ্জোরের কৃত্রিম হ্রদসমূহ নিখাত করিয়াছেন, ভারতীয় কবিগণ এমন কবিতা-গীতি রচনা করিয়াছেন যে, তাহা অদ্যাপি লোকে বহুক্ষণ বা বহুদিবস পর্যন্ত শ্রবণ করিয়াও ক্লান্তি অনুভব করে না। ইংলণ্ডে কবিবর টেনিসন স্বীয় রচনার দ্বারা জনসাধারণকে যে পরিমাণে মুগ্ধ করিতে পারিয়াছেন, এখানকার কবিগণ স্বদেশবাসীকে নিঃসন্দেহে তদপেক্ষা অধিকতর মোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এইরূপে ইংরাজের সংঘর্ষে আমাদিগের শিল্প-বুদ্ধি-বিকাশের পথ নিরুদ্ধ, কার্যদক্ষতা-প্রকাশের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, শক্তিচর্চার স্বাভাবিক অবসর বিলুপ্ত এবং

দারিদ্র্য-রোগ-শোক-দুশ্চিন্তাদির প্রকোপ বর্ধিত হওয়ায় আমাদের মানসিক শক্তির বিশেষ হানি ঘটিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইংরাজের চরিত্রদোষও আমাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া বহু পরিমাণে আমাদের মানসিক অবনতি ঘটাইতেছে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজের সহিত ভারতবাসীর প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়ের পরই ভারতবাসী ইংরাজের যে মূর্তি দেখিতে পাইলেন, রেভারেণ্ড এণ্ডারসন প্রণীত English in Western India নামক পুস্তকে তাহার এইরূপ আভাস পাওয়া যায়.—

As the number of adventures increased, the reputation of the English did not improve. Too many committed deeds of violence and *dishonesty*. We can show that even the commanders of vessels belonging to the Company did not hesitate to perpetrate *robberies* on the high seas or on shore, when they stood in no fear of retaliation .....

Hindoos and Mussulmans considered the English a set of cow-eaters, and fire-drinkers, vile brutes, who *would cheat their own fathers.*

ভাবার্থ—ভারতে সাহস-ব্যবসায়ী ইংরাজের সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতে লাগিল, ইংরাজের সুনাম সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল না। ইহাদিগের অনেকেই অসাধুতা ও অত্যাচারমূলক কার্য করিত। বাধা পাইবার ভয় না থাকিলে, কোম্পানির জাহাজের নায়কেরা পর্যন্ত জলে-স্থলে দস্যুতা করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। হিন্দু ও মুসলমানেরা ইংরাজদিগকে গো-খাদক, সুরাপায়ী, অধম নরপশু বলিয়া মনে করিতেন। তাহারা নিজের পিতাকেও প্রতারিত করিতে পারে, তাহাদিগের কার্যকলাপ-দর্শনে ভারতবাসীর এইরূপ ধারণা হইয়াছিল।

তদানীন্তন মহারাষ্ট্র কবি মুক্তেশ্বরের (জন্ম ১৬০৯ খৃঃ) কাব্যেও ইংরাজ-চরিত্রের এইরূপ বর্ণনাই দেখিতে পাওয়া যায়। এই ইংরাজ যখন ভারতবাসীর শাসনকর্তার আসন-গ্রহণ করিলেন, তখন অন্তঃসারশূন্য নীতিকথার দম্ভপূর্ণ ঘোষণার দ্বারা এদেশের অধিবাসীকে বিস্ময়বিমূঢ় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দূরদর্শী ব্যক্তি সেই সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতার সুযোগ উপস্থিত হইলেই সংসর্গদোষে ভারতবাসীর চরিত্র-হানি ঘটিবে। লর্ড টেনমাউথ, (স্যার জন শোর) বিলাতের কর্তৃপক্ষকে স্পষ্টাক্ষরেই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে অধিক সংখ্যায় ইউরোপীয়দিগের গতিবিধি ও ভারতবাসীর সহিত পরিচয় সংঘটন হইলে, ভারতীয় সমাজের চরিত্রবল ও পাশ্চাত্যদিগের প্রতি তাহাদিগের শ্রদ্ধা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। তাঁহার উক্তি এই,—

There is one general consequence, which I should think likely to result from a general interior of Europeans into the interior of the country and their intercourse with the Natives, that without elevating the character of the Natives, it would have a tendency to depreciate their estimate of the general European character.

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষীয়দিগের হৃদয়েও এই ভয় অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় শিল্পীদিগের নির্মিত বহুসংখ্যক জাহাজ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে গমনাগমন করিত। এ দেশের লস্করেরা ঐ সকল জাহাজের পরিচালনাকার্যে নিযুক্ত ছিল। সুতরাং বিলাতের জনসাধারণের সহিত তাহাদিগের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিবার পথও সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু বিলাতী শিক্ষা ও সভ্যতার যে মোহময় উজ্জ্বল আদর্শ এ দেশবাসীর সমক্ষে স্থাপন করিয়া ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সমাজের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এই পরিচয়ে তাহা বিফল হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই কারণে কোম্পানির ডিরেক্টরেরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতীকারের জন্য—ইংরাজ চরিত্রের সুনাম রক্ষার জন্য অবশেষে তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয় লস্করের বিলাতে গমন নিষিদ্ধ করিতে হইল। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের নিজের উক্তি এই,—

But this is not all. The native sailors of India, when are chiefly Mohammedans, are, *to the disgrace of our national morals*, on their arrival here, led to scenes which soon divest them of the respect and awe they had entertained in India for the European character: they are robbed of their little property and left to wander, ragged and destitute in the streets .....The contemptuous reports which they disseminate on their return, can not fall to have a very unfavourable influence for our character, which has hitherto contributed to maintain our supremacy in the East, (a reverence in part-inspired by what they have at a distance seen among a comparatively small society, mostly of better ranks, in India) will be gradually changed for most degrading conceptions; and if an indignant apprehension of having hitherto rated us too highly or respected us too much, should once possess them, the effects of it may prove extremely detrimental.—*Supplement to the Fourth Report, E. I. Co.*

ভাবার্থ—ভারতবর্ষীয় লস্করদিগকে পোত-চালনার কার্য হইতে বিতাড়িত করিবার ইহাই একমাত্র কারণ নহে। আমাদিগের (ইংরাজের) জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক বা ধর্ম-নীতিজ্ঞানের অভাবও ইহার অন্যতম কারণ। আমাদিগের পক্ষে লজ্জার কথা হইলেও ইহা সত্য যে, ভারতবর্ষীয় মুসলমান নাবিকেরা এদেশে (ইংলণ্ডে) আসিলে অতি বীভৎস দৃশ্য তাহাদের নয়নগোচর হয়। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে ইউরোপীয় চরিত্রের প্রতি তাহাদিগের যে শ্রদ্ধা ও সম্মান জন্মিয়া থাকে, এখানে আসিলে তাহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহাদিগের সঙ্গে যে সামান্য অর্থ থাকে, এখানকার লোকে, তাহার সমস্ত অপহরণ করিয়া লয় এবং হতভাগ্যদিগকে বস্ত্রহীন নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য করে। তাহার পর লস্করেরা স্বদেশে ফিরিয়া গেলে এই বীভৎস কাণ্ডের বিষয় সকলের নিকট প্রকাশ করে। এইরূপ কলঙ্কজনক বিষয়ের প্রচার হইলে এশিয়া-নিবাসী প্রজাবৃন্দের চিত্তে আমাদিগের সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণার সঞ্চার না হইয়া থাকিতে পারে না। আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের মহত্ত্ব বিষয়ে তাহাদিগের অনুকূল ধারণা হইয়াছে বলিয়াই ঐ দেশে আমাদিগের শাসনকার্য সহজে সুচারুরূপে চলিতেছে। দূরদেশে যে স্বল্পসংখ্যক সদ্বংশজাত ইংরাজ বা করেন, তাঁহাদিগের ব্যবহারদর্শনে আমাদিগের প্রতি ভারতবাসীর যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাহা যদি বিলাত ফেরৎ লস্করদিগের প্রচারিত সংবাদের ফলে নষ্ট হইয়া যায়, যদি আমাদিগের চরিত্রের হীনতা তাহাদিগের নিকট প্রকাশ পায়, তাহা হইলে অতি বিষময় ফলের উৎপত্তি হইবে।

কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তাঁহাদিগের এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বনে ধর্ম-প্রাণ ভারতবাসীর এক বিষয়ে বিশেষ উপকার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজ চরিত্রের অপকৃষ্ট অংশ এরূপভাবে গোপন না করিলে ভারতবাসীর অধিকতর নৈতিক অবনতি সাধিত হইত, এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। অনুকরণ-প্রিয় দুর্বল ভারতবাসীর সমক্ষে এরূপ হীন আদর্শ প্রকাশমান থাকিলে এই দেশীয় হিন্দু মুসলমান সমাজের সাত্ত্বিক ভাব বহু পরিমাণে অপচিত হইত। কোম্পানির ডিরেক্টারেরা সে অপকারের পথ কিয়ৎপরিমাণে নিরুদ্ধ করিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

সুখের বিষয়, ইংলণ্ডের ধনবৃদ্ধির সহিত ইংরাজ চরিত্রের এই অপকৃষ্টতা কিয়ৎ-পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। এখন ইংরাজের আয় প্রতি জনে গড়ে বার্ষিক অন্যূন ৬৩০ টাকা, গড়ে প্রত্যেকের সঞ্চিত ধন ৪৫০০ টাকা। সুতরাং দারিদ্র্যের তীব্র তাড়নায় ইংলণ্ডবাসীকে আর পূর্বের ন্যায় পদে পদে নীচতা, মিথ্যাচরণ ও অসাধুতার

আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। ইহার উপর শিক্ষার বিস্তারেও কিছু সুফল ফলিয়াছে। শুনিতে পাই—

আমাদিগের দেশের অজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে অনেকের ধারণা যে প্রতীচ্য সমাজে দুর্নীতি বড় প্রবল ; এটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। প্রতীচ্য সমাজের নৈতিক পবিত্রতা ও আদর্শ অতি উচ্চ। যদি তাহাই না হইত, তাহা হইলে কি প্রতীচ্য জগৎ এত শক্তিশালী হইতে পারিত। যেখানে শক্তি, নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, তাহার পশ্চাতে নৈতিক মহত্ত্ব আছে।

"সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশের রেলে বেশ ভাল করিয়া প্যাক করিয়াও কোন জিনিস পাঠাইলে পথে তাহার অর্ধেক চুরি যায়, কিন্তু বিলাতে দেখিয়াছি, বাক্স চাবি বন্ধ না করিয়াও জিনিস পাঠাইয়াও চুরি যায় নাই। স্টেশনে গিয়া লগেজ লইয়া মুটেদের কিংবা কেরানীবাবুদের সঙ্গে কিছুই বকাবকি করিতে হয় না। কেহ একবার লগেজ ওজন করিতেও বলে না।* আপনি যদি বলেন যে, আমার লগেজ বিনা মাশুলে যাইবার যোগ্য নয়, তাহা হইলে আপনি ওজন করাইয়া মাশুল দিতে পারেন ; নতুবা অবাধে লগেজ লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। কোথাও টিকিট পরীক্ষা করা নাই। অনেক স্থলে ট্রাম গাড়ীতে টিকিট দিবার নিয়ম নাই, কণ্ডাক্টারের কাছে ভাড়া দিলেন, হইয়া গেল।" সঞ্জীবনী, ২৬শে চৈত্র ১৩০১।

সত্য হইলে, এতদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইংরাজ এখন আমাদের রাজা, নানা বিষয়ে আমাদিগের আদর্শ স্থানীয়। ইংরাজের চরিত্র যত উন্নত হইবে, আমাদিগের ন্যায় অনুকরণ-প্রিয় প্রজার পক্ষে উহা ততই মঙ্গলকর হইবে। ইংরাজের ন্যায়পরায়ণতা বৃদ্ধি পাইলে, বৃটিশ প্রজার সমস্ত অধিকার ও সুখ-সম্পদ আমাদের সুপ্রাপ্য হইবে।

কোম্পানি যে ভয়ে এদেশীয় লস্করদিগের ইংলণ্ডে গমন নিষিদ্ধ করিলেন, সে ভয় সম্যক দূরীভূত হইল না। ইংরাজের সুনাম রক্ষার জন্য লস্করদিগের জীবিকা-নির্বাহের উপায় বিলুপ্ত করা হইল, কিন্তু অভীষ্ট সংকল্প সুসিদ্ধ হইল না। লর্ড টেনমাউথের উপদেশ উপেক্ষিত হওয়ায় দলে দলে ইংরাজ এদেশে আসিতে লাগিলেন। ইংরাজ চরিত্রের যে অংশ লোক-লোচনের অন্তরালে রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষ দেশীয় লস্করদিগের অন্নে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এই ঘটনায় সে অংশ ভারতবর্ষে আসিয়া আত্ম-প্রকাশ করিল! স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" পাঠ করিলে এই অংশের সুস্পষ্ট চিত্র পাঠকের নেত্র সমক্ষে উদ্ভাসিত হইবে।

ইংরাজ চরিত্রের এই অপকৃষ্ট অংশের সংঘর্ষে আমাদিগের স্বদেশবাসীর চরিত্র

* সময়ের অভাব ও কাযের বাহুল্য কি এই প্রকার ব্যবস্থার অন্যতম কারণ নহে।

কতদূর অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নীলকরদিগের গোমস্তা ও দেশীয় অনুচরগণের চরিত্র আলোচনা করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। রাজজাতির সদ্ব্যবহারে প্রকৃতি-পুঞ্জের চরিত্র কতদূর উন্নত হয়, তাঁহাদিগের নিকট অসদ্ব্যবহার লাভ করিলে প্রজার তোষামোদ-প্রিয়তা কিরূপ বৃদ্ধি হয়, বিবিধ সদগুণের কিরূপ হ্রাস হইতে থাকে, ইতিহাসে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উল্লিখিত কারণে, ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় প্রজার মানসিক বলের কিরূপ হানি হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা না করিলেও অনুমিত হইতে পারে।

নীলকরদিগের অত্যাচারের দমনে বিলাতের কর্তৃপক্ষ মনোযোগী হইয়া বঙ্গদেশ-বাসীর সম্মুখ হইতে ইংরাজ চরিত্রের কুৎসিত অংশের আদর্শ ক্রমশঃ অপসারিত করিলেন। সাত্ত্বিকতা-প্রিয় বাঙ্গালী নরকের দৃশ্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। ইহার পর সর্বজন পূজ্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনকাল সমাগত হইল, উচ্চ বংশীয় সদাশয় ইংরাজগণের আগমনে দেশের নৈতিক অবনতির স্রোত কিয়ৎ-পরিমাণে প্রতিরুদ্ধ হইল। কিন্তু দীর্ঘকাল অসৎসংসর্গে যাপন করিলে সৎসঙ্গ-লাভ করিয়াও লোকে সহজে বিশেষ উপকৃত হয় না। আমাদিগের অবস্থা এক্ষণে অনেকাংশে সেইরূপ হইয়াছে ইংরাজের কতিপয় জাতিগত দোষের বিষয় ইতঃপূর্বে (৩য় পৃঃ) উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সকল দোষের মধ্যে ইংরাজের সহবাস-গুণে বিলাসিতা, অহঙ্কার ও আত্মসুখ-পরায়ণতা প্রভৃতি দোষ আমাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করেন। ইংরাজের প্রণীত বিধি-ব্যবস্থার (আইন-কানুনের) দোষে এদেশের ধর্মাধিকরণ (আদালত) মিথ্যাচারের লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। সেকালে পঞ্চায়েতের বিচারে মিথ্যাচারের এরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল না। এক দিকে অবস্থাভিজ্ঞ স্থানীয় পঞ্চায়েতের সমক্ষে মিথ্যা কথা বলিয়া অব্যাহতিলাভ ও সমাজে সম্মান রক্ষা করা যেমন সুসাধ্য ছিল না, অপর দিকে সেইরূপ আইনের কুটতর্কের আশ্রয়ে প্রকৃত তথ্য উপেক্ষিত হইত না। এখন দেশের সর্বত্র পাশ্চাত্য-রীতি-সম্মত ধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মিথ্যাচার এদেশে সমধিক আধিপত্য-লাভ করিয়াছে।

ইংরাজের প্রেষ্টিজ বা সম্মানের দায়ে ভারতবাসীর ধর্মবুদ্ধিতে দ্বিধাভাব উপস্থিত হইয়াছে। এদেশে শ্বেতাঙ্গদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নানা সূত্রে দেশবাসীর সহিত তাঁহাদিগের সংঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সংঘর্ষ-সূত্রে ভারতবাসী অহরহঃ দেখিতেছে যে, রাজজাতির সম্মান-রক্ষার ব্যপদেশে আমাদের ন্যায়-বিচারপ্রাপ্তির পথ প্রতি পদেই রুদ্ধ হইয়া যায়। সত্যের বিধান

লঙ্ঘিত হয়, ধর্ম উপহত হয়েন। পাপিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ আসামীকে রক্ষা করিবার জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত অধর্মের আশ্রয়গ্রহণে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন না। পরন্তু এইরূপে যাঁহারা সত্যপথ লঙ্ঘন করেন, তাঁহাদিগের অচিরে পদোন্নতি ও সম্মান বৃদ্ধি হয়, ছাপরা ও নোয়াখালির পেনেল-বিপ্লবে লোকে তাহা দেখিয়াছে। কেপকলোনি প্রভৃতি ইংরাজ উপনিবেশে ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরও ফুটপাথে গমন নিষিদ্ধ, যানারোহণে ভ্রমণ দণ্ডার্হ—ইত্যাদি সংবাদ আজকাল সাপ্তাহিকপত্রের সাহায্যে প্রায়ই দেশের অসংখ্য লোকের কর্ণগোচর হয়। পক্ষান্তরে ভারতবাসী ইহাও নিত্য দেখিতে পায় যে, ইংরাজেরই ধর্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতার এদেশবাসীকে মানবমাত্রের ভ্রাতৃত্ব ও ঈশ্বরের পিতৃত্বমূলক সাম্যবাদ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন, স্ব-জাতীয়দিগকে নেটিবের সহিত ভ্রাতৃত্ব বা সমতা শিখাইবার জন্য তাহার শতাংশের একাংশও প্রকাশ করেন না। সর্বদা সর্বত্র এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহার ও দৃশ্য নয়নগোচর হইলে অনুকরণপ্রিয় পরাধীন জাতির নিত্য ধর্মে আস্থা বৃদ্ধি পায় না, চরিত্র উন্নত হয় না,—এ কথা বিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই স্বীকার করেন। ইংরাজ চরিত্রের এই সকল দোষের সংস্রবে আমাদিগের চরিত্রের যে অবনতি সাধিত হইতেছে, সুকবি ও চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"ইহাতে (ইংরাজের বিসদৃশ ব্যবহারে) আমাদের শিক্ষাদাতাদের ইষ্ট বা অনিষ্ট কি হইতেছে, তাহা লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না। ভয়ের কারণ এই যে, আমাদের মন হইতে ধ্রুব ধর্মে বিশ্বাস শিথিল ও সত্যের আদর্শ বিকৃত হইয়া যাইতেছে। আমরাও প্রয়োজনকে সকলের উচ্চে স্থান দিতে উদ্যত হইয়াছি। আমরাও বুঝিতেছি, পোলিটিক্যাল উদ্দেশ্য সাধনে ধর্মবুদ্ধিতে দ্বিধা অনুভব করা অনাবশ্যক। অপমানের দ্বারা যে শিক্ষা অস্থিমজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে, সে শিক্ষার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিব কি করিয়া? অতএব ইচ্ছা করি, না করি, বিলাত আমাদিগকে ঠেসিয়া ধরিয়া সে সকল শিক্ষা দিতেছে, তাহা গলাধঃকরণ করিতেই হইবে।

"আমরা আজকাল······স্বার্থপরতাকেই সভ্যতার একটিমাত্র মুকুটমণি······ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।····· দোকানদারীর মিথ্যা বিদেশের দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিদিন গ্রহণ করিতেছি। আমরা টাকাকে মনুষ্যত্বের চেয়ে বড় এবং ক্ষমতাকে মঙ্গল ব্রতাচরণের চেয়ে শ্রেয় বলিয়া জানিয়াছি, তাই এতকাল যে স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের দেশে লোকহিতকর কর্ম ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তাহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে। শিশুকাল হইতে বিদেশীকে একমাত্র গুরু বলিয়া মানা অভ্যাস

হওয়াতে তাঁহাদের কথাকে ? বেদবাক্য বলিয়া স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়াছি।"
(বঙ্গদর্শন ১৩০১ সাল)।

মাদকসেবনে মানসিক শক্তির কিরূপ হ্রাস হয়, চরিত্রবলের কিরূপ হানি হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু আমাদের অর্থলুব্ধ গবর্নমেণ্ট দেশবাসীকে মাদক-সেবী করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। আফিমের চাষে এদেশবাসী কৃষকের কখনই বিশেষ অনুরাগ ছিল না, বরং অনেকে সে বিষয়ে যথোচিত বিরাগ-প্রদর্শন করিত। কিন্তু গবর্নমেণ্ট দরিদ্র কৃষকদিগকে টাকা দাদন ও অন্য প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া আফিমের চাষে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব ছোটলাট স্যার সিসিল বিডন বিলাতের ফাইন্যান্স কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে বলিয়াছিলেন যে,—

The Government would probably not be deterred from adopting such a course by any considerations as to the deleterious effect which opium might produce on the people to whom it was sold.

অর্থাৎ অহিফেন-সেবনে প্রজার চরিত্রবল বিনষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় গবর্নমেণ্ট সম্ভবতঃ কখনই এই লাভজনক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।

বলা বাহুল্য, শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ান পোষণে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া রাজকোষ শূন্য না করিলে গবর্নমেণ্টকে এই দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষণ করিতে হইত না।

কৃষকদিগকে টাকা দাদন করিয়াই গবর্নমেণ্ট ক্ষান্ত হন নাই। এদেশবাসী যুবকদিগের যাহাতে অহিফেনে আসক্তি জন্মে, তাহারও জন্য অতি গর্হিত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব সহকারী কমিশনার মিঃ হাইণ্ড বলেন,—

Organised efforts are made by Bengal agents to introduce the use of the drug, and create a taste for it among the rising generation.

এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া অহিফেনের প্রচার বৃদ্ধির জন্য বঙ্গদেশে যথারীতি চেষ্টা হইয়াছিল। তরুণ যুবকদিগের যাহাতে অহিফেন সেবনে আসক্তি জন্মে, তাহার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করা হইয়াছিল।

হাইণ্ড মহোদয় এই চেষ্টার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,—গ্রামে গ্রামে প্রথমে আফিমের দোকান খোলা হইল। তাহার পর পল্লীবাসী যুবকদিগকে দোকানে ডাকিয়া বিনামূল্যে অহিফেন-বিতরণের ব্যবস্থা করা হইল। কিছুদিন পরে যখন হতভাগ্যদিগের অহিফেন সেবনে অভ্যাস জন্মিল, তখন অতি অল্পমূল্যে এই বিষ বিক্রীত হইতে লাগিল। ক্রমে যে পরিমাণে যুবকদিগের নেশা

বাড়িতে লাগিল, গবনমেণ্ট সেই পরিমাণে উহার মূল্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিনের মধ্যে দেশের নানা স্থানে অহিফেনের প্রচার বাড়িল,—পল্লীবাসী যুবকদল আফিমখোর হইয়া উঠায় পশুর অধম হইল।

যে সুরা এদেশে লোকের "অপেয়" ও "অস্পৃশ্য" ছিল, তাহার স্রোতে আজকাল সমাজ ভাসিয়া যাইতেছে। যে ঘৃণিত উপায়ে এদেশে আফিমের কাট্‌তি বাড়ান হইল, মদের কাট্‌তি বাড়াইবার জন্যও যে প্রথমে সেই নিন্দনীয় উপায়ই অবলম্বিত হইয়াছিল, স্যার সিসিল বিডন এ কথা বিলাতে গিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিবৎসর মদের কাট্‌তি না বাড়াইতে পারিলে কলেক্টর ও ডেপুটি কলেক্টরদিগকে প্রকাশ্যভাবে তিরস্কার করা হইত, বঙ্গীয় রেভিনিউ বোর্ডের পুরাতন রিপোর্ট সমূহ পাঠ করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজস্ব-বৃদ্ধির আশায় কর্তৃপক্ষ পঞ্জাবে সুরার প্রচলন-বিষয়ে এরূপ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন যে, তাহাতে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হইল। বহুপ্রদেশ সুরার বিষময় পরিণামে জনশূন্য হওয়ায় সরকারি রাজস্ব কমিয়া গেল। এ বিষয়ে পাঞ্জাবের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার ডোনাল্ড ম্যাকলিয়ডের উক্তি এই,—

In the Nerpudda territories I have known whole districts *depopulated* in consequence of the action of our spirit contractors. They used to send people all over the country to reduce these poor simple folk and utterly *demoralise* them. They got on their books, and, after being *out of house and home*, they absconded in thousands.

এখনও আবগারি বিভাগের আয় বাড়াইবার জন্য—ভারতীয় সমাজের চরিত্রবল হরণ করিবার জন্য—কর্তৃপক্ষের যত্নের ত্রুটি নাই। সরকারি রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধ হয় যে, প্রতিবৎসরই মাদকদ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইতেছে! আবগারির আয় বাড়াইতে কর্তৃপক্ষের যেরূপ যত্ন, দেশে সুশিক্ষার বিস্তারে সেরূপ যত্ন নাই, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে! সুসভ্য ইংরাজের এই বিসদৃশ কার্য-নীতির ফল কিরূপ ভীষণ হইয়াছে, মিঃ কস্ট মহোদয় পশ্চাল্লিখিত বর্ণনায় তাহা সুব্যক্ত করিয়াছেন—

As to the demoralising effect of our control on the character of the native, we have presented to us the most fearful corroboration of was asserted by Shore and reiterated by Campbell, ...In the course of compartively few years we succeed in destroying whatever of truthfulness and honour they have by nature, and substituting in its place

habits of trickery, chicanery, and falsehood. Every native will tell you that it is impossible now-a-days, to find an honest man ···· Our whole System of law and government and education tends to make the natives clever, irritigious, litigious scamps. No man can trust another. Formerly a verbal promise was as good as a bond. Then bonds became necessary. Now bonds go for nothing and no prudent banker will lend money without receiving landed property in pledge...............

You are only to compare our new provinces with our old. From the recently acquired Punjub where the people have had little of our law and government, and education, are comparatively truthful and honest, the population becomes worse and worse, as you descend lower and.lower, to our old possessions of Calcutta and Madras.

ভারতবর্ষে ইংরাজ যে শাসন-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসীর চরিত্র দিন দিন হীন হইবে, স্যার জন শোর ও ক্যাম্বেল মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের মধ্যেই বৃটিশ শাসনে ভারতবাসীর স্বাভাবিক সত্যপ্রিয়তা ও সাধুতা অপহৃত হইয়াছে। প্রতারণা, কপটতা, ও মিথ্যাবাদ ভারতীয় সমাজে বিশেষ প্রশ্রয়লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক ভারতবাসীই এখন বলে, আজকালকার দিনে ভাল লোক পাওয়া অসম্ভব। আমাদিগের আইনে শাসনে ও শিক্ষায় ভারতবাসীকে ধূর্ত, অধার্মিক ও মামলাবাজ করিয়া তুলিয়াছে। এখন কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। পূর্বে লোকের মুখের কথা দলিলের ন্যায় অটল বলিয়া বিবেচিত হইত ; পরে দলিল বিশ্বাসের আধার হইল। এখন দলিলেও কেহ বিশ্বাস করে না। কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই আর স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক না পাইলে টাকা ধার দিতে অগ্রসর হয় না। যে সকল অঞ্চলে ইংরাজ শাসন ও শিক্ষা বদ্ধমূল হয় নাই, সে সকল অঞ্চলে সাধুতা ও সত্যপ্রিয়তার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়—নববিজিত পঞ্জাবের সহিত বঙ্গদেশ ও মাদ্রাজ প্রদেশের লোকের তুলনা করিলেই এ কথা বুঝিতে পারা যাইবে।

হায়! কোথায় সুসভ্য ইংরাজের সংসর্গে ভারতবাসীর চরিত্র দিন দিন উন্নত হইবে, না ক্রমেই তাহার অবনতি ঘটিতেছে। দীর্ঘকালের মুসলমান শাসনেও ভারতীয় সমাজের যে চরিত্রগত অবনতি ঘটে নাই, স্বল্প দিনের ইংরাজ শাসনে তাহাই ঘটিল, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। ইংরাজের বর্তমান দোষ-

বহুল শাসননীতির পরিবর্তন না ঘটিলে এই চরিত্রাবনতির স্রোত ক্রমেই বেগশালী হইবে, সন্দেহ নাই।

ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটিবার আর একটি কারণের বিষয়ে জাতীয় মহাসমিতির দশম অধিবেশনের সভাপতি মিঃ আল্‌ফ্রেড ওয়েব মহোদয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

It is my growing conviction that disastrous consequences must sooner or later result from persistent virification of Indian character......I know how such virification has worked in us, at times turning our better natures into gall and being responsible for many a hideous passage in our history......*Subject people are abnormally sensitive to the feeling towords them of their rules.*

ভারতবাসীর চরিত্রের অনবরত কুৎসার বিষময় ফল, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, একদিন অবশ্যই ফলিবে আমার এইরূপ বিশ্বাস দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে। ঈদৃশ কুৎসায় আমাদিগের (আইরিশদিগের) কিরূপ অনিষ্ট হইয়াছে তাহা আমি জানি। ইহাতে আমাদের অনেক সদ্‌গুণ বিনষ্ট হইয়াছে। এইরূপ নিন্দাবাদে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে অনেক ঘটনা বীভৎস ভাব ধারণ করিয়াছে। রাজ-জাতির কৃত নিন্দা ও স্তুতিতে পরাধীন জাতির চরিত্রে অতি সহজে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে।

মহাভারতীয় উপাখ্যানে কথিত হইয়াছে যে, কর্ণকে হীনবল করিবার নিমিত্ত তদীয় সারথি পাণ্ডব-হিতৈষী মদ্ররাজ শল্য তাঁহার বহুল নিন্দা করিয়াছিলেন। রাজ-জাতির মুখে অহরহঃ আত্ম-নিন্দা শ্রবণ করিলে সাধারণতঃ সকলেরই আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় ও আপনাকে অকর্মণ্য হীনশক্তি বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। এই ভ্রান্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ক্রমশঃ বুদ্ধিভ্রংশ ও চরিত্রবলের হানি হইতে থাকে। এই কারণেই স্বজাতি-নিন্দা শ্রবণ করা পাপ—অর্থাৎ অবনতিকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইংরাজের নিন্দায় আইরিশ জাতির চরিত্রের যথেষ্ট অবনতি সাধিত হইয়াছে। তাই ভারতবাসীর প্রতি বৈদেশিক রাজ-জাতির নিন্দাবর্ষণ দেখিয়ে সহৃদয় ওয়েব মহোদয় উপরি উদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশপূর্বক আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

আত্মশক্তির প্রতি ভারতবাসীর যাহাতে বিশ্বাসের লাঘব হয় তাহার উদ্দেশ্যে অনেক রাজপুরুষ এদেশের লোক-চরিত্রের নিন্দা করিয়া থাকেন। উচ্চ বেতনের পদসমূহে যাহাতে ভারত-সন্তানের পরিবর্তে অধিকসংখ্যায় স্বজাতীয়েরই নিয়োগ

হয় তত্নদ্দেশ্যেও অনেক সুচতুর ইংরাজ আমাদিগের চরিত্রে দোষারোপ করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। On the Edge of the Empire নামক পুস্তকে একজন রাজপুরুষ লিখিয়াছেন—

The native of India, like the *ape*, is at his best in childhood and deteriorates as he grows older.

ভারতবর্ষের অধিবাসীরা পুচ্ছহীন মর্কটের মত বাল্যকালে কিছু ভাল থাকে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাদের চরিত্রের ক্রমশঃ অবনতি আরম্ভ হয়।

একজন ইংরাজ জেনারেল, অল্পদিন পূর্বে এদেশবাসীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

The only way to do is to exercise no mistaken clemency, but to slay and slay, and slay, recognising no surrender. That is the only logic that an Eastern people can really understand.

সৌভাগ্যের বিষয় ইহাদিগের কৃত নিন্দা সকল সময়ে এদেশবাসী জনসাধারণের কর্ণগোচর হয় না। পক্ষান্তরে অনেক সহৃদয় রাজপুরুষ ভারতবাসীর চরিত্রের যথোচিত প্রশংসাও করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় চরিত্রের হীনতা প্রদর্শনকার্যে খৃষ্ট-শিষ্য মিশনরি মহাশয়দিগেরই সমধিক আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয় এবং ইহাদিগেরই কুহকপূর্ণ বাক্যে আমাদের দেশের অনেক সরলচিত্ত শিক্ষিত ব্যক্তিও ভ্রান্তিপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। হিন্দুসমাজের উপরেই ইহাদের আক্রমণবেগ কিছু প্রবল। "চর্চ কোয়ার্টার্লি রিভিউ" পত্রে জনৈক রেভারেণ্ড (ভক্তিভাজন) মিশনরি কিছুদিন পূর্বে লিখিয়াছিলেন,—

That the Hindus as a race are probably the most immoral, treacherous and cunning people on the face of this wicked earth will generally be admitted.

এই পাপপূর্ণা পৃথিবীতে বোধ হয় হিন্দু জাতিই সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিপরায়ণ, বিশ্বাসঘাতক ও ধূর্ত, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

এই নিন্দার মধ্যে বোধ হয় একটু অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছিল। তাই একটি কোমল-হৃদয়া মিশনরি মহিলা গত ১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসের Sentinel (সান্ত্রী) পত্রে লেখনীধারণ করিয়া অনুগ্রহপূর্বক সে অসম্পূর্ণতা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই মহিলা ইংলণ্ডীয় বিশ্ব-সুহৃদ-সমাজে (British philanthropic societies) বিশেষ সম্মানিতা। ইনি বলিয়াছেন,—

Hinduism is impurity crystallized into a system.

স্ফটিকাকারে ঘনীকৃত অপবিত্রতা ও হিন্দুধর্ম একই পদার্থ।

মুসলমান বা জাপানী সমাজে যে অপবিত্রতা বা বিশ্বাসঘাতকাদি দোষের লেশমাত্র নাই তাঁহাদিগের ধর্ম যে মিশনরিদিগের মতে খৃষ্ট ধর্মের ন্যায় "নিরবচ্ছিন্ন পবিত্রতায় ও সার সত্যে পরিপূর্ণ" তাহা নহে। তথাপি তাঁহাদিগের নিন্দাবাদে মিশনরি মহাশয়দের তাদৃশ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। জাপান ও পারস্য স্বাধীন দেশ বলিয়া সেখানে এই খৃষ্ট-শিষ্যগণ বহু পরিমাণে বাক্‌সংযম করিয়া থাকেন। চীন ও জাপানে একই ধর্ম প্রচলিত; কিন্তু চীনদেশে মিশনরিদের যেরূপ উচ্চ কণ্ঠ শ্রুত হওয়া যায়, জাপানে সেরূপ নহে। কারণ, চীন দুর্বল আর জাপান প্রবল। ভারতবাসী মুসলমান পরাধীন হইলেও তাঁহাদিগের তেজস্বিতা সামান্য নহে।

শুনিতে পাই, মিশনরি মহাশয়েরা এদেশবাসী নর-নারীর চরিত্রে ধর্মভীরুতার অভাব ও কুসংস্কারের প্রাবল্য দর্শনে বিশেষ চিন্তিত। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে যখন দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল, তখন ইঁহারা বাইবেলের দোহাই দিয়া সেই ঘোরতর নিষ্ঠুর প্রথার সমর্থন করিতেন! ইউরোপে যখন দর্শন-বিজ্ঞানের প্রথম চর্চা আরম্ভ হয়, তখন এই সুসংস্কারসম্পন্ন খৃষ্টীয় যাজকসম্প্রদায় রাজশক্তির সাহায্যে জ্ঞানের পথ কণ্টকিত ও স্বাধীন চিন্তার দ্বার অবরুদ্ধ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইঁহাদিগেরই জন্য ইউরোপের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, চিতার অনলে দার্শনিক ও তত্ত্বানুসন্ধানীদিগের ক্ষণভঙ্গুর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল; ইতিহাস এ কথার অদ্যাপি সাক্ষ্যদান করিতেছে। কিন্তু পুরাতন কথার আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া যদি ইঁহাদিগের বর্তমান কার্যপ্রণালীর প্রতি মনোনিবেশ করা যায়, তাহা হইলেও ইঁহাদিগের উদ্দেশ্যের সাধুতায় সংশয় জন্মে। যে বৈরাগ্য, শান্তি, পাপভীরুতা ও স্বার্থত্যাগ যীশু খৃষ্টের প্রধান শিক্ষা বলিয়া ইঁহারা আমাদিগের নিকট সগৌরবে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের স্বদেশে তাহার একান্ত অভাব দেখিয়াও ইঁহারা বিন্দুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন না। মিঃ এ. আর. ওয়ালেস প্রণীত The Wonderful Century নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই,—

The whole world is but the gambling table of six great powers,......Just as gambling deteriorates and demoralizes individual, so the greed for dominion demoralizes governments. Witness their struggle in Africa and Asia, where millions are enslaved and bled for the exclusive benefit for their new rulers......It will be held by the historian of future that we of the 19th Century were *morally* and *socially* unfit to possess for good or for evil what the rapid

advance in scientific discoveries had given us. What a horrible mockery is all this when viewed at the light of Christianity! Of real Christian deeds there are none; no real charity, no forgiveness of injures, no help to the oppressed.

ভাবার্থ—সমগ্র ভূমণ্ডল 'ছয়টি প্রধান রাজশক্তির দ্যূতক্রীড়ার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। জুয়াখেলায় যেমন ব্যক্তিবিশেষের নৈতিক অবনতি সাধিত হয়, অত্যধিক সাম্রাজ্য-লিপ্সায় সেইরূপ রাজশক্তির অধোগতি ঘটিয়া থাকে। এসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ডে ইহাদিগের কিরূপ স্বার্থ-সংগ্রাম চলিতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখিবে, আপনাদিগের ইষ্টসিদ্ধির জন্য ইহারা লক্ষ লক্ষ লোককে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতেছে। নূতন শাসকদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য হতভাগ্য বিজিতদিগকে আপনাদিগের শোণিত-দান করিতে হইতেছে। ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকগণ অবশ্যই বলিবেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, ধর্মের চক্ষে, সমাজের চক্ষে আমরা তাহা গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। খৃষ্টধর্মের দিক দিয়া দেখিলে এই সকল কাণ্ড কি ভয়াবহ প্রহসন বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃত খৃষ্ট ধর্মানুমোদিত একটিও কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে না;—প্রকৃত বদান্যতা, অপকারীর প্রতি ক্ষমা অত্যাচার পীড়িতদের সহায়তা—এ সকলের কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছে না।

যে স্বার্থপরতা হইতে সকল প্রকার অধর্মের উৎপত্তি হয়, যাহার অনিষ্টকর পরিণামপরম্পরা সম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

সেই স্বার্থপরতা পাশ্চাত্যসমাজে কিরূপ প্রবলতালাভ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অধ্যাপক ল্যাড (Professor Ladd, L.L.D.) তাঁহার Moral and Religious Crisis নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

In business, in politics, in the family and the church, in internal and international relations, the reigning spirit of *covetousness* is at war with true spirit of morality and religion···The criminal spirit of insolence has become dominant in the whole of Christendom. This insolence is the crime of thinking and action as though *there were no controlling power remaining in the Divine hands.*

বিষয় কর্মে, রাজনীতিক্ষেত্রে, পারিবারিক ব্যাপারে, ধর্মমন্দিরে, স্বদেশীয় ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ-বিচার-স্থলে সর্বত্রই প্রকৃত ধর্ম ও সুনীতিমূলক ভাবের সহিত অদম্য স্বার্থলালসার ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে। খৃষ্টধর্মানুশাসিত সমাজ-নিচয়ে সর্বত্র ঔদ্ধত্যের দূষণীয় ভাবটাই আজকাল প্রাধান্য-লাভ করিয়াছে। যেন জগদীশ্বরের হস্তে মানবকে শাসন করিবার আর কোনও ক্ষমতাই অবশিষ্ট নাই—এইরূপ ভাব প্রবল হইয়াছে এই দূষণীয় ভাবের বশীভূত হইয়াই সকলে কার্য করিতেছে।

ইংলণ্ডীয় রমণী-সমাজের নিম্নস্তরে পান-দোষের কিরূপ প্রাবল্য ঘটিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ম্যাঞ্চেস্টারের মহিলা ইন্‌সপেক্টর কুমারী ফ্রান্সিস জেনেটি গতবর্ষের বার্ষিক রিপোর্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার একাংশ এই,—

Among women the gross death-rate from alcoholism was 74 per million higher than amongst males, and from 1881 to 1900, while the male death-rate from this cause increased 48 per cent, that of females went up 75 per cent. These figures applied only to deaths directly caused by inebriety, but many diseases were induced and aggravated by intemperance.

ফলতঃ পাশ্চাত্য-সমাজ যেরূপ ঘোর অধর্মের গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া মনুষ্যত্বের নামে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতেছে, তাহাতে ইউরোপ খণ্ডেই এক্ষণে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ধর্ম-প্রচারকের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম-প্রচারকের পক্ষে ইদানীং ইউরোপের ন্যায় কার্যক্ষেত্র পৃথিবীর আর কোথাও নাই। পাশ্চাত্য সমাজে যাহাতে সুনীতির সঞ্চার হয়, পাপানলে দহ্যমান প্রাণিকুলের হৃদয়ে যাহাতে ধর্মামৃত সেচিত হয়, প্রত্যেক ধার্মিকের এখন তাহাই প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আমাদের পাদ্‌রি মহাশয়দিগের সে দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত হয় না কেন? যাহারা স্বদেশীয় সমাজের পাপ-ক্ষয়কার্যে নিরত থাকিয়া ভগ্ন-মনোরথ হইতেছেন, তাঁহাদিগের সহায়তায় অগ্রসর না হইয়া ইঁহারা ভারতবর্ষের ন্যায় সুদূর দেশে আগমন, এখানকার ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ ও অত্রত্য অজ্ঞাত-চরিত্র নরনারীর চরিত্র-সংশোধনের শ্রম-স্বীকারে অধ্যবসায় প্রকাশ করেন, ইহাও কি সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে? গৃহ-সংস্কার অপেক্ষা পরচ্ছিদ্রান্বেষণ ও পরোপদেশে পাণ্ডিত্য-প্রকাশ সহজসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু প্রসংশনীয় নহে।

ইঁহাদিগের অনুগ্রহে হিন্দু-মুসলমানকে পথে ঘাটে স্বধর্মের স্বদেশীয় সমাজের ও স্বকীয় পূর্বপুরুষগণের কঠোর-নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে হয়, বাইবেল-বর্ণিত সর্প ও মনুষ্যের কথোপকথন, গর্দভের দেব-দূত-দর্শন, শূকরের

ভূতাবেশ প্রভৃতি উপন্যাসে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে অসমর্থ হইলে "মূর্খ" ও "কুসংস্কারাচ্ছন্ন" প্রভৃতি শ্রুতিসুখকর বিশেষণে আপ্যায়িত হইতে হয়। ভারত-বাসীর অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য জেনানা মিশনের সৃষ্টি করিয়া ইহারা যে অনর্থ ঘটাইতেছেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নহে।

ভেদনীতি-কৌশলে ইহাদিগের নৈপুণ্য কুটিল রাজনীতি-বিশারদগণেরও অনুকরণীয়। ইহারা বলেন,—"শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে অনেকে নেটিবদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা দুঃখের বিষয় বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা অপর জাতি-দিগের সম্বন্ধে হৃদয়ে যেপ্রকার ঘৃণা পোষণ করেন নেটিবের প্রতি শ্বেতাঙ্গের ঘৃণা তাহার তুলনায় অতি সামান্য। ফলতঃ জাতি-ভেদের জন্যই ভারতবর্ষের বর্তমান পরাধীনতা ঘটিয়াছে।" বিগত ৭ শত বৎসরের মধ্যে ভারতের সিংহাসন লইয়া হিন্দু-মুসলমানে যে সকল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহার কয়টিতে জাতিভেদের জন্য হিন্দুগণ পরাজিত হইয়াছিলেন, পলাশীর যুদ্ধেই বা জাতিভেদ কতদূর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ইহারা নির্দেশ করিতে অগ্রসর হন না। সেকালে আপাতদৃশ্যমান বৈষম্য-বাদ সত্ত্বেও পল্লীগ্রামে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সদ্ভাব ছিল, ব্রাহ্মণের মুখেরও "কামার দাদা" "কুমার খুড়ো" প্রভৃতি আত্মীয়তা-সূচক সম্বোধন সর্বত্র শ্রুত হইত; এখন মৌখিক সাম্যবাদের প্রচার বাড়িলেও সে প্রাচীন ঘনিষ্ঠতা বিলুপ্ত হইয়াছে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে দূরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে, এ কথা কি অস্বীকার করিতে পারা যায়?

যীশু খৃষ্ট জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সুসমাচারে প্রচার-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই পাদরী মহাশয়েরা নিরন্তর পর-ধর্মের তীব্রতম নিন্দার দ্বারা শান্তিপূর্ণ দেশে অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া থাকেন, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। এদেশে যখন ইংরাজেরা রাজনীতিক প্রয়োজনে ন্যায় ও ধর্ম পদদলিত করিতে থাকেন, তখন সেই পাপ-কার্যের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতে ইহাদিগের সাহসে কুলায় না। অথচ ভারতবাসীর নৈতিক সাহসের অভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় ইহাদিগের অসীম উৎসাহ প্রকাশ পায়।

ইহার কারণ কি? মিশনরি চরিত্রে এইরূপ বিসদৃশ ভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হয় কেন? উত্তরে মিঃ আলফ্রেড ওয়েব বলেন,—

Foreign mission work has become a career to thousansd ......Young men and women are enabled through it to marry, to settle down, and rear families. In the interest of

missionary enterprise there is sometimes apparent a tendency to stimulate support by expatiating upon the darkest side of "Heathen" character. *The darker it is painted, the freer will be the flow of subscriptions*, the more occupation there will be for the missionary.

অধুনা বিদেশে গিয়া ধর্মপ্রচারের ব্যবসায় সহস্র সহস্র লোকের জীবিকা-নির্বাহের উপায়স্বরূপ হইয়াছে। এই ব্যবসায়ে আশ্রয়হীন যুবকযুবতীদিগের পরিণীত হইবার, সংসার পাতিবার ও বংশবৃদ্ধি করিবার সুবিধা হইয়া থাকে। কাজেই এই ব্যবসায় যাহাতে অব্যাহতভাবে চলে, তাঁহার জন্য খৃষ্টধর্মে বিশ্বাস-বিহীন জাতিদিগের চরিত্রের অপকৃষ্ট অংশ বিশেষভাবে জনসাধারণের গোচর করিবার চেষ্টা করা হয়। কারণ, অন্যধর্মাবলম্বীর চরিত্র যতই কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হইবে, ততই উহাদিগের মধ্যে ধর্মপ্রচারার্থ মিশনরি প্রেরণের জন্য পাশ্চাত্যদেশের ধর্মভীরু লোকেরা অধিক পরিমাণে চাঁদা দিবেন, ফলে মিশনরি ব্যবসায় ও লাভজনক হইয়া উঠিবে!

এই স্বার্থপর ধর্ম-ধ্বজদিগের কুটিলতায় এদেশের যুবক-সমাজের বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটিতেছে, দেশের একতা বিনষ্ট হইতেছে, স্বদেশীয় সমাজের প্রতি অনেকের ভক্তি-শ্রদ্ধা হ্রাস পাইতেছে।* বিদেশে পাশ্চাত্য সমাজে আমরা হেয় ও উপেক্ষিত হইতেছি। ডিগ্‌বি মহোদয় এ কথা স্বীকার করিয়াছেন,—

As a hindrance to their (the Indians') proper recognition as men of character and of noble life, the Christian missionary societies of England interested in India have done the Indian people *almost irremidiable mischief.*

এই সকল কারণে মিশনরি-রহস্য এস্থলে সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হইল।

মিশনরি সমাজে কতিপয় সদাশয় ও বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। তাঁহাদিগের চেষ্টায় এদেশে অনেক শুভানুষ্ঠান হইয়াছে; সে জন্য আমরা বিশেষ উপকৃত ও কৃতজ্ঞ। তাঁহারা এই প্রকার নিন্দাবাদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এস্থলে একজন মিশনরি মনীষীর উক্তি একটু বিস্তারিত-ভাবে উদ্ধৃত করা গেল।

I see with a kind of indignation that these peaceable and submissive people have of late years been a kind of *target*. to aim at them the shafts of calumny and malevolence and *to debase them by the most unfair means.*

---

* মিশনরিদিগের প্রচারিত ভারতীয় সমাজের নিন্দাপূর্ণ পুস্তকাদির—বিশেষতঃ মান্দ্রাজের পাদরী মরডক সাহেবের পুস্তকাবলীর সমালোচনাপ্রসঙ্গে "নিউ-ইণ্ডিয়া" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন,—

Alas ! it is *not Bibles* the poor Hindus want or ask for. It is *food* and *raiment*. When the belly is empty and the back bare, the best disposed even among the Christians feel themselves but very little inclined to peruse the Bible ...... Bibles cannot be to them (the Hindoos) of the least utility ......It has at present become a king of fashion to speak of improvements and amelio-rations in the civilizations of the Hindoos, and every one has his own plant for effecting them ; but if we could for an instant lay aside our European eyes and European prejudices and look at the Hindoos with some degree of impartiality, we should perhapsfind that *they are nearly our equals in all that is good and our inferiors only in all that is bad* ...... In fact, in education, in manners, in accomplishments and in the discharge of social duties, *I believe them superior to some European nations and scarcely inferior to any* ...... If you will take the trouble to attend to the subject and examine with impartiality the character and conduct of the persons of the same condition in our countries and in India, and compare husbandman to husbandman, artificer to artificer, mechanic to mechanic etc. etc. I apprehend that you will find that, in education and manners, *the Hinoo shines far above the European.*

Without a knowledge of alphabet, they (Hindoo females) are dutiful daughters, faithful wives, tender mothers and intelligent housewives ...... Such is the result of my own observations. *Abbe J. A. Dubois.*

এইরূপ আরও অনেক মনীষীর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু স্থানাভাবে ও অনাবশ্যক বোধে সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হইল। এই বহুদর্শী মিশনরি

They seem oftentimes to us to be far more injurious, than helpful to the cause of social or religious reform. Indeed the cause of reform in India has suffered more from the abusive efforts of the *professional reformers*, both *Indian* and European than from anything else. Nov. 5, 1903.

তাহার পর পাদরী মরডকের প্রকাশিত পুস্তকাবলীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছেন—

As literature they are absolutely worthless......foolish and offensive effusions.

"বঙ্গভাষা" নামক মাসিক পত্রিকার ১ম বর্ষের ৯ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত "আমাদের ইতিহাস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হিন্দু-চরিত্রের সহিত পাশ্চাত্য-চরিত্রের তুলনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে আমাদিগেরই সহসা বিশ্বাস-স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মনে হয়, আমরা অতি হীনচরিত্র, জগতে সকলের অধম। রাজ-জাতির মুখে অনবরত স্ব-জাতির নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া আমাদের এইরূপ মানসিক অবনতি ঘটিয়াছে।

ইংরাজ-শাসনের ফলে এদেশে ধর্ম-শিক্ষা ও লোক-শিক্ষারও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। তাহাও আমাদিগের মানসিক অবনতি-সাধন-বিষয়ে অল্প সহায়তা করে নাই। পূর্বে এদেশে লোক-শিক্ষা বা জ্ঞান-বিস্তারের বহুল উপায় প্রচলিত ছিল। দক্ষিণাপথের হেমাদ্রি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে "চতুর্বর্গ-চিন্তামণি" নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন, অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তাহা বঙ্গদেশে সুপরিচিত হইয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও গোবর্ধনাচার্যের শতকগুলি বঙ্গদেশে রচিত হইবার পরমুহূর্তেই মহারাষ্ট্রদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ফলতঃ সেকালে দেশ-ভেদ, ভাষা-ভেদ ও জাতি-ভেদ বা শ্রেণীভেদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশগুলি একটি ঐক্যসূত্রে বদ্ধ ছিল,* দেশে জ্ঞান-বিস্তারের সহজ উপায় প্রচলিত ছিল।

লোক-শিক্ষার প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, —

"লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্মের কূটতর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম চরণকে আর্দ্র করে। ...(কিন্তু) সেই কূটতত্ত্বময়, নির্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্বোধ্য-ধর্ম শাক্যসিংহ ও তাহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে—গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন—লোকশিক্ষাব কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল, দিগ্বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম শিখাইলেন—লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সেদিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না।"

তাহার পর বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন যে, পূর্বের ন্যায় এখন আর লোকশিক্ষার উপায় নাই বলিয়াই রামমোহন রায়ের সময় হইতে এপর্যন্ত বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। সেকালে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে যে কথকতা ও পুরাণপাঠ হইত, তাহার প্রসঙ্গে উত্থাপন করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

"কথক সীতার সতীত্ব, অর্জুনের বীরধর্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়-জয়,

রাক্ষসীর প্রেম-প্রবাহ, দধীচির আত্ম-সমর্পণ, বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণের সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেজে, যে কাটুনা কাটে, যে ভাত পায়, না পায়, সেও শিখিত— শিখিত, ধর্ম নিত্য, যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপপুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম, যে লোক-হিত পরম কার্য। —সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য-যুবকের কুরুচির দোষে। ……(অনেকে এখন ভাবেন) কথকের কথা শুনিয়া কি হইবে? দক্ষযজ্ঞে, বিশ্ব যজ্ঞে ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? …… (তাই) লোক-শিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরাজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্ধিত হইতেছে না।

"কেন যে ইংরাজী শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায়, হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার মূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না।"

দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতে এখনও কথকতা ও পুরাণ-পাঠের প্রথা আছে। তবে ইংরাজী শিক্ষার গুণে দিন দিন কমিয়া যাইতেছে—কথকতার যে সুফলের কথা বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, তাহার যাথার্থ মিঃ সি. এফ. গর্ডন কমিং প্রণীত In the Himalayas and on the Indian Plains গ্রন্থে পশ্চাল্লিখিত কয়েক পঙ্ক্তি হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে—

Hindoos whose marvellous self-denial in the service of their gods does certainly put our self-indulgent practice of Christianity to the blush. No one who studies the creed and practice of this race with unbiassed mind, can fail to be struck with their intense earnestness in living up to teaching, which, however, distorted, has in it rich viens of thought …· which we deem most sacred …… So too although we Christians are taught that 'wheter we eat or drink or whatsoever we do, we should do all to the Glory of God." I think it can scarcely be a transgression of charity to judge that comparatively few habitutlly obey this precept, where as the most casual observer cannot fall to

see that in the daily life of the average Hindoos this is the ruling principle

মনীষী বৈদেশিকেরাও ইহা দেখিতে পান ; কিন্তু আমরা সকল সময়ে দেখিতে পাই না। বাক্‌পটু প্রবল বিদেশীর মুখে স্বজাতি ও স্বধর্মের অনবরত নিন্দাবাদ শ্রবণ করিতে বাধ্য না হইলে কি আমাদের এরূপ শোচনীয় মানসিক অবনতি ঘটিত ?

কিছুদিন পূর্বে "হিতবাদী"-তে জনৈক চিন্তাশীল পত্র-প্রেরক যথার্থই লিখিয়াছিলেন,—

"আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব আমাদিগের উন্নতি-পথে ঘোর প্রতিবন্ধক।······এই আত্মবিশ্বাসের অভাব ইংরাজ প্রদত্ত শিক্ষার একটি ফল। ইংরাজ ভারতে পদার্পণ করিয়া অবধি ইতিহাসে, সংবাদপত্রে, সভায়, আর কখন কখন আমাদের কর্ণমূলে প্রাণপণ চেষ্টায় বাঙ্গালীর নিন্দা গাইয়াছেন ; এত চেষ্টা ও চীৎকারের পর যদি বাঙ্গালী সত্য সত্যই অপদার্থে পরিণত হয়, তাহা বিচিত্র কি ? এইরূপে উপেক্ষিত হইয়া আইরিশ জাতি আয়র্লণ্ডে ছিন্ন কন্থা মলিনদেহ গোলামের মত ছিল, কিন্তু আমেরিকায় যাইয়া তাহারা এখন ইংরাজের চক্ষুর অন্তরালে কি মহাজাতিই গঠিত করিয়া তুলিল! কে বলিতে পারে, এই ইংরাজ সৃষ্ট জাতিগত পৌরুষহীনতার কুহেলিকা (national hypnotism) কাটিয়া গেলে, ভারতের বিলুপ্ত মহাশক্তি আবার পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে না।"

তাহার পর জাতীয় দারিদ্র্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"দরিদ্রের পতিপ্রাণ স্ত্রী, আদর্শ পুত্র, দেবীতুল্যা কন্যা থাকিলেও অশান্তি ঘুচে না, দৈন্যের সহিত সহস্র কলহ, বিবাদ, নীচতা, স্বার্থ, অসুখ আসিয়া গৃহে প্রবেশ করে। দরিদ্রতা ঘুচিলেই সব দোষ স্বতই বিলুপ্ত হয়। আমাদের জাতীয় জীবন দিন দিন ঘোর দারিদ্র্যগ্রস্ত হইতেছে, ধনের হ্রাসের সহিত স্বভাবতই লোকের স্বার্থ চিন্তা বাড়িতেছে ; তাই আমরা এতটুকু আপন বস্তু পরের জন্য, দেশের জন্য ত্যাগ করিতে পারি না ; কারণ, আমার যে ঐটুকুই আছে। এই জাতীয় দীনতা ঘুচিলে, গৃহে লক্ষ্মীর সমাগম হইলে চরিত্রেও নানা সদ্‌গুণের স্ফূর্তি পরিলক্ষিত হইবে। তখন আর এত আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না, তখন একদিনে বাঙ্গালী মানুষ হইবে।"

ফলতঃ দশ কোটি ভারত সন্তানের নিত্য অর্ধাশন-ক্লেশ যদি নিবারিত হয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা যদি হ্রাস পায়, কর্তৃপক্ষ মাদকের প্রচার সংযত করেন, যদি ভারতবাসীকে বুদ্ধি-বিকাশের যথেষ্ট অবসর দান করেন, তাহা হইলে সাত্ত্বিকতা-প্রিয় হিন্দু-মুসলমানের চরিত্রবল নিঃসন্দেহ বৃদ্ধি পাইবে।

কৃষকের সর্বনাশ

"অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ!" স্বজাতীয় হউন বিজাতীয় হউন, স্বদেশীয় হউন বিদেশীয় হউন, রাজা প্রকৃতপক্ষে জনসমাজের প্রতিনিধি মাত্র। সমাজের প্রতিনিধিরূপে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, সামাজিকগণের ধর্মনীতি ও ধনসম্পত্তি-বর্ধনের উপায়বিধান প্রভৃতি বিষয়ের সুব্যবস্থাপূর্বক জনসমাজের সুখশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁহার প্রধান কার্য। এই কর্তব্যসাধন বহু ব্যয়সাপেক্ষ। সেই ব্যয়-নির্বাহের জন্য প্রজার নিকট হইতে রাজাকে কর গ্রহণ করিতে হয়। প্রজাও সুখশান্তির আশায় সানন্দচিত্তে রাজাকে কর দান করিয়া থাকে। রাজা একগুণ কর লইয়া এরূপ সুব্যবস্থার সহিত উহার ব্যয় করিয়া থাকেন যে, তাহাতে প্রজাকুল সহস্র গুণে উপকৃত হয়। তাই কবিকুলগুরু কালিদাস আদর্শ নরপতি দিলীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি বসং রবিঃ॥

প্রজার এরূপ অসীম মঙ্গলসাধন করেন বলিয়াই আমাদিগের শাস্ত্রে রাজাকে দেবাংশ সম্ভূত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে বলা হইয়াছে। এই কারণেই রাজার মৃত্যু ঘটিলে প্রজা বিপ্লবের ভয়ে আশঙ্কিত হইয়া উঠে—অপর রাজার সিংহাসনারোহণকাল পর্যন্ত ত্রস্ত অবস্থায় যাপন করে। অতঃপর নূতন রাজা সিংহাসনস্থ হইয়া প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করিলে, লোকের চিন্তা দূর হয়। লোকযাত্রা নির্বাহের পথ বিঘ্নাশূন্য হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করে। নূতন রাজার অভিষেকে প্রজাবর্গের আনন্দ-প্রকাশের ইহাই মূল কারণ। অরাজক অবস্থায় সমাজে শান্তিভঙ্গের ভয় না থাকিলে, নবীন নরপতির অভিষেক-ব্যাপারকে প্রকৃতিপুঞ্জ "উৎসব" নামে অভিহিত করিতে সম্মত হইত কি না সন্দেহ। রাজার জন্ম-মৃত্যুর সহিত প্রজার সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ পৃথিবীতে যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন রাজার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও নব ভূপতির অভিষেকে উৎসবানুষ্ঠান লোকসমাজ হইতে তিরোহিত হইবে না।

ফল কথা, রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিনিধি। সমাজের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাকে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করিতে হয়। শাসন, পালন ও সুখ-সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় প্রজা রাজাকে কর প্রদান করে। এই কারণে করগ্রাহী রাজা "প্রজার ধনরক্ষক" নামে সভ্যসমাজে পরিচিত। রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহাতে রাজার অধিকার অতি সামান্য উহা Public Wealth বা প্রজা-সাধারণেরই সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রাজা এই "প্রজার সম্পত্তি" প্রজার মঙ্গলের জন্য

ব্যয় করিতে ধর্মতঃ বাধ্য। ইহাই সভ্য দেশের ও সভ্য সমাজের নিয়ম। সুসভ্য বৃটিশ রাজ্যে এই নিয়ম অতীব প্রবল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাজপুরুষদিগের দোষে সেই নিয়ম এদেশে সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় না, ভারত গবর্নমেণ্ট ইংলণ্ডীয় প্রকৃষ্ট নীতিমার্গ পরিহারপূর্বক অর্থলোভে অন্ধ হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট হইতে অতিরিক্ত মাত্রায় কর গ্রহণ করিয়া থাকেন, ব্যয়ের সময়েও স্বেচ্ছাক্রমে নানাবিষয়ে অযথা অর্থক্ষয়ে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি সর্বথা সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। এদেশে রাজধর্ম বহুপ্রকারেই লজ্ঘিত হইয়া থাকে।

অপব্যয়ের কথা স্থানান্তরে আলোচিত হইবে। যে অতিরিক্ত পরিমাণে রাজস্ব গ্রহণের জন্য ভারতীয় কৃষিজীবী প্রজা অর্থবলে অতীব হীন হইয়া পড়িয়াছে, এস্থলে অতি সংক্ষেপে কেবল তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দেখাইয়াছেন, হিন্দু ও মোগল আমলে প্রজার নিকট হইতে যে পরিমাণে ভূমিকর আদায় হইত, এখন প্রজার অসামর্থ্য সত্ত্বেও তদপেক্ষা অধিক আদায় করা হইতেছে। কেবল তাহাই নহে উত্তরোত্তর ভূমি-করের হার এক বঙ্গদেশ ভিন্ন সর্বত্র ক্রমেই বাড়ান হইতেছে। অধিক হারে কর দিতেই লোকে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। পরন্তু খাজনা কবে বাড়িবে, তাহার কোনও স্থিরতা না থাকায় ভূমিব বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। রাম ভাবিতেছে, "এই জমির খাজনা দশ টাকা আছে বাড়িয়া বারো টাকা হইলে আমি আর রাখিতে পারিব না তখন শ্যাম লইবে। তবে আমি কেন মিছামিছি পরিশ্রম করিয়া এ জমির উন্নতি করিয়া মরি।" ইহাতে দেশের জমি দিন দিন অপকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। পক্ষান্তরে গবর্নমেণ্টকে এদেশের কৃষিকার্যের উন্নতিবিধানকল্পে কোনও চেষ্টা করিতে দেখিলে অনেক লোকে ভাবে, দুই-এক বৎসর কোনওপ্রকারে ফসলের সামান্য উন্নতি দেখাইয়া স্থায়িভাবে খাজনা বৃদ্ধি করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ কৃষক সমাজের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি দেখাইতেছেন। এই ভয়ে কৃষকেরা জমির ফসল-বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করিতে সহজে অগ্রসর হয় না। কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে ইহার অপেক্ষা সাংঘাতিক অবস্থা আর কি হইতে পারে?

রমেশবাবু আরও দেখাইয়াছেন যে, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গবর্নমেণ্ট বঙ্গদেশে জমিদারের প্রাপ্য খাজনার উপর শতকরা নব্বই ও উত্তর-ভারত শতকরা আশী টাকা পরিমাণ রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন। মোগলেরাও এই হারে রাজস্বগ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু তাহারা যাহা ধার্য করিতেন তাহা প্রায়ই আদায় করিতেন না। তদ্ভিন্ন প্রজার শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক উন্নতিসাধনে তাঁহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। মহারাষ্ট্রীয় ভূপতিগণও রাজস্ব আদায়কার্যে বিশেষ কঠোরতা প্রকাশ

করিতেন না।* কিন্তু ইংরাজ যে কর চাহিলেন, তাহা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিয়া লইলেন। বঙ্গের শেষ নবাব ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার রাজত্বকালের শেষ বৎসরে প্রজার নিকট হইতে ৮৯,৭৫,৫৩০ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। ইংরাজ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজত্ব পাইয়া কর আদায়ের জন্য যে কঠোর নীতি অবলম্বন করিলেন, তাহাতে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজত্বের পরিমাণ বার্ষিক ২,৬৮,০০,০০০, টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে ইংরাজ এলাহাবাদ ও অন্য কয়েকটি জেলা প্রাপ্ত হন। মুসলমান নবাবের আমলে ঐ কর জেলার ভূমিকর ১,৩৫,২৩,৪৭০ টাকা ধার্য ছিল। নবাবেরা ইহার মধ্যে কত আদায় করিতেন ও কত প্রজাকে ছাড়িয়া দিতেন, তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইংরাজ তিন বৎসরের মধ্যে ঐসকল জেলা হইতে ১,৬৮,২৩,০৬০, টাকা বার্ষিক কর আদায় করিলেন। ইংরাজেরা মান্দ্রাজে সর্বপ্রথমে যে ভূমিকর ধার্য করেন, তাহাতে প্রজাকে কৃষিলব্ধ মোট আয়ের অর্ধাংশ রাজাকে প্রদান করিতে হইত। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। তখন উহার রাজস্বের পরিমাণ ৮০,০০,০০০ টাকা ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংরাজ উহা বাড়াইয়া বার্ষিক ১,৫০,৯০,০০০ টাকা আদায় করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রে তদবধি ক্রমাগত ভূমির খাজনা বাড়িতেছে।

পাঠক মনে করিবেন না, ইংরাজ-শাসনে প্রজার অবস্থার উন্নতি বা কৃষিকার্যের বিস্তার ঘটায় এইরূপ রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল। আদায়কার্যে ইংরাজ কর্মচারীদিগের নির্মমতাই অল্প সময়ে অস্বাভাবিক রাজস্ববৃদ্ধির প্রধান কারণ। বিশপ হিবার সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন,—

No Native Prince demands the rent which we do.

অর্থাৎ দেশীয় কোনও রাজাই প্রজার নিকট আমাদের মত অধিক কর গ্রহণ করেন না।

কর্নেল ব্রিগ্‌স ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন,—

A land tax like that which now exists in India, professing to absorb the whole of the landlord's rent, was never known under any Government in Europe or Asia.

অর্থাৎ এসিয়া বা ইউরোপে কোনও রাজার আমলেই কখনও এরূপ উচ্চহারে

* বিগত ঊনবিংশ অধিবেশনে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ মহাশয়ও এই কথাই বলিয়াছেন,—

The elastic modes (of collection) of the Moghul and the Mahratta have given place to cast iron system worked by a host of highly paid and "promotion-by-result" settlement officers…

ভূমির কর আদায় হয় নাই। এই আদায়কার্যে কিরূপ কঠোরতা অবলম্বিত হইত, সরকারি কাগজপত্রেই তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ঘটে। শস্য ও খাদ্য-দ্রব্যাদি ক্রমশঃ মহার্ঘ হইতে থাকে। কিন্তু রাজপুরুষেরা রাজস্ব-আদায়-কার্যে যথাসম্ভব দক্ষতা প্রকাশ করিলেন। হণ্টার সাহেবের Annals of Rural Bengal নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে,—

The revenues were never so closely collected before.—p. 21.

ইতিপূর্বে এরূপ কঠোরতার সহিত কখনও রাজস্ব আদায়কার্য সম্পন্ন হয় নাই।

পরবর্তী বর্ষে বঙ্গে ঘোর দুর্ভিক্ষপাত হইল। রাজপুরুষেরা বিলাতে কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে, "অসংখ্য লোক অনাহারে মরিতেছে। লোকের কষ্টের কথা বর্ণনা করিতে পারি, ভাষায় এরূপ শব্দ নাই। এক অত্যুর্বর পূর্ণিয়া জেলাতেই কয়েক মাসে এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, ইহাতে রাজস্বের যেরূপ ক্ষতি হইবে বলিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল কার্যক্ষেত্রে সেরূপ হয় নাই!" তাঁহাদের মূল উক্তির শেষাংশ এইরূপ,—

But we are happy to remark the collections have fallen less short than we supposed they would.

১৭৭১ সালেও ইংরাজ প্রজার রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন। এখানকার রাজপুরুষেরা কর্তৃপক্ষকে লিখিলেন,—

Not with standing the great severity of the late famine and the great reduction of the people thereby. some increase has been made in the settlements both of the Bengal and the Behar provinces for the present year.

অর্থাৎ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও লোকনাশ সত্ত্বেও এবার বঙ্গ ও বিহারের রাজস্ব-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় দশ লক্ষ বঙ্গবাসী অনশন যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করে। এই দুর্ঘটনার জন্য কোথায় প্রজার কর লাঘব করিবেন, না পূর্ব পূর্ব বৎসরের অপেক্ষা অধিক খাজনা আদায় করিলেন। হেষ্টিংসের কথায় প্রকাশ,—

The net collections of the year 1771 exceeded even those of 1768,

ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রতি বৎসর নূতন বন্দোবস্ত করিয়া ভূমির রাজস্ববর্ধনের চেষ্টার বঙ্গবাসী কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস পাঠকের

অবিদিত নহে। সৌভাগ্যক্রমে লর্ড কর্নওয়ালিস বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত করায় বঙ্গবাসী অশেষ অত্যাচারের দায় হইতে অব্যাহতিলাভ করিলেন।*

ইংরাজ শাসকের হস্তগত হওয়ায় অযোধ্যা অঞ্চলের যেরূপ অবস্থান্তর হইয়াছিল, তাহা কাপ্তেন এডোয়ার্ডসের উক্তি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দৌলার শাসনকালে কাপ্তেন সাহেব অযোধ্যা কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলেন। পরবর্তী বর্ষে নবাবের মৃত্যু হইলে, ইংরাজ অযোধ্যাপ্রদেশে লব্ধ-প্রবেশ হন। তদবধি ঐ অঞ্চলের সমস্ত সম্পদ অপহৃত হইতে থাকে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন এডোয়ার্ডস গিয়া দেখেন, অযোধ্যা প্রদেশ—

"Forlorn and Desolate"

নিরাশ্রয় ও জনশূন্য হইয়াছে। এই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস অযোধ্যার বেগমদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়া যেরূপে তাঁহাদিগের ধন হরণ করিয়াছিলেন, খাজনা দিতে না পারিলে প্রজাদিগকে যেরূপে পিঞ্জারাবদ্ধ করিয়া প্রখর রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইত, অত্যাচারের ভয়ে কৃষকেরা যেরূপে আপনাদিগের শিশু পুত্র-কন্যা পর্যন্ত বিক্রয়পূর্বক খাজনা শোধ করিতে বাধ্য হইত, উপায়ান্তরের অভাবে দেশত্যাগী হইতে চাহিলে সেনাবলের সাহায্যে যেরূপে হতভাগ্যদিগের গতিরোধ করা হইত, এবং পরিশেষে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, তাহাদিগের দমনের জন্য যেরূপ লোমহর্ষণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাসপাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন।

এই সময়ে বারাণসী অঞ্চলের কৃষিবাণিজ্যও ইংরাজ কর্মচারীদিগের অত্যাচারে শোচনীয় অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজ প্রথমেই ভূমি-করের হার অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, তাহার পর আদায়ের সময়েও তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ কঠোরতা অবলম্বনে পশ্চাৎপদ হন নাই।

কাজেই নয় বৎসরের মধ্যে দেশের অধিকাংশ স্থানই মরুভূমিবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। এই অত্যাচারে ১৭৮৩ সালে বারাণসী অঞ্চলে ঘোর দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়।

কর্ণাটে কোম্পানির কর্মচারীরা যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। Mr. petric নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী ১৭৮২

* বঙ্গের সর্বত্র এখনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই। বঙ্গের অস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন ভূমি হইতে গত ১৯০০ সালে ৩৪,২৩,২৬৭ টাকা ও গবর্নমেণ্টের খাস বে-বন্দোবস্তী মহাল হইতে ৪১,০৪,৭৫৩ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছিল।

খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গুপ্ত সমিতির (Committee of secrecy) সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে তাঞ্জোরের সমৃদ্ধিশালীতার সবিস্তার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

It will be necessary to inform the Committee that not many years ago (in 1786) that province was considered as one of the most flourishing, best cultivated, populous districts in Hindustan.

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে যে প্রদেশকে সাক্ষী মহাশয় ভারতবর্ষের একটি সমৃদ্ধতম, বহুজনপূর্ণ ও শস্য-শ্যামল প্রদেশ দেখিয়াছিলেন, ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাহার দুরবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পশ্চাল্লিখিত উক্তি হইতে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি বলিয়াছেন,—

It's decline has been so rapid, that in many districts it would be difficult to trace the remains of its former opulence.

এই অল্প দিনের মধ্যে এরূপ খরবেগে এই প্রদেশের অবনতি ঘটিয়াছে যে, এখন ইহার অধিকাংশ স্থানে পূর্ব সম্পদের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই।

ইংরাজের অর্থলোলুপতায় কেবল তাঞ্জোরেরই এইরূপ দুরবস্থা হয় নাই। নবাব মহম্মদ আলির অর্থ-হরণ ব্যাপারে আর্কটের কৃষককুলের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। ইংরাজকে অর্থদান করিতে করিতে, দুর্বল নবাবের ধনাগার নিঃশেষ হইয়া গেল, অথচ ইংরাজের ক্ষুধা মিটিল না, তখন তিনি কৃষককুলের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিতে বাধ্য হইলেন।

ইংরাজ কর্মচারীরা প্রজার করবৃদ্ধি করিয়া নিদয়ভাবে কৃষকের রুধির শোষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রকৃত প্রাপ্য ১,৩৪,৬৭,৯৬০ টাকা ছিল। কিন্তু তাঁহারা ২০,৩৯,০৫,৭০০ টাকার দাবী করিয়া বহুদিন পর্যন্ত প্রজার ধন লুণ্ঠন করিতেছিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, এই সকল অত্যাচারই তাহার মূল কারণ। লর্ড ওয়েলেসলি মহোদয়ের চেষ্টায় এই প্রতারণা ধরা পড়ে। তখন কর্ণাটকবাসী প্রজা অত্যাচারের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

এখন একবার বোম্বাইয়ের রাজস্বের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করুন। বলিয়াছি, মহারাষ্ট্র ভূপতিদিগের শাসনকালে ঐদেশে প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট হইতে ৮০,০০,০০০, টাকা রাজস্ব আদায় হইত। যে বৎসর ইংরাজ ঐ দেশের আধিপত্য লাভ করেন, তৎপরবর্তী বর্ষেই ১,১৫,০০,০০০, টাকা রাজস্ব আদায় করিলেন! ফলে প্রজার

উপর কিরূপ অত্যাচার হইতে লাগিল, সরকারি রিপোর্টে তাহার এইরূপ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে,—

Every effort was made,—lawful and unlawful,—to get the utmost out of the wretched peasantry, who were subjected to tortures—in some instances cruel and revolting beyond description—if they could not or would not yield what was demanded. Numbers abandoned their homes and fied into neighbouring Native States, large tracts of land were chrown out of cultivation and in some districts no more than one third of the cultured ares remained in occupation.

ভাবার্থ এই যে, হতভাগ্য কৃষকদিগের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য বিধিসঙ্গত ও বিধি-বিগর্হিত সর্ববিধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। পীড়নে স্থলবিশেষে দুঃসহ ও বর্ণনাতীত অত্যাচারে জর্জরিত করিয়া দরিদ্র কৃষক-কুলের নিকট হইতে অভিলষিত অর্থসংগ্রহের চেষ্টারও ত্রুটী হয় নাই। এইরূপ নিদারুণ নির্যাতনে প্রপীড়িত হইয়া শত শত কৃষক গৃহত্যাগপুরঃসর সন্নিহিত দেশীয় রাজ্যসমূহে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডসমূহ কৃষিকার্যের অভাবে পতিত থাকে, কোন কোন জেলার সমষ্টি কর্ষিত ভূমির এক-তৃতীয়াংশের অধিক জমিতে চাষ-আবাদ হয় নাই।

এইরূপে রাজধর্মের অবমাননা ও প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছিল, তাহার অতি অল্পাংশই এদেশে ব্যয় করা হইত অধিকাংশ টাকাই বিলাতে প্রেরিত হইত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অংশীগণ কর্মচারিগণ ও বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভার মাননীয় সদস্যগণ এই ভারত-লুণ্ঠনের অর্থে আপনাদিগের দারিদ্র্য দূর করিয়াছিলেন। কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইত, তাহা কোম্পানি গ্রহণ করিতেন, এদেশের ধনী-সন্তানদিগের ও রাজা মহারাজদিগের নিকট হইতে অবৈধভাবে যাহা আদায় হইত, তাহা শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদিগের অর্থকষ্ট দূর করিত। এক বঙ্গদেশ হইতেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অন্যূন ৪,৯৪,০৪,৯৮০ টাকা কেবল উৎকোচ স্বরূপ আদায় করা হইয়াছিল। পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে যাহাতে অপ্রিয় আলোচনা উপস্থিত না হয়, সেজন্য কোম্পানি ও তৎ-কর্মচারীরা মহাসভার সদস্যদিগকে উৎকোচদানে বশীভূত করিতেন। অনেক সময় আবার উৎকোচের অর্থ সংগ্রহের জন্যই ভারতবাসী প্রজাকে লুণ্ঠন করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত। তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বরও এই নিন্দনীয় উৎকোচ-গ্রহণ-

ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিলেন না। একবার কোম্পানির কার্যকলাপের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হওয়ায় স্বয়ং ইংলণ্ডপতি সকল গোলযোগ মিটাইয়া দেন*। সুসভ্য ইংরাজ জাতির নৈতিক উন্নতির ইতিহাসে এ সকল ঘটনার মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে।

গজনীর মামুদ, নাদির শাহ, আহম্মদ শাহ আবদালী বা নাগপুরের বর্গীরা ভারতের ধনী-সন্তানদিগকে লুণ্ঠন করিয়া কত টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থেও সময়ে সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কোম্পানীর আমলে ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কত টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার হিসাব সহজে পাওয়া যায় না।

মিঃ ডিগ্‌বী বলেন, পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ৫০,০০,০০,০০০ হইতে ১০০,০০,০০,০০০ পাউণ্ড ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। মিঃ ব্রুকস এডাম্‌স Law of Civilisation and Decay নামক গ্রন্থে ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

Possibly, since the world began, no investment has ever yielded the profit reaped from the Indian *plunder*.

সে যাহা হউক, দীর্ঘকাল পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষেরা এদেশের কৃষিশিল্পজীবী-দিগকে যেরূপ নির্মমভাবে লুণ্ঠন করিয়াছিলেন তাহাতেই ভারতবাসীর অধিকাংশ সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়,—অতিরিক্ত কর দিয়া কৃষকেরা নিঃস্ব হইয়া পড়ে, শিল্পিগণ বাণিজ্য সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া অর্থহীন হওয়ায় কৃষিকর্ম অবলম্বনে বাধ্য হয়। ইংরাজ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ে দারিদ্র্য-রাক্ষস কিরূপে স্থায়ী আধিপত্যলাভ করে, তাহা বুঝিতে হইলে, রাজস্ব-বৃদ্ধির এই ইতিহাস অবশ্য জ্ঞাতব্য।

বৃটিশসিংহ যখনই কোনও প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছেন, তখনই সেই প্রদেশের

---

* Nor was the Company in good repute at home. An enquiry was set on foot, and it was found that the Company had devoted in one year £ 100,000 to *bribery*. But the House of Commons stifled inquiry. *The recipients of bribes were amongst the highest, and the King himself was seen to have accepted a large sum.*

In the meantime, and largely by the *diplomacy of abascment*, the Company throve. ...The home Government wanted money. Some at home, anxious to get the concern into their hands for a price; *offered a bribe to the Government.* The Company stayed off difficulty by offering *a larger bribe*. They advanced 200,000 and so secured an extension of the charter to the year 1766. *British India and England's responsibilities* by G. Clarke. M. A. pp. 7-9).

কৃষকদিগের শোণিত এরূপ অপরিমিতভাবে পান করিয়াছেন যে, হতভাগ্যগণ একেবারে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ঘোরতর কলঙ্কের বিষয় হইলেও ঐতিহাসিক সত্য। তাহার পর অবশ্য প্রথম আক্রমণের কঠোরতা স্থানে স্থানে লাঘব হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রজাগণের প্রনষ্ট শক্তি কতদূর পুনরাগত হইয়াছে, প্রজা একগুণ দিয়া সহস্র গুণ পাইয়াছে কি না, ভারতে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টের সংঘটনেই তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে।

ইংরাজ-শাসনের আরম্ভকালে এদেশীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের শোণিত-শোষণ কিরূপ-ভাবে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্যাপি ভারতের অধিকাংশ স্থলে সে শোষণ সম্যক্ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে ৮০,০০,০০০ টাকা ভূমি-কর আদায় হইত, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ তাহার পরিমাণ বর্ধিত করিয়া ১,৫০,০০,০০০ টাকা করেন, পাঠক একথা অবগত হইয়াছেন। ইহার পর কোম্পানির যথেচ্ছাচার দূরীভূত করিবার জন্য দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার আমলে শাসন-বিভাগে নানা বিষয়ে সংস্কার ঘটিল, কিন্তু কৃষিজীবী প্রজার দুর্দৈব ঘুচিল না। কোম্পানির আমলে যে প্রজারা ১,৫০,০০,০০০ টাকা কর দিতে বাধ্য হইত, পরলোকগতা মহারাণীর আমলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে ২,০৩,০০০,০০ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতে হইল! কিন্তু এইখানেই রাজপুরুষদিগের অর্থলোভের শেষ হয় নাই। আশী লক্ষ টাকার স্থানে দুই কোটী তিন লক্ষ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াও তাঁহারা রাজস্ব-বৃদ্ধির কার্য অব্যাহত রাখিলেন। কাজেই কৃষককুল আর সহ্য করিতে না পারিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নানা স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও শান্তিভঙ্গ হওয়ায় রাজপুরুষেরা কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন এই বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন বসিল। তদন্তে স্থির হইল, পুনঃ পুনঃ ভূমির বন্দোবস্ত দ্বারা অতিরিক্ত রাজস্ব-বৃদ্ধিই (**Extravagantly heavy assessments**) এই বিভ্রাটের প্রধান কারণ।

এত গোলযোগ সত্ত্বেও রাজপুরুষদিগের অর্থগৃধ্নুতার হ্রাস হয় নাই। ত্রিশ বৎসরের বন্দোবস্তে যে সকল ভূমির রাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হওয়ায় আবার কর্তৃপক্ষ নূতন বন্দোবস্তের আদেশ করিয়াছেন। গত ১৮৯৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ২৭,৭৮১ খানি গ্রামের মধ্যে ১৩,৩৬৯ খানি গ্রামের নূতন বন্দোবস্তের কার্য শেষ হইয়াছে। এই গ্রামগুলি হইতে পূর্বে ১,৪৪,০০,০০০ টাকা আদায় হইত, নূতন বন্দোবস্তে ১,৮৮,০০,০০০ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশিষ্ট গ্রামসমূহের মধ্যে কতকগুলির জরীপ-কার্য

বিগত দুর্ভিক্ষের জন্য কিছুদিন বন্ধ ছিল। তথাপি ৭৮ খানি গ্রামের নূতন বন্দোবস্ত করিয়া ১,০৩,৫৩০ টাকার স্থলে ১,৩৩,৫১০ টাকা রাজস্ব নির্ধারিত করা হইয়াছে। ফলতঃ এই সকল নূতন বন্দোবস্তে মোটের উপর শতকরা ৩০ টাকা হারে ভূমির কর বাড়িয়া গিয়াছে। এদিকে ডিরেক্টার অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস অ্যাণ্ড এগ্রিকালচার বা ভূমি ও কৃষিবিভাগীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের ১৮৮৭ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে, বোম্বাই অঞ্চলে—

Seventy-five per cent of the cultivated area is under food grains. The reporting authorities agree that there is a *large number* of cultivators who *do not get a full year's supply* from their land.

ভাবার্থ—আবাদী জমির বার আনা অংশে খাদ্যোপযোগী শস্যের চাষ হয়। কিন্তু সকল রাজপুরুষেরাই ঐকমত্য প্রকাশপূর্বক বলেন যে, বহুসংখ্যক কৃষকই চাষ করিয়া সংবৎসরের ব্যয়োপযোগী শস্য সংগ্রহ করিতে পারে না।

অধ্যক্ষ মহাশয়ের এই প্রকার মন্তব্য-প্রকাশের পরও ভূমির খাজনা বাড়িয়াছে। সুতরাং দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা না বৃদ্ধি পাইয়া আর কি হইতে পারে? এই প্রসঙ্গে দেশের কৃষিবলের অবস্থার কথাও বিবেচ্য। ১৮৯৪ সালে সমগ্র বোম্বাই প্রদেশে ৮০,৮০,০০০ কৃষিযোগ্য গো-মহিষাদি পশু ছিল। ১৯০১ সালের গণনায় প্রকাশ পায় যে, উহাদিগের সংখ্যা কমিয়া ৫২,৭৭,০০০ হইয়াছে। অর্থাৎ ছয় বৎসরে এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক গো-মহিষাদি পশু কমিয়া গিয়াছে। কৃষিযোগ্য ও কর্ষিত ভূমির তুলনায় কৃষিবলের সংখ্যাও অতি সামান্য। বোম্বাই অঞ্চলে গড়ে এক হাল গো-মহিষকে ষাট বিঘা ভূমি কর্ষণ করিতে হয়। কৃষক-সমাজের পক্ষে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে?

মাদ্রাজের কৃষক-সম্প্রদায়ের অবস্থার উল্লেখ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ইংলিশ ম্যান পত্রের সম্পাদক ১৮৮০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিয়াছিলেন,—কোম্পানির আমলে মাদ্রাজ অঞ্চলে ভূমির যে কর আদায় হইত মহারাণীর আমলে তদপেক্ষা দশ লক্ষাধিক মুদ্রা বা এক-তৃতীয়াংশ অধিক রাজস্ব আদায় হইতেছে। অথচ কৃষক-সম্প্রদায়ের সুখ-সমৃদ্ধি-বিধানের কোনও ব্যবস্থাই হইতেছে না। বরং রাজস্ব-বৃদ্ধির সহিত মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভার সিবিলিয়ান সদস্য মিঃ জি. রোজাস ১৮৯৩ সালে ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারী মহাশয়কে মাদ্রাজের রাজস্ব আদায় বিষয়ক অত্যাচারের বিষয় জ্ঞাপনকালে দেখাইয়াছিলেন যে ১৮৭৯—৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে

১৮৮৯—৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এগার বৎসরের মধ্যে খাজনা আদায় করিবার জন্য মাদ্রাজের রাজপুরুষেরা ৮,৪০,৭১৩ জন প্রজার ১৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৬৪ বিঘা জমির "দখলি" স্বত্ব প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদিগের তৃপ্তি হয় নাই। প্রজারা জমির দখল ছাড়িয়াই অব্যাহতি লাভ করে নাই। তাহাদিগকে খাজনার দায়ে আপনাদিগের ঘটী বাটী বিছানাপত্র পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া ২৯,৬৫,০৮১ টাকা গবর্নমেণ্টকে দান করিতে হইয়াছে। উপরিলিখিত প্রায় ১৯,৭৩,৩৬৪ বিঘা জমির মধ্যে ক্রেতার অভাবে প্রায় ১১.৭৫ লক্ষ বিঘা জমি গবর্নমেণ্টকে ক্রয় করিতে হইয়াছিল। খাজনার হার অতিরিক্ত না হইলে নিশ্চিত ঐ সকল জমির ক্রেতা জুটিত। ভূমি-রাজস্বের আধিক্য সম্বন্ধে এতদপেক্ষা স্পষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

মধ্যভারতের অবস্থা সম্বন্ধে গত বৎসর মাননীয় শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বসু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন যে, ঐ অঞ্চলের কোনও কোনও জেলায় বিগত দশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ১০২ ও ১০৫ হারে প্রজার রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইয়াছে! এই দশ বৎসরের মধ্যে দুর্ভিক্ষাদিতে প্রজারা নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছে, তথাপি কর্তৃপক্ষ খাজনা বাড়াইতে নিরস্ত হন নাই। বলা বাহুল্য, গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে এই অভিযোগের অদ্যাপি কোনও প্রতিবাদ হয় নাই।

বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভাঙ্গিবার প্রস্তাবও রাজপুরুষেরা উত্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু গোলযোগের ভয়ে তাঁহাদিগকে সে বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। তথাপি তাঁহারা অপ্রত্যক্ষভাবে বঙ্গদেশীয় প্রজার কর-বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। পথকর, চৌকিদারী-কর ও পূর্তকর প্রভৃতি অভিনব করগুলিই এ বিষয়ের নিদর্শনস্বরূপ, শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ মহাশয় বিগত অধিবেশনে জাতীয় মহাসমিতির সমক্ষে এই কথা বলিয়াছিলেন।

কর্ণাটকীয় প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে ভূমি ও কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয় বলেন যে—

Despite its liability to famine it pays a higher land revenue than the Deccan or Concan.

অর্থাৎ দুর্ভিক্ষাদির অধিকতর সম্ভাবনাসত্ত্বেও এখানকার কৃষকদিগকে দক্ষিণাপথের বা কোঙ্কণের কৃষিজীবীদিগের অপেক্ষা অধিক ভূমিকর দান করিতে হয়।

কেবল দক্ষিণ ও মধ্য-ভারতই নহে এক বঙ্গদেশ ভিন্ন বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই কুড়ি বৎসর ত্রিশ বৎসর অন্তর কৃষকদিগের দেয় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে প্রজাকুলের কষ্ট দিন দিন কিরূপ বাড়িতেছে, তাহা সহজেই

অনুমেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্নমেণ্ট প্রজার কোন কষ্টই দেখিতে পাইতেছেন না। বরং প্রকৃতিপুঞ্জের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে—প্রকাশ্যভাবে এইরূপ মত ব্যক্ত করিতেও কর্তৃপক্ষ সঙ্কুচিত নহেন। পক্ষান্তরে সরকারি কাগজপত্রেই আমরা কৃষক-সমাজের অন্যরূপ চিত্র দেখিতে পাই।

পঞ্জাবের ভূতপূর্ব কমিশনার মিঃ এস. এস. থরবরন এদেশে প্রায় বত্রিশ বৎসর-কাল রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেশবাসীর অবস্থা বহু পরিমাণে বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন। তিনি ১৮৯৬ সালে কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করেন যে, পঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানের কৃষিজীবীদিগের প্রায় অর্ধাংশ হয় সর্বস্বান্ত, না হয় গভীর ঋণপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। তিনি পরীক্ষার জন্য পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ৪৭৪ খানি গ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদন্ত করিয়া তিনি বলেন, এই সকল গ্রামের মধ্যে ২৯৭ খানি গ্রামের অবস্থা পূর্ব সেটেলমেণ্টের আমলে বা ১৮৭১ সালের পূর্বে সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু নূতন সেটেলমেণ্টে রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়ায় অনেক কৃষকের অবস্থাই অতীব শোচনীয় হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, পঞ্জাব অধিকৃত হইবার পরই গবর্নমেণ্ট একেবারে রাজস্বের হার বৃদ্ধি করেন। তন্মধ্যে গুরগাঁও জেলায় প্রথমে অজ্ঞতাবশেই এইরূপ রাজস্ব বর্ধিত হয় (At first ignorantly-assessed by us)। সে যাহা হউক, তাঁহার পরীক্ষাধীন গ্রামসমূহের মধ্যে বারোখানি গ্রামে ৭৪২টি পঞ্জাবী পরিবারের মধ্যে ৫৬৬টি পরিবার ১৮৭১ সালের পর সর্বস্বান্ত হইয়াছে। অন্য চারিটি পরীক্ষার্থ নির্বাচিত বিভাগে (Selected circles) ১২৬টি গ্রামের অর্ধেক কৃষক এরূপ গভীর ঋণপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে যে, তাহাদিগের আর উদ্ধারের আশা নাই।

থরবরন মহোদয় বলেন, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা (Fixity of land revenue)। এই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। প্রথমতঃ উচ্চহারে কর নির্ধারণ ও দ্বিতীয়তঃ আদায়কালে নির্মমতা এই দুই কারণে যে কৃষকদিগকে মহাজনের আশ্রয় লইতে হয়, তাহার কথায় এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি গবর্নমেণ্টকে আদায়কার্যে কঠোরতা ত্যাগ করিতে ও মহাজনদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য জমি হস্তান্তর করিবার পথ সঙ্কীর্ণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গবনমেণ্ট তাঁহার প্রথম অনুরোধ বা আদায়কার্যের কঠোরতা লাঘব (elasticity in collection) করিতে সম্মত হইলেন না কেবল Land Alienation Act নামক আইন পাস করিয়া (তাহাও বহু সহস্র কৃষকের সর্বস্বান্ত হইবার পর) মহাজনদিগের দমন করিলেন। মিঃ থরবরন স্বীয় রিপোর্টের একস্থলে বলিয়াছেন—

In India a handful of foreigners rules the tens of millions and through action of these foreigners the peasant masses

are now largely dependents of money-lenders, their former servants.

It is idle to say that Zammdars are thrifiless, quarrelsome on extravagant and have themselves to blame for their indebtedness. The evidence in this inquiry brings home none of these charges, except, to some small extent, thriftlessness and even if all of them were deserved, we have to deal with human nature as it is, and the obligation would still lie on the Government so as to adjust its land revenue system as to obviate all reason for unnecessary borrowing from userers ..... Before our time in the Punjab the village lender was, and in the other countries named he is still, a dependent servant of the rural community, and never what our system is making him in the Punjab villages—that community's master.......

Prices-current, rain statistics and the Revenue Reports of districts show that fodder and grain scarcities are of frequent recurrence and the village note-books and revenue statistics generally prove that suspensions are rare and remissions stillrarer .....In fact for the whole district (Sialkot) the revenue of which is now fifteen lakhs. I make out that in the last 30 years only Rs. 6,450 have been suspended, and Rs, 1,694 remitted all on account of damage done by hail. In that period there have been several prolonged fodder famines and quite a dozen poor harvests.

ভারতবর্ষের মুষ্টিমেয় বৈদেশিকগণ কোটী কোটী লোকের শাসন করিতেছে। এই বৈদেশিকদিগের কার্যদোষেই কৃষিজীবিগণকে অত্যধিক পরিমাণে উত্তমর্ণদিগের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। ভূস্বামী কৃষকগণ অমিতব্যয়ী ও কলহপ্রিয়; সুতরাং তাহাদের নিজের দোষেই তাহারা ঋণগ্রস্ত হইতেছে, একথা বলা অসঙ্গত। কারণ অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, যে অত্যল্প মাত্রায় অমিতব্যয়িতা ভিন্ন উক্ত দোষ-নিচয়ের কোনটিরই অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যায় না। কিন্তু যদি তর্কস্থলে ঐ সকল দোষের কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও মানব-স্বভাবের বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্তৃপক্ষকে কার্য করিতে হইবে। ফলতঃ এরূপ ক্ষেত্রে ভূমিকর সম্বন্ধে গবর্নমেন্ট এ প্রকার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য যে, তাহাতে উত্তমর্ণের নিকট হতে অনাবশ্যক ঋণগ্রহণের প্রয়োজন কৃষকেরা কখনই অনুভব করিবে না। আমাদের

শাসন-প্রবর্তিত হইবার পূর্বে পঞ্জাবে গ্রাম্য ঋণদাতারা কৃষককুলের আশ্রিত ভৃত্যবৎ ছিল, কুরম উপত্যকায় ও সোয়াত প্রভৃতি প্রদেশে এখনও মহাজনেরা কৃষকদিগের অনুগত রহিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের শাসনপ্রণালীর ফলে পঞ্জাবের পল্লীগ্রাম-সমূহে তাহাদিগকে যেমন কৃষক-সম্প্রদায়ের প্রভু করিয়া তুলিয়াছে, তেমন পূর্বে কখনই ছিল না। ......ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ ও রাজস্ব বিষয়ক রিপোর্ট পাঠ করিলে জানা যায় যে, তৃণ ও শস্যের দুর্ভিক্ষ এই সকল অঞ্চলে উপর্যুপরি হইতেছে; অথচ ভিলেজ-নোটবুক ও রাজস্ব তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, দুঃসময়ে কিছুকালের জন্য করসংগ্রহ স্থগিত প্রথা অতি বিরল এবং দুস্থ প্রজাদিগকে একেবারে খাজনা ছাড়িয়া দিবার রীতি আরও অধিক বিরল। উদাহরণ স্বরূপ শিয়ালকোট জেলার উল্লেখ করিতেছি। এই জেলার বার্ষিক আয় ১৫ লক্ষ টাকা কিন্তু বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তথায় মোট ১৬৯৪ টাকা খাজনা রেহাই হইয়াছে এবং ৬৪৫০ টাকা প্রজাদিগের নিকট হইতে নিরূপিত সময়ের কিছু দিন পরে আদায় করা হইয়াছে। অথচ ঐ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অনেকবার দেশে দীর্ঘ কালস্থায়ী তৃণাভাব ও অন্যূন ১২ বার অতি সামান্য চাষ আবাদ হইয়াছিল।

বঙ্কিমবাবু অদ্য জীবিত থাকিলে বলিতেন,—"বত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল-স্বরূপ যে সারগর্ভ উক্তি সিবিলিয়ান থরবরনের লেখনী-মুখে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা সিমলার প্রাসাদ-গাত্রে বিশদভাবে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত।" ফল কথা, ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের দুর্দশার প্রকৃত কারণাবলী এরূপ স্পষ্ট ভাষায় অতি অল্পসংখ্যক রাজপুরুষই প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন। গবর্নমেণ্টের নিকটও এরূপ স্পষ্টবাদিতার পুরস্কার নাই।

"অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।"

গবর্নমেণ্ট এইসকল অপ্রিয় কথা শুনিতে ভাল বাসেন না। কাজেই অল্পদিন পরে কর্তৃপক্ষের সীমান্ত-নীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলিতে গিয়া থরবরন মহোদয়কে পদত্যাগ করিতে হয়। থরবরনের ন্যায় অন্যান্য স্পষ্টবাদী কর্মচারীদিগকেও কর্তৃপক্ষের নিকট সামান্য লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই। মাননীয় মিঃ স্মিটন বাহাদুর ব্রহ্মদেশের রাজস্ব বিভাগী কমিশনর ছিলেন। ১৯০০-০১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে আলোচনাকালে বড়লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপকসভায় তিনি বলিয়াছিলেন, "গত পূর্ব বৎসরের দুর্ভিক্ষের ফলাফলের বিষয় চিন্তা করিলে বিগত বর্ষে বোম্বাই মাদ্রাজ ও পঞ্জাব প্রদেশের কৃষিজীবীদিগের নিকট হইতে যে, ৬০ লক্ষ টাকা অধিক রাজস্ব আদায় করা হইয়াছে, তাহা ভাল হয় নাই।" সেই প্রসঙ্গে তিনি ইহাও বলেন যে, গবর্নমেণ্টের রাজস্বনীতির দোষেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ এদেশে

দিন দিন তীব্রতর হইতেছে। এই স্পষ্টোক্তির জন্য স্মিটন বাহাদুরের পদোন্নতির পথ নিরুদ্ধ হইল। সকলেই আশা করিয়াছিল তাঁহাকে শীঘ্রই ব্রহ্মদেশের ছোটলাটের পদে নিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। তিনি হতাশ চিত্তে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। আসামের ভূতপূর্ব চীফ্ কমিশনর কটন বাহাদুরও হতভাগ্য কুলিদিগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির অপরাধে বঙ্গের ছোটলাট পদে সমাসীন হইতে পারিলেন না, একথা বোধ হয়, অনেকেই অবগত আছেন।

পঞ্জাবী কৃষকদিগের অর্দ্ধাংশ যে উত্তরোত্তর বর্ধমান রাজস্বের দায়ে ঋণজালে জড়িত ও উৎপন্ন হইয়াছে, থরবরনের কথায় ইহা সুস্পষ্ট বোধগম্য হয়। গুরগাঁও জেলার তদানীন্তন ডেপুটী-কমিশনার মিঃ জে. আর. ম্যাকোনকি তত্রত্য কৃষি-জীবীদিগের অবস্থার সংক্ষেপে বর্ণনাকালে পশ্চাল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—

In fair seasons there is no actual want of food, but the standard of living is perilously low......It is obvious that the supreme object in life for them is how to keep body and soal together, and the struggle is an arduous one.

সুবৎসরে ইহাদিগের প্রকৃত খাদ্যাভাব ঘটে না বটে, কিন্তু ইহাদিগের জীবন-যাত্রার আদর্শ অতীব শোচনীয়। কোনও প্রকারে দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারিলেই ইহারা আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করে। এবং কেবল প্রাণধারণোপযোগী অন্ন সংগ্রহের জন্য ইহাদিগের অতি কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়।

পঞ্জাবের অধিকাংশ জেলার অবস্থাই যে অতীব শোচনীয়, তাহা "Economic Inquiry of the Punjab in 1888" নামক সরকারী রিপোর্ট পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের পর যে পঞ্জাবের অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই, তাহা থরবরন মহোদয়ের ১৮৯৬ সালের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে।

অযোধ্যা প্রদেশের অধিবাসীদিগের অবস্থা পঞ্জাবের অপেক্ষা কোনও অংশে ভাল নহে। Oubh Gazeteer-এর প্রথম খণ্ডের ৫১৫ পৃষ্ঠায় ঐ প্রদেশের ভূতপূর্ব কমিশনার Mr. W. C. Bennett মহোদয়ের নিম্নলিখিত উক্তি পরিদৃষ্ট হয়।

It is not till he has gone into these subjects in detail that a man can fully appreciate how terribly thin the line is which divides large masses of people from nakedness and starvation.

ভাবার্থ এই যে, বিস্তারিত রূপে এই সকল বিষয়ের আলোচনা না করিলে এই

এই প্রদেশের অধিকাংশ লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব কিরূপ ভীষণ, তাহা কাহারও বোধগম্য হইবে না।

ফয়জাবাদ বিভাগের তদানীন্তন অস্থায়ী কমিশনার মিঃ হ্যারিংটন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের পত্রে বেনেট মহোদয়ের পূর্বোক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া ভূমি ও কৃষিবিভাগীয় ডিরেক্টর বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন,—

I believe that this remark is true of every district in Oudh.

আমার বিশ্বাস, এই মন্তব্যটি অযোধ্যা প্রদেশের প্রত্যেক জেলার সম্বন্ধেই খাটে।

ঐ পত্রের স্থানান্তরে তিনি আরও লিখিয়াছেন,—

My own belief, after a good deal of study of the closely connected question of agricultural indebnedness, is that the impression ("that the greater proportion of the people of India suller from a daily insufficiency of food") is perfectly true as regards a varying, but always considerable, part of the year in the greater part of India

ভাবার্থ—কৃষকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া আমার নিজের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ভারতের অধিকাংশ লোকেই বৎসরের অধিকাংশ সময় প্রত্যহ পর্যাপ্ত আহারের অভাবে কষ্ট পাইতেছে।

অযোধ্যা প্রদেশের ভূমির উর্বরতা-হ্রাস সম্বন্ধে রায়বেরেলীর ডেপুটী কমিশনার মিঃ আরউইন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের সুদীর্ঘ রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, ত্রিশ বৎসর পূর্বে, এমন কি ২০ বৎসর পূর্বেও এই দেশের ভূমিতে যে পরিমাণে গোধূম ও রবিশস্য উৎপন্ন হইত, এখন তদপেক্ষা অনেক কম উৎপন্ন হইতেছে। কারণ, লোকে পূর্বের ন্যায় আর জমিতে সার দিতে পারে না। কৃষীবলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সম্ভবতঃ উহাদের সংখ্যা-হ্রাসও হইয়াছে। কৃষকদিগের মধ্যে প্রায় শতকরা ৭৫ জনের গৃহে লেপ, বা কম্বল নাই—কেবল একখানি "দোহারের" সাহায্যে তাহারা সমগ্র শীতকাল যাপন করে।* এই প্রায়োপবাস এখন বহুলাংশে লোকের অভ্যাসের

* অযোধ্যা প্রদেশের রাজস্ব-রিপোর্টের নিম্নলিখিত অংশে প্রণিধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে, রাজকোষে অর্থাভাব উপস্থিত হইলেই রাজপুরুষেরা দরিদ্র কৃষকের খাজনা বাড়াইতে অগ্রসর হন।

In some distrlcts, notably Fyzabad, Gonda, Kheri and parts of Sultanpur, at a time of supposed financial pressure the revision of the assessment was hurried on, a greatly enhanced demand was imposed.—*Report of* 1872-73.

ইহা অবশ্য ত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা। কিন্তু দরিদ্র প্রজার বর্তমান দুরবস্থার সহিত এই পূর্ব ঘটনার কি কোনই সম্বন্ধ নাই? মাননীয় মিঃ স্মিটনের উক্তি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে বর্তমানকালেও রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য এইরূপ অবৈধ চেষ্টা হইয়া থাকে বলিয়া কি মনে হয় না?

মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। এই জেলায় **Hunger is very much a matter of habit!**

অতঃপর উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কৃষকদিগের অবস্থা কিরূপ, দেখা যাউক। লর্ড ডফরিনের আমলে ভারতীয় কৃষিজীবীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে গোপনীয় অনুসন্ধান হইয়াছিল একথা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ হণ্টার ও স্যার চার্লস ইলিয়ট মহোদয় দ্বয়ের মন্তব্য (১৪ পৃঃ) এবং জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনই এই তদন্তের প্রধান কারণ। ঐ তদন্ত-সংক্রান্ত বিবরণীর কয়েক খণ্ডমাত্র বহু চেষ্টার পর মিঃ ডিগ্‌বীর নেত্রগোচর হয়। তিনি স্বীয় গ্রন্থে সেই রিপোর্ট হইতে রাজপুরুষ-দিগের বিবিধ মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তদীয় গ্রন্থের সাহায্যে ঐ রিপোর্টের আভাস পাঠকবর্গের গোচর করা যাইতেছে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত ইটা জেলায় তদানীন্তন কলেক্টার ক্রুক সাহেব স্বীয় রিপোর্টে লিখিয়াছেন, "বহুসংখ্যক বিজ্ঞলোকের সাহায্যে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, যে কৃষকের ১৬.৫০ বিঘা (ইটার বিঘায় ১০ বিঘা) জমি, এক হাল গরু ও জমিতে জলসেচনের যোগ্য কূপ আছে, তাহার বার্ষিক আয় হৈমন্তিক শস্যে ১২৯.৫০ টাকা ও রবি শস্যে ৮৪.৫০ টাকা। এই মোট ২১৪ টাকার মধ্যে সরকারি খাজনায় ৭৫ টাকা, বীজ-সংগ্রহে ১৩.৫০ টাকা, চাষের অন্যান্য ব্যয়ে ৭৯.৬২ বাদ গিয়া ৫৪.৮৭ কৃষকের লভ্যাংশ থাকে। এই পঁয়তাল্লিশ টাকা চৌদ্দ আনায় কৃষকের তিনটি পোষ্য সহ সংবৎসর যাপন করিতে হয়। চারিজনের জন্য প্রত্যহ দুই বেলায় তিন সের তণ্ডুল বা খাদ্যোপযোগী অন্য শস্যের প্রয়োজন। টাকায় ২৫ সের দরে এই পরিবারকে বৎসরে ৩ টাকার শস্য কিনিতে হয়। কাপড়ের জন্য বৎসরে ৮ টাকা লাগে। এই মোট ৫১ টাকায় তিন জন পোষ্য সহ কৃষকের সংবৎসর যাপিত হয়। ফলে তাহার বৎসরে ৫ টাকার মাত্র অভাব হয়।"

উল্লিখিত বিবরণে দেখা গেল, সাধারণতঃ যাহার দশ (এখানকার হিসাবে ১৬.৫০) বিঘা জমি আছে, তাহার চাষের ব্যয় বাদে ১২১ টাকা লাভ থাকে। ইহার মধ্যে তাহাকে ৭৫ টাকা ভূমিকর প্রদান করিতে হয়। অবশিষ্ট ৪৬ টাকার মধ্যে তণ্ডুল কিনিতে ৪৩ টাকা ব্যয়িত হইয়া যায়। ক্রুক মহোদয় তণ্ডুলের দর টাকায় ২৫ সের লিখিয়াছেন। কিন্তু ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রিপোর্ট লিখিবার সময়ে ইটায় খাদ্যাপযোগী শস্যের দর টাকায় ১৭ সেরের অধিক ছিল না! সুতরাং ৪৩ টাকায় যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন, তাহাতে ৬৩.২৫ টাকা লাগে। তাহার পর তৈল, লবণ ও ব্যঞ্জনাদির জন্যও কিছু ব্যয় আছে ক্রুক বাহাদুর তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। চারি জনের জন্য যে বৎসরে

অন্ততঃ ৯.২৫ টাকার লবণ আবশ্যক হয়, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তৈল ব্যঞ্জনের জন্য বৎসরে ন্যূনকল্পে ৩'৫০ টাকা ব্যয় ধরিলেও কৃষকের ন্যায্য ব্যয় বৎসরে ৬৮ টাকার কম হয় না। ক্রুক মহোদয় বলিয়াছেন, অনেক কৃষকেরই গৃহে অন্ততঃ পক্ষে একটি গো বা মহিষ থাকে। তাহার দুগ্ধে কৃষক পরিবারের ঘৃত দুগ্ধাদির অভাব দূর হয়। কিন্তু এই গো-মহিষ ক্রয়ের ও গর্ভাবস্থায় উহাদিগকে খাওয়াইবার ব্যয় কোথা হইতে আসে, তাহা তিনি বলেন নাই।

উপরে যে ৬৮ টাকা ব্যয়ের হিসাব দেখান গেল, তাহাতে রোগে ঔষধ পথ্যাদি এবং আইন আদালত, জন্ম মৃত্যু, বিবাহ ও ধর্মকার্যাদির ব্যয় ধরা হয় নাই, ইহা বোধ হয় পাঠক লক্ষ্য করিয়াছেন। ক্রুক মহোদয় তাঁহার রিপোর্টের ৩১ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন,—

A great majority of the rural population pass through at least one or two attacks of fever during the year; in fact in many cases the disease has a tendency to become chronic or constitutional.

মফঃস্বলের অধিকাংশ লোকই বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুই একবার জ্বরে আক্রান্ত হয়। বাস্তবিক অনেক সময় এই রোগ বহুকালস্থায়ী বা জীবন-সহচর হইবার উপক্রম হইয়া দাঁড়ায়।

যেখানে জ্বরের প্রকোপ এইরূপ, সেখানে চারি জনের জন্য বার্ষিক ২ টাকা ঔষধ পথ্যাদির ব্যয়, অন্যায্য হইতে পারে না ফলতঃ বার্ষিক ৭০ টাকা চারি জনের জীবনধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ক্রুক মহোদয়ের হিসাবে গৃহপতি কৃষকের আয় বার্ষিক ৪৫.৮৭ আনার অধিক নহে। ইহা হইতে ইটা জেলায় গবর্নমেণ্টকে উচ্চ হারে খাজনা দিয়া কৃষকেরা কিরূপ সুখে কালযাপন করিতেছে, বুঝিতে পারা যায়। ১২১ টাকায় ৭৫ টাকা কর লইয়া গবর্নমেণ্ট আবার কৃষক-দিগকেই ঋণপ্রিয় বলিয়া তিরস্কার ও মহাজনদিগকে বিষনয়নে নিরীক্ষণ করেন! মহাজন না থাকিলে কৃষকের কি দুর্দশা হইত, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ঋণ করিয়া কয় দিন চলে? মহাজনই বা কতদিন ধার দিতে পারে? কাজেই কৃষক পরিবারকে অর্ধাশনে কালযাপন করিতে হয়। মিঃ গার্ট্যান (Manager of the palmar waste land grant) বলেন, এদেশের লোকে অধিকাংশ স্থলেই ধার করা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ ও কদর্য অন্ন ভক্ষণ করিয়া দিন যাপন করা শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করে।

They prefer short allowance and inferior kind of food to incurring debt.

কৃষকের পোষ্য সংখ্যা, ক্রুক মহোদয়ের মতানুসারে তিন জন ধরা গিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় আদমস্থমারির বিবরণীতে দৃষ্টিপাত করিলে, গড়ে ন্যূন পক্ষে ৫ জনকে লইয়া এক একটি পরিবার গঠিত, একথা স্বীকার করিতে হয়। কৃষকের পোষ্য ৪ ধরিলে তাহার বার্ষিক ব্যয় আরও ১৭.৫০ টাকা বাড়িয়া যায়। এরূপ অবস্থায় কৃষকপরিবারকে ঋণপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াও অর্ধাশনে কাল যাপন করিতে হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

মিঃ ক্রুকের আর একটি উক্তি এই,—

It is unusual to find a village woman who has any wraps at all.

এখানকার গ্রাম্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কাহারও গায়ের কাপড় বা চাদর নাই।

ইটা জেলার অবস্থা পাঠক ইহা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই রিপোর্টের সারসংগ্রহপূর্বক যে সরকারি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয়,—

Mr. Crooke, Collector of Etah (area 1739 miles, population 7,56,528) whose peculiar knowledge of agricultural life leads a great value to his remarks, considers the peasantry to be a robust, apparently well fed population, and dressed in a manner which quite comes up to their *traditional ideas of comfort*......Mr. Crooke does not believe that anything like a large percentage of people in Etah or any other districts of the Provinces, is habitually under-fed.

ইটা জেলার পরিমাণ ১৭৩৯ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৭,৫৬,৫২৮। এখানকার কলেক্টার মিঃ ক্রুক সাহেবের ভারতীয় কৃষিজীবন সম্বন্ধে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, এই কারণে তাঁহার মন্তব্যের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এই বিজ্ঞ কর্মচারীর মতে ইটা জেলার কৃষকগণ হৃষ্টপুষ্ট, তাহাদের অন্নকষ্ট আদৌ নাই। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে তাহাদিগের চিরন্তন ধারণ যেরূপ তাহারা তদনুরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইটা জেলার বা অন্য কোনও প্রদেশের অধিকাংশ লোক বার মাস অর্ধাশনে দিন যাপন করে,—এ কথা মিঃ ক্রুক বিশ্বাস করেন না।

ক্রুক মহোদয়ের রিপোর্টের ২৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্টি হয় যে,—

The assertion which is universally believed by natives,

that the cultivator is not so well-off now-a-days as at the time of the Mutiny.

দেশের লোকের সকলেরই বিশ্বাস, সিপাহীবিদ্রোহের সময় কৃষকদিগের অবস্থা যেরূপ সচ্ছল ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই।

পাঠক এই উক্তির সহিত সরকারি মন্তব্যের বক্রাক্ষরে মুদ্রিত অংশটি মিলাইয়া দেখিবেন।*

রিপোর্টের ১৬ পৃষ্ঠা হইতে ১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আবেরাম ঠাকুর নামক এক কৃষকের পরিচয় দৃষ্ট হয়। তাহার সম্বন্ধে মিঃ ক্রুক লিখিয়াছেন,—

আবেরামের বয়স ৪০ বৎসর, পোষ্য ৫টি. ২৭ বিঘা জমির চাষ করে। চাষ ভাল হইলে, দুবেলায় তাহার পরিবারে ৫ সের তণ্ডুল খরচ হয়। খাদ্যের দর চড়িলে, তিন সের বা তদপেক্ষা অল্প তণ্ডুলে এই পরিবার দিন যাপনে বাধ্য হয়। সে এ বৎসর ক্ষেত্রের শস্য সম্পূর্ণ পক্ব হইবার পূর্বেই উহা খাইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহার ক্ষেত্রে যে ধান্য হইয়াছিল, তাহার মূল্য ৭০.২৫ টাকা; তন্মধ্যে খাজনা দিয়াছে, ৬৮.৯৩। এই ৬৮.৯৩ আনার মধ্যে গবর্নমেণ্ট অর্ধেক লইয়াছেন, অবশিষ্ট জমিদার গ্রহণ করিয়াছেন। দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া তাহার এ বৎসর ১৮ টাকা আয় হইয়াছে। পিতা পুত্রে মজুরী করিয়া ১৫ টাকা উপার্জন করিয়াছে। বীজ কিনিয়াছে ৯.৫০ টাকার। পাঁচটি পোষ্যসহ ৪৪ টাকায় সে সংবৎসর জঠরযন্ত্রণার আংশিক নিবারণ করিয়াছে। তাহাকে ৭.৫০ টাকার কাপড় কিনিতে হইয়াছে। তাহার ঘরে একটিও কম্বল নাই। গৃহস্থিত আসবাব পত্রের মূল্য ২ টাকার অধিক হইবে না। আরও ২৬.৯৩ না হইলে তাহার সংবৎসরের (এক বেলা) অন্ন সংস্থান হইবে না। কিন্তু পূর্ববর্ষের ৫০।৬০ টাকা ঋণ থাকায় আর তাহার মহাজনের নিকট টাকা ধার পাইবার উপায় নাই।

আবেরাম ঠাকুর সম্বন্ধে ক্রুক মহোদয়ের এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার অকল্যাণ্ড কলভিন বাহাদুর তাঁহার প্রধান সচিব মিঃ রীডের (Mr. T. R. Reid) সাহায্যে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন,—

The family appears to be above want.

আবেরাম ঠাকুরের পরিবারবর্গের কোনও বিষয়ে অভাব নাই।

* সিন্ধুদেশেও রাজপুরুষেরা প্রকৃতিপুঞ্জের শ্রীবৃদ্ধির বিশেষ লক্ষণ (a marked improvement) দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু বলিতেছেন,—

The people themselves will not admit it.

কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—"মন্দ লোকে বলে মন্দ।"

বলাবাহুল্য, এই মন্তব্য ভারত গবর্নমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ভারত গবর্নমেণ্টও বিশ্বাস করিলেন, আবেরামের কোনও অভাব নাই।

ইটা জেলায় সে বৎসর যাহাদিগের জমিতে উৎপন্ন শস্যের মূল্য ৩২১ টাকার অধিক হয় নাই, তাহাদিগকে ৩০৬ টাকা ভূমিকর দিতে হইয়াছে, রিপোর্টে এরূপ উদাহরণও পাওয়া যায়। তন্তুবায়, তৈলিক প্রভৃতির অবস্থাও কৃষকদিগের অপেক্ষা কোনও অংশে উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে, রিপোর্টে তাহার নিদর্শন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এটাওয়া জেলার কলেক্টার মিঃ আলেকজাণ্ডার ঐ অঞ্চলের কৃষকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

In all ordinary years I should say that many cultivators live one third of the year on advances from money-lenders.

সাধারণতঃ যে সকল বৎসরে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির প্রকোপ থাকে না, সে সকল বর্ষে বৎসরের মধ্যে প্রায় চার মাস কৃষকদিগকে মহাজনের নিকট ঋণ লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়।

কানপুরের আসিস্টাণ্ট কলেক্টার মিঃ বার্ড বলেন,—

I have calculated the cost of food of a male at El. 12s. per annum, of a female, £1.7s.4d. and a minor 18s.8d.

আমি গড়ে প্রতি পুরুষের বার্ষিক খাদ্যের ব্যয় ১৬ টাকা, স্ত্রী লোকের ১৩.৬৭ ও বালকের ৯.৩৩ ধরিয়াছি।

যে জেলার পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে গড়ে ষোল টাকা মূল্যের তৈল-লবণ ব্যঞ্জন-তণ্ডুলের সংবৎসর (বা তিন পয়সায় দুই বেলা) যাপন করিতে হয় সে জেলার লোক কিরূপ সুখে আছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ঝাঁসী (Jhansi) বিভাগের কমিশনার মিঃ ওয়ার্ড ঐ অঞ্চলের জালবন জেলার লোকের অবস্থা সম্বন্ধে বলেন,—

In Jhalaun the burden of indebtedness is very heavy and I cannot but think that agriculture is declining from want of capital and from too continuous cultivation of the same land for the same crop.

জালবন জেলার কৃষকদিগের ঋণভার অত্যন্ত অধিক। অর্থের অভাবে এখানকার কৃষির অবস্থা দিন দিন অবনত হইতেছে, একই ভূমিতে পুনঃপুনঃ একই শস্য উৎপাদিত হওয়ায় ভূমির উর্বরতা কমিয়া যাইতেছে।

দেশের অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর লোক প্রত্যহ অর্দ্ধাশনে থাকিতে বাধ্য হয় কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বান্দা অঞ্চলের কলেক্টার ও ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হোয়াইট বলেন,—

A very large number of lower classes of population cleatly demonstrate by the poorness of their physique that they are habitually half-starved......I think the Government would be astonished to find how many Oudh peasants cultivate land without any bullock.

"নিম্নশ্রেণীর লোকদিকের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে যে চিরকাল অর্দ্ধাশনে যাপন করিতে হয়, তাহা তাহাদিগের শরীরের শোচনীয় ক্ষীণতা হইতেই প্রতিপন্ন হয়। আমার বোধ হয় গবর্নমেণ্ট শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে অযোধ্যা অঞ্চলের অনেক কৃষককে বলদের অভাবে স্বয়ং লাঙ্গল টানিতে হয়।

গাজীপুরের কলেক্টার সাহেব বলেন,—

As a rule, a very large proportion of the agriculturists in a village are in debt.

সাধারণতঃ গ্রামের অধিকাংশ কৃষকই ঋণগ্রস্ত।

সীতাপুরের অবস্থা কানপুরের অপেক্ষাও মন্দ। এখানকার প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষকে সাড়ে চোদ্দ টাকায় ও বালকদিগকে সাত টাকা দুই আনায় সংবৎসরকাল যাপন করিতে হয়। এখানকারই কমিশনার মিঃ বয় বলিয়াছিলেন যে "কোনও বিশেষ কারণে ইদানীং প্রজাবর্গের এতদপেক্ষা অধিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কালযাপন বাঞ্ছনীয় নহে।"

পূর্ববর্ত্তী সেন্সাসের বা আদমসুমারির তালিকার সহিত গত ১৯০১ সালের তালিকার তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, বেরার প্রদেশে ঐ দশ বৎসরে লোকসংখ্যা প্রায় ৫,৮০,০০০ ও পঞ্জাবে ৭,৫০,০০০ কমিয়াছে। মধ্যপ্রদেশসমূহে ১৩,৭০,৫০০ জন অধিবাসী গত দশ বৎসরের (১৮৯১ খৃঃ—১৯০১ খৃঃ) মধ্যে হ্রাস পাইয়াছে। এলাহাবাদ গোরক্ষপুর ও বারাণসী জেলায় লোক সংখ্যা ঐ সময়ের মধ্যে ২,৪৪,২৮৫ জন কম হইয়াছে। কৃষকের অন্নবস্ত্রের অভাব বৃদ্ধি না হইলে এত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল কিরূপে? রাজপুরুষেরা বলেন, দুষ্ট মহাজন, মোহময় দেওয়ানি আদালত ও নিষ্ঠুর দেবতার দোষেই এইরূপ ঘটিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের কোনও দোষ নাই। অথচ ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বসু যখন দেখাইয়াছিলেন যে, মধ্যপ্রদেশসমূহে স্থানে স্থানে শতকরা ১০২ ও ১০৫ হারে রাজস্ব বৃদ্ধি করায় প্রজার কষ্ট বাড়িয়াছে, তখন কর্ত্তৃপক্ষ তাহার যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

প্রজার নিকট হইতে উচ্চ হারে রাজস্ব গৃহীত হয় না এ কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সময়ে সময়ে গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে বিশেষ চেষ্টা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ইন্দোর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর আর রঘুনাথ রাও মহোদয় (ইনি অনেক দিন মাদ্রাজ গবর্নমেণ্টের অধীন সবর্ডিনেট সার্বিসে কার্য করিয়া) লিখিয়াছেন "রাজপুরুষেরা বলেন যে,—ভূমির মোট উৎপাদনের শত ভাগের পঁচিশ বা ত্রিশ ভাগ অথবা কৃষকের লভ্যাংশের অর্ধেক রাজস্ব-স্বরূপ গ্রহণ করা হয়। প্রকৃত ঘটনা যদি এইরূপ হইত, তাহা হইলে প্রজারা দুই এক বৎসর ফসল ভাল না হইলেও বিশেষ বিপন্ন হইত না। ফলতঃ প্রজার নিকট হইতে গবর্নমেণ্ট মোট উৎপন্ন শস্যের অর্ধেকের অধিক রাজস্বস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সরকারি কাগজে পত্রে, শত ভাগের পঁচিশ বা ত্রিশ ভাগের অধিক খাজনা লওয়া হয় না, ইহা দেখাইবার জন্য জমির আয় অধিক করিয়া ধরা হয়।" তাঁহার উক্তির একাংশ এইরূপ,—

This is only in theory, actually they receive on an average more than fifty per cent, of the gross. On paper it is shown to be between 25 and 30 p.c. of the gross *by over-estimating the gross produce.*

ইহার পর দেওয়ান বাহাদুর উদাহরণস্বরূপ একটি গ্রামের কৃষিবিষয়ক আয়ব্যয়ের বিবরণ ও গবর্নমেণ্টের নির্ধারিত করের অন্যায্যতার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

If there is any doubt in this case, I am prepared to hand over the village to Government if I be allowed to draw from the Government treasury annually the sum of fixed assessment perpetually.

এই হিসাবের সত্যতায় যদি কোনও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে, আমি এই গ্রামটি চিরকাল গবর্নমেণ্টের নির্ধারিত কর লইয়া গবর্নমেণ্টকে ইজারা দিতে প্রস্তুত আছি।

কোন্ প্রদেশের ভূমিতে গড়ে বিঘা প্রতি কত শস্য উৎপন্ন হয়, বিগত দুর্ভিক্ষ কমিশনে কর্তৃপক্ষ তাহার হিসাব দাখিল করিয়াছিলেন। সেই হিসাবে প্রকাশ,—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে গড়ে প্রতি বিঘায় প্রায় পঁচিশ সের করিয়া শস্য অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সমগ্র দেশবাসীর সংবৎসর ব্যবহারোপযোগী শস্য রাখিয়া ও বিদেশে রপ্তানি করিয়াও দেশে কত অধিক শস্য সঞ্চিত থাকে, তাহারও হিসাব গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে কমিশনের সমক্ষে প্রকাশিত

হইয়াছিল। কমিশন সে হিসাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,

The *Bengal* returns are particularly *unreliable*......The Bombay returns also appear to be far too high......The Burmah annual surplus has been pitched too high...... The surplus of 3,306,3C0 tons returned for the Province of Bengal appears to us to be greatly in excess of the reality, and the Local Government take the same view......On the whole we are disposed to think that in the figures supplied to us by Local Governments the normal surplus in most cases is placed too high.

এখন বেহার অঞ্চলের কৃষকদিগের অবস্থা শুনুন। পাটনার কলেক্টার বলেন—যেসকল কৃষক সাত বিঘা জমির চাষ করে, তাহারা—

Can take one full meal instead of two.

একবেলা ভিন্ন দুইবেলা খাইতে পায় না।

গয়ার কমিশনার সাহেবের উক্তি এই—

Forty per cent of the population are insufficiently led.

এ জেলায় শতকরা ৪০ জন অর্ধাশনে কালযাপন করে।

মিঃ টয়েনবী (পাটনার কমিশনার) বেহারী কৃষকদিগের অবস্থার এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"পাঁচ বিঘা জমির চাষ করে, এরূপ কৃষকের সংখ্যা এই অঞ্চলে অল্প নহে। গড়ে ইহাদের বৎসরে ১২৫ টাকা মূল্যের শস্য উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে খাজনা বাদে ১০২ টাকা তাহাদের হাতে থাকে। এই টাকায় সাধারণতঃ ছয়জন পোষ্য সহ কৃষককে সংবৎসর যাপন করিতে হয়। এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ হইবে। লক্ষ লক্ষ লোককে দুই বিঘা মাত্র জমি চাষ করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। এই সামান্য আয়ে ইহারা কিরূপ কষ্টে দিনযাপন করে, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এতদ্ব্যতীত শতকরা দশ-পনেরো জনের জমি-জমা নাই—কেবল মজুরী করিয়া ইহারা দিনপাত করে। শ্রমজীবীরাও বৎসরের মধ্যে আট মাসের অধিককাল কোনও কাজ পায় না। মজঃফরপুর, সারণ, চাম্পারণ ও দ্বারবঙ্গের অনেক অংশে শ্রমজীবীদিগকে অর্ধভুক্ত অবস্থায় কালযাপন করিতে হয়।"

রবার্ট নাইট প্রণীত India Before Our Time and Since নামক গ্রন্থে দেখা যায়, উড়িষ্যায় পূর্বে কৃষকের গৃহে ধান্য সর্বদা সঞ্চিত থাকিত, অন্ততঃ দুই

বৎসরের ব্যবহারোপযোগী শস্য গৃহে সংগৃহীত না থাকিলে কোনও কৃষকই নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। নাইট মহোদয় বলেন, "বৃটিশ শাসন উড়িষ্যায় প্রবর্তিত হইবার পর হইতে কৃষকদিগের ধানের গোলা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। এবং এক্ষণে সে সকল ধান্য-ভাণ্ডারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে।"

সরকারি রিপোর্ট মতে নিম্নবঙ্গের পূর্বাঞ্চলের লোকের অন্নকষ্ট আদৌ নাই। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সেরূপ নহে। তথাপি বিহার ও উড়িষ্যাবর্জিত নদীমাতৃক শস্যশ্যামল বঙ্গদেশে ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় কৃষক সমাজ অন্নকষ্টে পীড়িত নহে। তথাপি বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর লোকের আয় ডিগ্‌বী সাহেবের মতে গড়ে বার্ষিক পনেরো টাকা তিন আনা মাত্র। অর্থাভাবে বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই সুপানীয়ের অভাব ঘটিয়াছে। ফলে ম্যালেরিয়ায় ও কলেরায় প্রতিবর্ষেই বঙ্গের মৃত্যুসংখ্যা বাড়িতেছে। সুখাদ্যের অভাবেও শিশুগণের যকৃৎ রোগে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিতেছে।

ফলতঃ ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র কৃষক-সমাজের অবস্থা ইংরাজের রাজস্বনীতি ও বাণিজ্যনীতির দোষে অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বৃটিশভারতে অন্য সুখ যতই থাকুক, দশ কোটি লোকের যে "ভাত-কাপড়ের" কষ্ট অত্যন্ত প্রবল, তাহা পূর্বোদ্ধৃত রাজপুরুষদিগের মন্তব্যসমূহ হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐতিহাসিক হণ্টারের Imperial Gazetteer of India নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ১৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, "প্রকৃত দুর্ভিক্ষের সময় গবর্নমেণ্ট বহু কষ্টে অনশন-পীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করেন বটে ; কিন্তু—

"It cannot stop the yearly work of disease and death among a steadily under-fed people.

"নিত্য-অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট প্রজাসমূহ যে প্রতি বৎসর রোগের তাড়নে ও কালের আক্রমণে অসময়ে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার প্রতিকার করিতে গবর্নমেণ্ট অসমর্থ।"

গবর্নমেণ্ট প্রজা রক্ষায় অসমর্থ হইলে কে আর হতভাগ্যদিগের অকাল-মৃত্যু নিবারণ করিবে। দেশের ধনি সম্প্রদায়ের উপর দুঃসময়ে চিরকাল দরিদ্রশ্রেণীর লোকে নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দেশের সেই ধনশালী দান-ধর্ম-পরায়ণ অভিজাতবর্গ (Nobles) কোথায়? সেই উদারচরিত কর্ণকল্প দাতৃসম্প্রদায় আজ কোথায়? স্যার জন. কে (Sir. J. Kaye) এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় বৃটিশ-শাসননীতির দোষ প্রদর্শনপূর্বক বলেন,—

The proprietors of vast tracts of country, as far as the

eye could reach, have, shrivelled into tenants of mud huts and possessors of only a few cooking pots.

অর্থাৎ যাঁহারা বড় বড় ভূমিখণ্ডের অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা বিশীর্ণ অবস্থায় মৃন্ময় কুটীরে কতিপয় তৈজসপত্র লইয়া দিনযাপন করিতেছেন।

সেকালের কুবেরকল্প দরিদ্রপালক রাজবংশীয়দিগের পরিণাম কি হইল? ইহার উত্তরে মিঃ জন. ব্রাইট পার্লামেণ্ট মহাসভায় বলিয়াছিলেন,—

They are now either homeless wanderers of pensioners on the bounty of the stranger by whom their fortunes have overthrown.

যাঁহারা এককালে দেশ শাসন করিতেছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে হয় গৃহশূন্য পরিব্রাজক শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন, না হয় যে সকল বৈদেশিক তাঁহাদিগের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটাইয়াছেন, তাহাদিগেরই অনুগ্রহদত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিতেছেন।

এখন গবর্নমেণ্ট প্রজার অন্নকষ্ট দূর করিতে—তাহাদের অকালমৃত্যু নিবারণ করিতে অসমর্থ জ্ঞাপন করিলে, নিরাশ্রয় ভারতবাসী কোথায় যাইবে? ১৮৮০ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ৩৯,২৮,৬৩১ জন মরিয়াছিল; ১৯০০ সালে ৮৩,৩৪,১৫৫ জন ভারতবাসীর ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। সকল সভ্যদেশেই মৃত্যুসংখ্যা কমিতেছে, কেবল ভারতবর্ষেই উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে দেশে খাদ্যাভাব ঘটায় অনেকেই দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যে ভারতবাসী সহজে আপনাদিগের বাস্তভিটা ত্যাগ করিতে চাহে না, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগের মধ্যে ১০,৭১২ জন জীবিকা-হরণের জন্য কুলিরূপে বিদেশে গমন করিয়াছিল, ১৯০১ সালে উহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২১,৬১৩ হইয়াছে। বিগত ১৮৯৩ হইতে ১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসরে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৮৯ জন দেশত্যাগ করিয়াছে। পেটের দায়ে বিদেশে—ইংরাজ উপনিবেশসমূহে যাহারা গমন করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি ঔপনিবেশিকেরা কিরূপ দুর্ব্যবহার করেন, তাহা সংবাদপত্র পাঠকদিগের অবিদিত নহে।

যাহারা স্বদেশ ত্যাগ করিতে পারে নাই, অন্নকষ্টে তাহাদিগেরও দুর্গতির শেষ নাই। ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষকালে যে ভারতবাসী চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন অপেক্ষা মৃত্যুতে আলিঙ্গন করা শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিলেন,* তাহারা এখন ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া তস্করবৃত্তি স্বীকারে আর সঙ্কোচবোধ করিতেছে না। গত ১৮৯৮ সালে

১ ১৮৮৩ সালের "নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী পত্রে মিঃ জে. সেমুর কে মহোদয় লিখিয়াছেন—
An eye-witness on this occasion says.—"They were starving, but not one in a hundred thousand resorted to robbing."

১,৭৯,৯৭,০০০ জন চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিল, ১৯০০ সালে ২,৪৯,৬৫,০০০ জন চুরি করিয়া দণ্ড পায়। অন্নক্লেশের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় নৈতিক পরিণাম আর কি হইতে পারে? সরকারি রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে আরও দৃষ্ট হয় যে, যে বৎসরে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে জঠোরজ্বালায় উন্মত্তবৎ হইয়া জনসমাজ রাজবিধানের লঙ্ঘন করিয়াছে, সেই বৎসরেই রাজপুরুষেরা বেত্রাঘাত-দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া হতভাগ্যদিগের নৈতিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন! এরূপ বর্বরতা, এরূপ হৃদয়হীনতার কার্য কখনই রাজধর্মের অনুমোদিত হইতে পারে না।

১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষে দেশীয় রাজ্যে অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি কিরূপ অনুকম্পা প্রদর্শিত হইয়াছিল, বোম্বাইয়ের "টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া" নামক অর্দ্ধ সরকারি সংবাদপত্রের পশ্চাল্লিখিত উক্তি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

No less than 47,400 people migrated into H. H. the Nizam's territories from the adjoining British districts up to the spring of 1877 only—Dec. 14, 1880.

অর্থাৎ সেই দুর্ভিক্ষের সময় নিকটবর্তী বৃটিশ-শাসিত প্রদেশ হইতে অন্যূন ৪৭,৪০০ লোক নিজাম রাজ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, দেশীয় রাজ্যসমূহে কৃষকসমাজে মহাজনদিগের প্রতিপত্তিও অপেক্ষাকৃত অল্প।

The money-lender is not the paramount power in Travancore in Rajputana. in the Nizam's dommions, in Mysore or elsewhere outside the British provinces.—*India for Indians—And for England*, p. 51.

পার্বত্য নেপালরাজ্য শিক্ষা ও সভ্যতায় সুসভ্য ইংরাজের অপেক্ষা বহুগুণে হীন; কিন্তু সেখানকার প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে বঙ্গের ভূতপূর্ব ছোটলাট সার জর্জ ক্যাম্বেলের রিপোর্টে নিম্নলিখিত উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়,—

The condition of the Nepal ryot is on the whole better than that of the British ryot.

বৃটিশ ভারতীয় প্রজার অপেক্ষাও নেপালী প্রজার অবস্থা মোটের উপর অনেক ভাল।

দুঃখের বিষয়, এখানকার উচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষেরা এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, বৃটিশ শাসনে ভারতবাসীর আর্থিক অবনতি বা দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইতেছে, একথা আদৌ সত্য নহে। ভূতপূর্ব ভারতসচিব লর্ড জর্জ হ্যামিল্টন মহোদয় গত ১৯০০ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখে পার্লামেণ্ট মহাসভার সমক্ষে বক্তৃতাকালে সর্বজন-সমক্ষে বলিয়া ছিলেন,—

There is a small school in this country as in India who are perpetually asserting that our rule is bleeding India to death. Since I have been Secretary of State I have taken great pains to collect and investigate any information or evidence. I could obtain, no matter from what quarter it came, which by facts, figures or other reliable information tended to support this allegation. I admit at once that if it could be shown that India has retrograded in material prosperity under our rule, we stand self-condemned, and we ought no longer to be entrusted with the control of that country. But no such facts, figures or evidence have I ever been able to obtain. That a section of the public both here and in India believes this allegation is clear from their constant and unwearied repetition of the charge. But this is founded not on figures, or facts or economic data but on plausible syllogistic formula that they are never tired of repeating.

বিলাতে ও ভারতবর্ষে একদল লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষের যে ভীষণ শোণিতস্রাব হইতেছে, তাহাতে ভারতবাসী মৃতকল্প হইয়াছে। আমি সচিবের পদ গ্রহণের পর হইতে এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য যথাসাধ্য কষ্ট-স্বীকার-পূর্বক নানা সূত্রে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি। আমি স্পষ্টাক্ষরে একথা স্বীকার করি যে বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষের অধিক অবনতি ঘটিয়াছে—একথা প্রতিপন্ন হইলে আমাদিগের হস্তে আর ভারতের শাসনভার থাকা উচিত নহে। কিন্তু আমি সেরূপ কোনও তথ্যই এপর্যন্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। তথাপি এই অভিযোগে—ভারতবাসীর অবনতির উপন্যাসেই বিলাতের ও ভারতের অনেকে যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদিগের অভিযোগের পুনঃ পুনঃ উত্থাপনে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাঁহাদিগের এই বিশ্বাস, প্রকৃত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ন্যায়শাস্ত্রানুগত শুষ্ক তর্কের বলে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত।

ইহা অপেক্ষা আমাদিগের দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? রাজ পুরুষদিগের এইরূপ বচনচাতুরীতে বিলাতের সহৃদয় ইংরাজসমাজ ভারতবাসী প্রজার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারেন না। ভারতের স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারি স্যার লুই ম্যালেট ভারতবর্ষের এই সঙ্কটময় অবস্থার কথা স্বীকার করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন,—

I have never concealed my opinion as to the extreme gravity of our financial position, and I believe that nothing but the fact that the present system (in India) is almost secure from all independent and intelligent criticism has enabled it so long to survive.

ফলতঃ যে ইংরাজ স্বদেশীয় কৃষকের দাসত্ব ও জগতের সমস্ত ক্রীতদাসের দাসত্ব মোচন করিয়া অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন, সেই ইংরাজের দৃষ্টি এই বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট না হইলে এদেশের দীনহীন প্রজার প্রতীকার লাভের কোনও আশা নাই।

রেল ও খাল

মহাভারতীয় সভাপর্বে দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে? কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসদ্ভাব নাই? রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবর সকল ত নিখাত হইয়াছে? কৃষিকার্য ত বৃষ্টি-নিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে?"

সেকালের হিন্দু নরপতিগণ কৃষিকার্যকে "বৃষ্টি-নিরপেক্ষ" করিবার জন্য "রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবরাদি নিখাত" করাইতেন। এই কারণে দৈবদুর্বিপাকে অনাবৃষ্টির সংঘটন হইলেও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইত না, বর্তমান কালের ন্যায় লক্ষ লক্ষ প্রজা জঠরযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইত না। কিন্তু ইংরাজ, কৃষিজীবী প্রজার নিকট উচ্চহারে কর-গ্রহণ করিয়াও কৃষিকার্যকে "বৃষ্টি-নিরপেক্ষ" করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। এ দেশের লোকে যে সকল ঘটনাকে দৈবাধীন বলিয়া মনে করে, ইংরাজ বিজ্ঞান-বলে সে সকল ব্যাপারকে আপনাদিগের আয়ত্ত করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই তাঁহাদিগের মুখে দৈবশক্তির অনতিক্রমণীয়তার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ভারতবাসীর বিশ্বাস, তড়াগ বা সরোবরাদির খনন দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের (Irrigation) সুব্যবস্থা করিলে অনাবৃষ্টির কুফল বহু পরিমাণে হ্রাস পায়। তাই সেকালের হিন্দু নরপতিগণ নারদীয় নীতির অনুসরণ করিয়া জল-পূর্তের ব্যবস্থা-বিধানে সমধিক যত্ন প্রকাশ করিতেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি মহোদয়ের আদেশে ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকানন দক্ষিণ ভারতের কৃষিকার্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

করিয়া ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, শত বৎসর পূর্বেও দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য-সমূহে জল-পূর্তের অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার গ্রন্থে, তদানীন্তন সামান্য ভূসম্পত্তিবিশিষ্ট দেশীয় রাজন্যবর্গের নিখাত চার ক্রোশ দীর্ঘ ও দেড় ক্রোশ প্রস্থ তড়াগ-সমূহের ও বহুসংখ্যক জল-প্রণালীর বর্ণনা পাঠ করিলে এই সভ্যতাদীপ্ত বিংশ শতাব্দীব প্রারম্ভে আমাদিগের হৃদয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।

ইংরাজ বলেন, দুর্ভিক্ষের কুফল-নিবারণেব জন্য খাল, পুষ্করিণী প্রভৃতির খননে অর্থব্যয় যে কর্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শস্যশ্যামল দেশ হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে শস্য-বহনের জন্য সর্বত্র রেলপথের বিস্তার বিশেষ আবশ্যক। ভারতবাসী বলে, কৃষিক্ষেত্রে সেচনের জন্য প্রচুর জলের ব্যবস্থা করিতে পারিলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে; ইংরাজ বলেন, "সে কথা সত্য হইলেও দুর্ভিক্ষ-দমনকার্যে রেলপথের আবশ্যকতা অত্যন্ত অধিক। পরন্তু রেলে লোকের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমনের ও বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। সকল সভ্যদেশেই রেলপথের বিস্তার দ্বারা রাজকোষে ধনসঞ্চয় ও প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব রেলপথ-বিস্তারে বিশেষভাবে মনোযোগ করাই গবর্নমেণ্ট কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" এইরূপ যুক্তিবাদের অবতারণায় মূর্খ প্রজাপুঞ্জের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানবিৎ প্রবল রাজার সিদ্ধান্তস্রোতে ভাসিয়া গেল।

রাজপুরুষদিগের মতানুসারে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস করিবার জন্য ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বিগত ১৯০২ সাল পর্যন্ত দরিদ্র ভারতবাসীর ৩৫৫,০৪,৭০,০০০ টাকা (২৩,৬৬,৯৮,০০০ পাউণ্ড) ব্যয়ে ২৬,৪৭৪ মাইল রেলপথ নির্মিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আরও ২,৩৬৯ মাইল রেলপথ নির্মাণের আদেশ হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, প্রজার এই পর্বতপ্রমাণ অর্থরাশি ব্যয় করিয়া ৪৭ বৎসরের মধ্যে গবর্নমেণ্ট এক পয়সাও লাভ করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে এই কার্যে ১৯০০ সাল পর্যন্ত রাজকোষ হইতে প্রায় ৬০,০০,০০,০০০ টাকা লোকসান দিতে হইয়াছে, এবং প্রায় ১,০২,৫০,০০,০০০ টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে। তবে এই রেলপথের জন্য প্রায় ছয় সহস্র শ্বেতাঙ্গ উচ্চ বেতন গ্রহণের সুবিধা পাইতেছে। বিলাতের লৌহ-ব্যবসায়ীদিগেরও মাল যথেষ্ট পরিমাণ এদেশে বিক্রীত হইতেছে। শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী দেখাইয়াছেন, ভারতীয় রেলপথের জন্য যে টাকা ব্যয়িত হয়, তাহার শতকরা ৩১.৭৫ ভাগ লৌহোপকরণ ক্রয়ের জন্য বিলাতী কর্মকারদিগের হস্তগত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এদেশে যে ২৩টি বৈদেশিক রেল কোম্পানি আছে, তাহাদের ডিরেক্টার মহাশয়দিগের আফিস-সমূহ বিলাতে

অবস্থিত বলিয়া ঐ সকল আফিসের জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা বিলাতের লোকেই পাইয়া থাকেন। রেল নির্মাণের ব্যয়-সংগ্রহের জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা বিলাতের লোকই পাইয়া থাকেন। রেল নির্মাণের ব্যয়-সংগ্রহের জন্য অধিকাংশ ঋণ বিলাতেই করা হইয়াছে। ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের নিকট হইতে অতি সামান্য অর্থ (ন্যূনাধিক ছয় কোটী টাকা) ঋণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। বৈদেশিক কোম্পানীরও অনেক টাকা রেলের কারবারে খাটিতেছে। সুতরাং সমস্ত লভ্যাংশ তাঁহারাই পাইতেছেন।

ভারতবর্ষে সর্বশুদ্ধ তেইশটি বৈদেশিক রেল কোম্পানী আছে। ইহাদিগের নির্মিত রেলপথ ভিন্ন গবর্নমেণ্ট পাঁচটি রেলপথ নির্মাণ করাইয়াছেন। দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যের পাঁচটি লৌহপথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে রেলের বিস্তারের জন্য গবর্নমেণ্টের আগ্রহ এরূপ অধিক যে, পূর্বোক্ত বৈদেশিক কোম্পানীসমূহের মধ্যে কতকগুলিকে উৎসাহদান করিবার জন্য তাঁহারা এদেশে রেলের কার্যে ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতির পূরণ করিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার (guarantee) করিয়াছেন। কতকগুলি কোম্পানিকে অন্যরূপেও অর্থসাহায্য করিয়া ভারতে রেল খুলিবার জন্য উৎসাহ দিয়াছেন। জি. আই পি, বি. বি. সি. আই ও মাদ্রাজ রেলের অধিকারী কোম্পানি-সমূহের সহিত গবর্নমেণ্ট কিরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন, শুনিবেন ?

In the contract renewed with the three railways,····· it was agreed that the Companies should receive interest at the guaranted rate of five per cent, and half the surplus profits, no account being taken of deficits, that remittances to England should be converted at the rate of 1s. 10d. the rupee ; and that calculations should be half-yearly—Miss Ethel Faraday, M.A.—"*Paper on Indian guaranteed railways*"—1900.

বাজারে শতকরা আড়াই টাকা তিন টাকা সুদে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের গবর্নমেণ্ট এই তিনটি কোম্পানির সহিত শতকরা পাঁচ টাকা সুদ পোষাইয়া দিবার চুক্তি করিয়াছেন। শতকরা পাঁচ টাকার উপর যে লাভ হইবে, এই চুক্তিপত্র অনুসারে কোম্পানী তাহার অর্ধাংশ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যদি কোনও কারণে লোকসান হয়, কোম্পানী তাহার অংশভাগী হইবেন না। বিনিময়ের দর যাহাই হউক, কোম্পানির প্রাপ্য বাইশ পেন্স দরে গবর্নমেণ্টকে প্রদান করিতে

হইবে। এখন বিনিময়ের যে দর তাহাতে সাধারণতঃ ষোল পেন্সে (আনায়) এক টাকা ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্বোক্ত কোম্পানিত্রয়কে বাইশ পেন্স না দিলে, তাঁহাদিগের এক টাকা পরিশোধিত হয় না। কাজেই গবর্নমেণ্টকে প্রতি টাকায় ছয় আনা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার উপর আবার ছয় মাস অন্তর হিসাব নিকাশের চুক্তি থাকাতেও গবর্নমেণ্টকে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। প্রথম ছয় মাসে যদি লোকসান হয়, অর্থাৎ শতকরা পাচ টাকার অপেক্ষা কম লাভ থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষতি গবর্নমেণ্ট পূরণ করিয়া দেন; কিন্তু শেষ ছয় মাসে যদি লাভ হয়, তাহা হইলে গবর্নমেণ্ট তাঁহার অর্দ্ধাংশমাত্র প্রাপ্ত হন। প্রথম ছয় মাসে লাভ ও শেষ ছয় মাসে ক্ষতি হইলেও আমাদের গবর্নমেণ্টকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে ও লাভের অর্দ্ধাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ শতকরা চার টাকা মাত্র লাভ হইলে গবর্নমেণ্টকে এক টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া গড়ে কোম্পানির পাঁচ টাকা পোষাইয়া দিতে হয়; কিন্তু বৎসরের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ছয় টাকা লাভ হইলে ভারত গবর্নমেণ্ট অতিরিক্ত লাভের অর্দ্ধাংশ বা আট আনা মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বৎসরান্তে হিসাব নিকাশের যদি চুক্তি থাকিত, তাহা হইলে প্রথম ছয় মাসের এক টাকা ক্ষতি শেষ ছয় মাসের অতিরিক্ত লভ্য এক টাকায় অনায়াসে শোধ করিয়া দিবার সুবিধা পাওয়া যাইত। কিন্তু ছয় মাস অন্তর হিসাব নিকাশের চুক্তি থাকায় গবর্নমেণ্টকে প্রায় প্রতি বৎসরই বিষম ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। ফল কথা, ভারতীয় প্রজার প্রতিনিধি-স্থানীয় গবর্নমেণ্ট রেলপথের বিস্তার-কামনায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঈদৃশ অনিষ্টকর চুক্তিসূত্রে বদ্ধ হইয়া নিত্য অনশন-পীড়িত দরিদ্র প্রজার বহু-কষ্ট-প্রদত্ত রাজস্ব হইতে বার্ষিক প্রায় ১,৩০,০০,০০০ টাকা এই তিনটি বিলাতী রেল কোম্পানিকে প্রদান করিতেছেন! কেবল তাহাই নহে, আউধ রোহিলখণ্ড রেলের জন্য এইরূপে আমাদিগের হৃদয়ের শোণিততুল্য অর্থ হইতে ২৩,২৩,২৮৭ টাকা ও সাদার্ন ইণ্ডিয়ান রেলের জন্য ১,৯৪,৮৫,৯৯০ টাকা ক্ষতিপূরণ দান করিতে হইয়াছে। এইরূপে এ পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ চার কোটী পাউণ্ড বা ষাট কোটী টাকা রেলপথ-নির্মাণ উপলক্ষে আমাদিগের রাজকোষ হইতে লোকসান দেওয়া হইয়াছে।

বর্বরের ধনক্ষয় আর কিরূপে হইতে পারে? শ্বেতাঙ্গ প্রজার টাকা হইলে কি কর্তৃপক্ষ এরূপভাবে উহার অপব্যয় করিতে সাহস করিতেন? রেল বিভাগের উচ্চপদ-সমূহে দেশীয়দিগের নিয়োগ হইলেও বরং কিছু ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে পারিত, এক দিকে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অন্য দিকে ভারতবাসী কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিত। কিন্তু অতিরিক্ত বেতনদানে ছয় সহস্র শ্বেতাঙ্গের দারিদ্র্য দূর করিবার লোভও কর্তৃপক্ষ সংবরণ করিতে অসমর্থ। এরূপ অবস্থায় রেলের ব্যবসায়ে ক্ষতি

না হওয়াই বিস্ময়ের বিষয়। সত্য বটে, অধুনা প্রায় ৩,১৬,৬০০ জন দেশীয় ব্যক্তি রেল-বিভাগে কার্য করিয়া জীবিকার্জন করিতেছে; কিন্তু রেলের জন্য কত যান-ব্যবসায়ী, নৌ-জীবী, শকট-চালক ও নৌ-শকটাদিনির্মাণকারী শিল্পীর জীবিকা লোপ পাইয়াছে, তাহাও সেই সঙ্গে বিবেচ্য।

সরকারি রিপোর্টে দৃষ্ট হয়, ভারতীয় রেলসমূহে গত ১৯০১ সালে সর্বশুদ্ধ ১৬,৬৬,৪৮,০০ টিকিট বিক্রয় হইয়াছে। ঐ সালে ইংলণ্ডের মত ক্ষুদ্রদেশে ১১৭,৭২,৭৫,০৩৬ টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বহুক্ষতি স্বীকারপূর্বক রেলপথ নির্মাণ করায় কত লোকের ভ্রমণের সুবিধা হইয়াছে, ভারতবাসী রেলপথের আবশ্যকতা কতদূর অনুভব করে তাহা এই দুই অঙ্কে দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। তাহার পর বাণিজ্য-বিস্তারের কথা। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমাদিগের বিশেষ লাভ হয় নাই। রেলপথের বিস্তারের সহিত দূর পল্লীগ্রামেও বিলাতী দ্রব্যের কাট্‌তি বাড়িয়াছে। মূর্খ পল্লীবাসী বিলাতী বিলাস দ্রব্যের ক্ষণিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া দুর্লভ শস্য-বিক্রয়-পূর্বক উহা ক্রয় করিতেছে—রেলপথের সাহায্যে সেই বিক্রীত শস্য অচিরাৎ সমুদ্র তীরে নীত হইয়া দূর বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। ফলে দেশ নিরন্ন হইতেছে। রেলের জন্য দুর্ভিক্ষের সময়েও ভারতবর্ষ হইতে কত হন্দর শস্য বিদেশে যায়, তাহা নিম্নলিখিত রপ্তানির তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সাল	তণ্ডুল	গোধুম	অন্যান্য শস্য
১৮৯৬।৭	২,৭৮,২৭,২৬৯	১০,১০,৬২৬	২৬,৯৬,২১৭
১৮৯৭।৮	২৬,৩৫,৯১৮৮	২৩,৯২,৬০৭	২২,৩২,৬৯৪
১৮৯৮।৯	৩৭,৩৯,৭৪,০৪	১৯,৫২,৪৯৬	৪৫,১৩,২০৮

অন্যান্য দেশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা বুঝিবামাত্র রাজপুরুষেরা খাদ্য শস্যের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেন। অবাধ বাণিজ্য-নীতির দোহাই দিয়া ইংরাজ তাহাও করিতে চাহেন না। এতদ্‌ভিন্ন রেলের কল্যাণে পল্লীগ্রামে বিলাস প্রবেশলাভ করিয়া লোকের সর্বনাশ ঘটাইতেছে। দেশীয় শিল্পের প্রতি পল্লীবাসীর অনাদর বৃদ্ধি পাইতেছে। বিদেশী শিল্পসামগ্রীর আমদানির কথা অধিক আর কি বলিব, বিলাতী ঔষধের কাট্‌তি দেশে কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৪৩,৫৭,৭৪০ টাকার বিলাতী ঔষধের আমদানি হইয়াছিল, গত ১৯০১—০২ সালে ১০৭,৯৮,৭৮২ টাকার বিদেশীয় ঔষধ ভারতে আসিয়াছে। তথাপি আমাদের গবর্নমেণ্টের রেলপথ বিস্তারে বিরাম নাই।

কবি গাইয়াছেন,—

"ভারতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ।..."

সেকালে রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পকরথের সাহায্যে অবলীলাক্রমে লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাদেবীকে হরণ করিয়া সমুদ্রপারে স্বীয় রাজধানী লঙ্কায় লইয়া গিয়াছিল, ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যহরণ করিয়া লঙ্কার সৌন্দর্যবর্ধন করিয়াছিল। একালে ইংরাজ বাষ্পীয় শকটরূপী পুষ্পকরথের সাহায্যে ভারতের যাবতীয় শস্য স্বদেশে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, দেশীয় শিল্পের বিনাশ-সাধনপূর্বক বৈদেশিক পণ্যদ্রব্যে ভারতবর্ষ পূর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন। ফলে স্বর্ণকিরীটিণী লঙ্কার ন্যায় ইংলণ্ডের শ্রীসম্পদ দিন দিন বাড়িতেছে। খাল প্রভৃতি কাটিয়া দেশকে শস্যশ্যামল করিবার দিকে ইংরাজের তাদৃশ লক্ষ্য নাই। কিন্তু ভারতে রেলপথ বিস্তারের জন্য তাঁহাদিগের বিষম আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নিউ ইংলণ্ড ম্যাগাজিন পত্রের ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যায় রেভারেণ্ড জে. টি. সণ্ডারল্যাণ্ড মহোদয় ভারতীয় দুর্ভিক্ষের কারণাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে এই কথাই লিখিয়াছেন,—

Whatever lack of money there may be for education or for sanitary improvements, or for irrigation, or for other things which the people of India so earnestly desire and pray for, the Government always seems to have plenty for railways. Why? Because the railways of India helf the English people to wealth .....The railways have broken up many of the old industries of India, and thus have brought hardships and suffering to millions of people, but they enrich the ruling nation, and they give her a firmer military grip upon her valuable dependency and so money can always be found for them, whatever else suffers.—Rev. J. T. Sunderland.

রেল-বিস্তারের সহিত দেশে বাণিজ্য-বিস্তার হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে দেশবাসীর পরিবর্তে বিদেশীয় বণিককুলেরই ধনবৃদ্ধি হইয়াছে। কথাটা একটু স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে রেল বিস্তার ও বাণিজ্য-বিস্তার-বিষয়ক অঙ্কে দৃষ্টিপাত আবশ্যক। প্রথমতঃ রেলপথ কিরূপ বাড়িয়াছে, দেখুন,—

		রেলপথ	
১৮৭৩ খৃঃ	৫৬৭৯	মাইল	ছিল
১৮৮০ খৃঃ	৯১৬৭	”	হইল
১৮৮৫ খৃঃ	১২৩৮৫	”	”
১৮৯০ খৃঃ	১৬৯৮৪	”	”
১৮৯৫ খৃঃ	১৯১১৮	”	”
১৮৯৯ খৃঃ	২৩৭৮০	”	”
১৯০০ খৃঃ ২১ শে মার্চ পর্যন্ত	২৬৪৭৪	”	”

এখন আমদানি রপ্তানির অঙ্কে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন,—

সাল	আমদানি (টাকা)	রপ্তানি (টাকা)
১৮৫৫	১৭৯০১৬৯৮০	১১২৩১৬৪৮০
১৮৬০	২৭৩৭৫৩১২০	২৮৭৮১৫২৪০
১৮৬৫	৩২৮৭৬৪৯০০	৩৮৪৪২৯৫০০
১৮৭০	২৭৫৩৪০৬৭০	৩৮৫৬১৯৯৭০
১৮৭৫	৩২১৪৭৯০৪০	৪২০৮৯৭৫১০
১৮৮০	৪১২০৯১৬২০	৫৩৬০৬৭১১০
১৮৮৫	৫০০৮৯৫৩৪০	৬০১৮৫০৯৯০
১৮৯০	৫৯১৩০৬২২০	৭২৪১৮৭৩২০
১৮৯৫	৮৮৫৫৮৩৩৫	১১৩,৯২,৯৮,৬৩০
১৯০২	১১১১৮৪৪০০৭	১৬৯,০৬,৫৫,৭০৭

রাজপুরুষেরা এই সকল অঙ্কের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলেন, "রেলের জন্য দেশের বাণিজ্য এইরূপ দিন দিন বিস্তার লাভ করিতেছে ও তাহাতে দেশের ধনবৃদ্ধি পাইতেছে।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই বাণিজ্য বিস্তারে আমাদিগের ধনবৃদ্ধির পরিবর্তে ধনক্ষয়ই ঘটিতেছে। রেলের এরূপ অস্বাভাবিক বিস্তার না ঘটিলে আমাদিগের দেশের ধনক্ষয়ের স্রোত ঈদৃশ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত কি না সন্দেহ।

বৈদেশিক মালের আমদানি বৃদ্ধিতে যে আমাদের দেশের শিল্পিগণের অন্নে ধূলি নিক্ষিপ্ত হইতেছে, একথা বিস্তারিত রূপে বুঝাইবার আবশ্যক নাই। পক্ষান্তরে রপ্তানির ব্যাপারে আমাদের ঘরে টাকা আসিবার কথা। আমরা দেশের জলজ খনিজ ও কৃষিজ পণ্য বিদেশে পাঠাইয়া বৎসরে ১৩৯ কোটী টাকারও অধিক প্রাপ্ত হইতেছি; তথাপি আমাদের অর্থকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ দূর হইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে, এই রপ্তানির আয়ের অল্পাংশই প্রকৃতপক্ষে আমাদের হস্তগত হইতেছে। রপ্তানির ব্যবসায়ে যদি ভারতবাসীর মূলধন খাটিত, যদি ভারতীয় শিল্পিগণের কৌশল-প্রসূত দ্রব্যাদি এইরূপ ভূরিপরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হইত, তাহা হইলে আমরা প্রকৃত ধনশালী হইতে পারিতাম। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে তাহা হয় না। প্রথমতঃ দেশের দশ কোটী লোকের নিরন্তর অন্নাভাব সত্ত্বেও বিদেশীয়েরা অবাধ বাণিজ্যের মাহাত্ম্যে এদেশের লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। দেশে দিন দিন শস্যাদি দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। কৃষিজ পণ্যর মধ্যে চা কফির রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু তাহাতে

বিদেশীয়দিগের মূলধন খাটায় লভ্যাংশ তাহারাই পাইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ জলজ ও খনিজ পণ্যের উৎপাদনে বিদেশীয় মহাজনদিগের টাকা খাটিতেছে। দেশের লোকে কেবল সামান্য মজুরি পাইতেছে, ব্যবসায়ের সমস্ত লভ্যাংশ বৈদেশিক বণিকেরাই লইয়া যাইতেছে। সুবর্ণ, হীরক, লৌহ, কয়লা, অভ্র, প্রভৃতি খনিজ ও শঙ্খমুক্তাদি জলজ পণ্য রাশি রাশি বিদেশে প্রেরিত হওয়ায় রপ্তানির অঙ্ক অস্বাভাবিক-রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারত মাতার গুপ্ত-ধনভাণ্ডারের সমস্ত রত্নরাশি বিদেশীয়েরা নিঃশেষপূর্বক লইয়া যাইতেছে—আমাদের রত্নগর্ভা বসুন্ধরা ক্রমেই অন্তঃসার-শূন্যা হইয়া পড়িতেছেন। ইহাতে দেশের ভাবী অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে, তাহা ভাবিলেও হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। দেশীয় খনিজ ও জলজ পণ্যের ব্যবসায়ে যদি আমাদের দেশের মূলধন নিয়োজিত হইতে পারে, তাহা হইলে দেশের বাণিজ্য বিস্তারের সহিত আমাদিগের নিঃসন্দেহ ধন বৃদ্ধি পাইত।

যে সকল জাতি ধনৈশ্বর্যে উত্তরোত্তর মহীয়ান হইতেছে, এই প্রণালীতেই তাহাদের ধনবৃদ্ধি পাইতেছে। ইংলণ্ডের খনিজ পণ্য ও কল-কারখানা হইতে প্রস্তুত পণ্যাদি দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া বহু দূরবর্তী ভূভাগ হইতে ধনরাশি সংগ্রহ-পূর্বক স্বদেশে আনয়ন করে। ইহাতে ইংরাজের উৎপাদিত পণ্যাদির কেবল পারিশ্রমিক যে ইংরাজ ভোগ করিতেছেন, আর তাহার লভ্যাংশ, অপরে শোষণ করিয়া লইতেছে, এমন নহে। এজন্যই রপ্তানির ব্যবসায়ে ইংলণ্ডের শ্রীসম্পদৈশ্বর্য বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকাতেও তাহাই ঘটিতেছে। আমেরিকা আপনার গুপ্ত-ধনভাণ্ডার আপনার হস্তেই উদ্ঘাটিত করিতেছে। আপনার বিপুল কৃষিজ ও খনিজ পণ্যাদি আপনাদের ধনে, আপনারা পরিশ্রম করিয়াই উৎপাদন করিতেছে। সুতরাং মার্কিনের পণ্যসামগ্রীও দেশ বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া, বিভিন্ন দেশের ধন আপনার ভাণ্ডারে টানিয়া আনিতেছে। প্রত্যেক দেশেই এইরূপ নিয়মে ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদের যদি তাহাই হইত, তবে নিশ্চয়ই এই সকল অভিনব পণ্যাদির উৎপত্তি ও এই সকল নূতন নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টিতে আমাদেরও জাতীয় ধনভাণ্ডার উত্তরোত্তর পূর্ণ ও স্ফীত হইয়া উঠিত।

কিন্তু এই সকল ব্যবসায়ের দ্বারা ভারতের ধনবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, তাহার দুর্বিসহ ঋণভারই বৃদ্ধি পাইতেছে। দারিদ্র্য বৃদ্ধি হেতু আমাদের মূলধন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু আমাদের রাজা যদি মুসলমানের ন্যায় এদেশে আসিয়া বসতি করিতেন, অথবা ইংরাজ বিদেশে থাকিয়াও যদি বণিক না হইতেন, ভারত-শাসনে ভারতবাসীরা স্বার্থ ও সুবিধাই যদি তাঁহাদের একমাত্র অথবা প্রধান চিন্তার বিষয় হইত, তাহা হইলে বিদেশ হইতে মূলধন ঋণ করিয়া আনিয়াও তাহার দ্বারা অন্য

প্রণালীতে আমাদের দেশের ধন বৃদ্ধির উপায়-উদ্ভাবন সম্ভবপর হইত। ইংলণ্ডের খাতিরে, পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতেই ভারতীয় গবর্নমেণ্ট স্বল্প সুদে যথেষ্ট টাকা ধার করিতে পারিতেন। জাপান তাহাই করিতেছে, অন্যান্য অনেক জাতিও এইরূপ করিতেছে। আমরাও যদি সেইরূপে বিদেশ হইতে টাকা ধার করিয়া আমাদের এই সকল জাতীয় ধনাগমের পন্থা, আপনারা উন্মুক্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই রপ্তানির ব্যবসায়ের দ্বারা আমাদের দেশের ধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত।

ভারতের বাণিজ্যে আমদানি ও রপ্তানির মিল নাই। বহু বৎসরাবধি আমাদের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশী হইতেছে। গত পাঁচ বৎসরের আমদানি ও রপ্তানির হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই ৫ বৎসরের মধ্যে আমরা সর্বশুদ্ধ যত মূল্যের পণ্য আমদানি করিয়াছি, তদপেক্ষা ১১১ কোটি ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের অধিক পণ্য রপ্তানি করিয়াছি। যদি ভারতের বাণিজ্য পূর্বোক্ত স্বাভাবিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে এই ৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের হয় ১১৯ কোটি টাকা পরিমিত ঋণ পরিশোধিত হইত, নতুবা এ পরিমাণ টাকা অপর দেশীয়দিগকে ধার দিয়া আমরা বৎসর বৎসর তাহার সুদ গুণিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের এতদুভয়ের কিছুই হইতেছে না। আমাদের ঋণও শোধ যাইতেছে না। অপরের নিকট আমরা উত্তমর্ণ হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমেরিকাতে রপ্তানি পণ্যের বৃদ্ধির ফলে তাহাই ঘটিয়াছে। এক সময়ে আমেরিকা ইউরোপের নিকট ঋণী ছিল। সেই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমেরিকা প্রতি বৎসর কিয়ৎ পরিমাণে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করিত এখন তাহার ঋণ প্রায় শোধ হইয়া গিয়াছে। এখন আমেরিকা অপরকে টাকা ধার দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমাদের এই উদ্বৃত্ত পণ্য যায় কোথায়? ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৬৭ বৎসর কাল মধ্যে অন্যূন ৭০০,০০,০০০ টাকা মূল্যের উদ্বৃত্ত পণ্য ভারত হইতে বিদেশে গিয়াছে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে ভারত এক কপর্দকও প্রাপ্ত হয় নাই! নব নব পণ্য উৎপাদন করিয়াও ভারতের দারিদ্র্য ঘুচিতেছে না। যাহারা ধনী, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে ব্যবসায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে, প্রধানতঃ ও মুখ্যভাবে, তাহাদেরই ধনাগম হইয়া আসিতেছে। মজুরী করিয়া যাহারা এই সকল ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করে, তাহাদের ধনবৃদ্ধি কখনই হয় না। বরং যাহারা খাটিয়া ধনীর ধন বৃদ্ধি করে, কোনও কোনও স্থলে তাহাদের মজুরি পর্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় লাভ হয় না।

আমাদের ব্যবসায়ে ইংরাজ ধনী, সুতরাং লভ্যাংশ সমস্তই তাঁহাদের। দেশে রেলপথ-বিস্তারের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের যতই বিস্তার হইতেছে, ততই ইংরাজের ধন বাড়িতেছে, আর আমরা ক্রমেই ধনহীন হইতেছি। রেলপথ এদেশের ধন হরণের একটি প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়াছে।

এই সকল কারণে ভারতবাসী দেশে রেলের বিস্তার অপেক্ষা খাল বিলের সমধিক বিস্তার অন্তরের সহিত প্রার্থনা করে। কিন্তু ইংরাজ সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতে অনিচ্ছুক। রেলপথ-বিস্তারের জন্য ইংরাজ প্রজার ৩,১৫,০৪,৭০,০০০ টাকা অপব্যয়িত করিয়াছেন, কিন্তু কৃসিজীবী প্রজার মঙ্গলার্থ তাঁহারা প্রজারই প্রদত্ত কর হইতে এ পর্যন্ত জল-প্রণালী খননের জন্য পূর্ণ ৩০ কোটি টাকাও ব্যয় করেন নাই। জল-পূর্ত বিভাগে অল্প অর্থ ব্যয় করিয়াও গবর্নমেণ্টের যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসরের হিসাবে দৃষ্ট হয়, এই বিভাগে ব্যয় বাদে গবর্নমেণ্টের শতকরা ৭ টাকা লাভ হইয়াছে। এতৎভিন্ন কৃষিজীবী প্রজার যে উপকার হইয়াছে, উচ্চ বেতনভোগী ইংরাজদিগের যে অর্থকষ্ট দূরীভূত হইয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে যখন এদেশে সর্বপ্রথম পূর্তবিভাগ সৃষ্টির প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, তখন অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে রেল ও খালে সমান ব্যয় পড়িবে, কিন্তু খালে বার্ষিক মাইল প্রতি ১১০০ টাকা আয় হইবে, রেলে ১৭৫০ টাকার অধিক হইবে না। দুঃখের বিষয়, তথাপি এই লাভজনক কার্যে রাজপুরুষদিগের সমধিক অনুরাগ দৃষ্ট হইল না। প্রজাকে ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়া রেলের বিস্তারেই তাহারা অসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এখনও তাহাদিগের সে আগ্রহ হ্রাস পায় নাই।

ভারতে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ এক্ষণে ৭২,৬০,০০,০০০ বিঘা ও কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩২,১৩,০০,০০০ বিঘা। কর্ষিতভূমির মধ্যে কেবল ৬ কোটী বিঘা জমি সরকারী জল-পূর্ত বিভাগ হইতে সেচনোপযোগী জল প্রাপ্ত হয়। জল-প্রণালীর নির্মাণেও (যেখানে সে সুবিধা নাই, তথায়) তড়াগ-সরোবরাদির খনন-কার্য্যে যদি গবর্নমেণ্ট রেল বিভাগের ন্যায় অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে এদেশের কৃষকেরা পাশ্চাত্য দেশবাসীদিগের মত বৃষ্টি নিরপেক্ষ হইয়াও প্রভূত শস্য উৎপাদনে সমর্থ হইত; দেশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বিশেষ অনুভূত হইত না। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এদেশে দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহার রিপোর্টেও এই কথা স্বীকৃত হইয়ছে। মহীশূর রাজ অধিক পরিমাণে খাল-খননে যত্নশীল, এই কারণে তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অল্প। যে সকল দেশে খাল বিলের সংখ্যা অধিক সে সকল প্রদেশে বিগত দুর্ভিক্ষ-সমূহে লোকের কষ্ট, অন্যান্য

প্রদেশের তুলনায় অতি সামান্যই হইয়াছিল, একথাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট পাঠের পরও জল-পূর্ত বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সমধিক মনোযোগী হন নাই। ১৮৮২ খৃঃ হইতে ১৮৯৮ অব্দ পর্যন্ত রেলপথ-নির্মাণে ও জলাশয়াদির খননে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার অঙ্কে দৃষ্টি পাত করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। গবর্ণমেণ্ট ঐ ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে জল-পূর্তের জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, রেলপথ নির্মাণের জন্য তাহার অপেক্ষা সাত গুণ অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। পৃথিবীর কোনও কৃষিপ্রধান দেশেই জল-পূর্ত বিভাগে রাজার এরূপ নিন্দনীয় ব্যয়-কুণ্ঠা দৃষ্টিগোচর হয় না।

কৃষকেরা ক্ষেত্রে জল সেচনের সুবিধা পাইলে কেবল তাহাদিগেরই যে উন্নতি সাধিত হয়, দেশ ধনধান্যে পূর্ণ হয়, তাহা নহে, গবর্ণমেণ্টকেও দুর্ভিক্ষকালে প্রজার খাজনা রেহাই দিয়া ও অন্নসত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া রাজকোষ শূন্য করিতে হয় না। বিলাতী বাণিজ্যের প্রসার—বৃদ্ধির দিক দিয়া দেখিলেও কৃষক সমাজের ধন বৃদ্ধিতে ইংলণ্ডীয় বণিক-সম্প্রদায়ের লাভ নিতান্ত সামান্য নহে। ভারতের বিগত দশ বৎসরে আমদানি রপ্তানির হিসাব দেখিলে জানা যায় যে, ভারতবাসী গড়ে প্রতিজনে ইংলণ্ডের নিকট হইতে বার্ষিক তিন শিলিং বা ২.২৫ টাকার মাল ক্রয় করিয়াছে। ইহার মধ্য হইতে বড়লোকদিগের ও নগরবাসীর সংখ্যা বাদ দিলে দৃষ্ট হয় যে, প্রায় ১৭,১০,০০,০০০ কৃষি-শিল্পজীবী বিলাতি দ্রব্য ক্রয়ার্থ বৎসরে গড়ে দুই পয়সার অধিক ব্যয় করিতে পারে নাই। কৃষক-সম্প্রদায়ের দারিদ্র্যের ইহা অপেক্ষা ভীষণ নিদর্শন আর কি হইতে পারে? ভারতীয় কৃষিজীবী প্রজার অবস্থা যদি সচ্ছল হয়, তাহাদিগকে যদি গড়ে দুই আনা মূল্যের বিলাতী সামগ্রীক্রয়েরও সামর্থ জন্মে, তাহা হইলে ইংলণ্ডীয় বণিকদিগের আয় ভারতীয় বাণিজ্য-সূত্রে কি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায় না? ক্যানেডার অধিবাসিগণ এরূপ ধনশালী যে, তাহারা ইংলণ্ডের নিকট হইতে গড়ে প্রতি জনে বৎসরে পাঁচ পাউণ্ড বা ৭৫ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। ভারতবাসী যদি ক্যানেডাবাসীর ন্যায় ধনশালী হইবার সুবিধা পাইত, তাহা হইলে ভারতীয় বাণিজ্যে ইংলণ্ড বার্ষিক ২২৫০,০০,০০,০০০ টাকার লাভ করিতে পারিতেন। ইহাতে ইংলণ্ডের গৌরব ও শক্তি কতদূর বৃদ্ধি পাইত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু মিঃ থ্যাকারের প্রেতাত্মা যতদিন রাজপুরুষদিগের স্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ না হইবে, ততদিন তাঁহারা এই সকল সত্যের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

রাজপুরুষেরা কেবল যে কৃষকের দুরবস্থার প্রতি অমনোযোগী হইয়া তড়াগ-সরোবরাদির খনন-কার্যে ব্যয়-কুণ্ঠতা প্রকাশ করিতেছেন তাহা নহে, তাহারা

প্রজার নিকট জলকর আদায় কার্যেও স্থান বিশেষে অবৈধ কঠোরতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিগত ১৩০৭ সালে মাদ্রাজ গবর্নমেণ্ট আইন করিয়াছেন যে, যাহাদের ক্ষেত্রের নিকট দিয়া জল-প্রণালী গিয়াছে, তাহারা জল ব্যবহার করুক আর না করুক, তাহাদিগকে জলের কর দিতেই হইবে। কৃষিজীবী প্রজার পক্ষে ইহার অপেক্ষা অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? আশ্চর্যের বিষয়, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্নমেণ্ট সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহার দশ বৎসর পরে বোম্বাই গবর্নমেণ্ট এই প্রকার ন্যায়-বিরুদ্ধ আইন পাস করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তদানীন্তন ভারত সচিব মহোদয়ের অনুগ্রহে উভয় গবর্নমেণ্টেরই প্রস্তাব নামঞ্জুর হয়। কিন্তু বিগত ১৮৯৭ সালের ঘোর দুর্ভিক্ষের পরও যখন মাদ্রাজ গবর্নমেণ্ট জলকর আদায় সম্বন্ধে সাধু-জন-বিগর্হিত বিধানের প্রণয়ন করিলেন ও বিলাতের কর্তৃপক্ষ তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না, তখন অন্যান্য প্রদেশের প্রকৃতিপুঞ্জের মস্তকেও সহসা মাদ্রাজের ন্যায় অকারণে বজ্রাঘাত হইবে না, ইহা কেহই সাহসপূর্বক বলিতে পারেন না।

রেলপথের বিস্তার অপেক্ষা খাল খননের জন্য কর্তৃপক্ষ যদি সমধিক মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে দেশের এরূপ দারিদ্র্য কখনই বৃদ্ধি পাইত না, সমাজের নানা শ্রেণীর লোকের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত, সন্দেহ নাই। কারণ প্রথমতঃ রেলপথের বিস্তারে যেরূপ নানাসূত্রে প্রভূত অর্থ দেশান্তরিত হয়, জল-পূর্তে সেরূপ হয় না, ব্যয়িত অর্থের প্রায় সমস্তই দেশীয় শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের ও স্থপতিদিগের হস্তগত হয়। বিগত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশ বৎসরে বিলাত হইতে প্রায় ৪৫৮,০০,০০,০০০ টাকার রেলপথ নির্মাণের উপকরণ এদেশে আসিয়াছে। এই পর্বত প্রমাণ অর্থরাশি বৈদেশিক শিল্পীদিগের হস্তগত হইয়াছে। ভারতবর্ষে রেলের অপেক্ষা খালের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে এত টাকা কখনই বিদেশে যাইত না। পক্ষান্তরে এই টাকার অর্ধাংশ খাল-খননে ব্যয়িত হইলে দেশের কৃষকদিগের ও কৃষিকার্যের প্রভূতি উন্নতি সাধিত হইতে পারিত।

দ্বিতীয়তঃ খাল বিলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে জলপথে মালের আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পায়, তাহাতে বহু সংখ্যক লোক নৌকা-বাহন করিয়া জীবিকা নির্বাহের ও অর্থ-সঞ্চয়ের সুবিধা প্রাপ্ত হয়। যদি রেলপথের পরিবর্তে ক্ষুদ্র বৃহৎ সঙ্কীর্ণ ও বিস্তীর্ণ জল-প্রণালীর দ্বারা ভারতের এক প্রদেশের সহিত অপর প্রদেশের যথা সম্ভব সংযোগ-সাধনের চেষ্টা করা হইত এবং বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যবর্তী প্রদেশ-সমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেল লাইন (trunk lines) নির্মাণ করা হইত তাহা হইলে ভারতবাসী আজ অন্তরের সহিত ইংরাজের ধন্যবাদ করিবার অবসর পাইত। এরূপ ব্যবস্থায়

যুগপৎ লোকের গমনাগমনের সৌকর্য ও দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারিত। যে টাকা এখন বিদেশী কোম্পানির অংশিগণ পাইতেছেন, নৌকা-ব্যবসায়ী দেশীয় মহাজনেরা সেই টাকা পাইতেন। ডাক্তার বুকাননের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাটনা হইতে নৌকাযোগে কলিকাতায় মাল পাঠাইতে ১২ হইতে ১৫ টাকার অধিক ব্যয় পড়িত না। জল-প্রণালীর সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত নৌকার সংখ্যা ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইলে নৌকার ভাড়া আরও কমিয়া যাইত, সন্দেহ নাই। এখনও ব্যবসায়ীরা রেল অপেক্ষা নৌকায় মাল প্রেরণ অধিক সুবিধাজনক মনে করিয়া থাকেন।

তৃতীয়তঃ প্রাচীন নৌ-শিল্পীদিগের জীবিকা-লোপ হইত না; বরং বাণিজ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নৌকার নির্মাণ দ্বারা জীবিকার্জনকারীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইত। কিন্তু রেলের বিস্তারে এদেশে নৌ-নির্মাণ-বিদ্যার বহুল অবনতি সাধিত হইয়াছে। ইংরাজও চেষ্টা-পূর্বক এদেশের অন্যান্য শিল্পের ন্যায় নৌ-নির্মাণ-শিল্পের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছেন। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত এদেশে এরূপ সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য অর্ণবপোতসমূহ নির্মিত হইত যে, তদ্দর্শনে বহু পাশ্চাত্য জাতির হৃদয়ে হিংসার উদ্রেক হইত। যে কলিকাতার বন্দর এক্ষণে বৈদেশিক পোত-শ্রেণীতে পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তথায় বহু সংখ্যক দেশীয় শিল্পীর নির্মিত বড় বড় অর্ণবপোত শোভা পাইত। ঢাকায়, সপ্তগ্রামে ও চট্টগ্রামে অতি প্রাচীনকাল হইতে উৎকৃষ্ট জাহাজ নির্মিত হইত, তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি মহোদয় এ অব্দের প্রারম্ভে বিলাতের কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে,—

The port of Calcutta contains about 10.000 tons of shipping, built in India, of a description calculatin for the conveyance of cargoes to England. . . . From the quality of private tonnaga now at command in the port of Calcutta, from the *state of perfection which the art of ship-building has already attained in Bengal* (*promising still more rapid progress*...) it is certain that this port will always be able to furnish tonnage to whatever extent may be required for conveying to the port of London the trade of the private British merchants of Bengal.

বঙ্গদেশে পোত-নির্মাণ বিদ্যা যখন ঈদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তখন বোম্বাই অঞ্চলে নির্মিত পোত-সমূহও বিলাতী জাহাজ অপেক্ষা বহু গুণে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীই সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্র দেশে নৌ-নির্মাণ

শিল্পকে বিশেষ উৎসাহ দান করিয়া উহার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। মোগলদিগের চেষ্টাতেও এ দেশে নৌনির্মাণ-বিদ্যা সামান্য উন্নতি লাভ করে নাই। পেশওয়েগণের আমলে মহারাষ্ট্রীয় শিল্পি-কুলের নির্মিত পোতাদি সাধারণের বিশেষ প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। বিজয়দুর্গ, কোলাবা, সিন্ধুদুর্গ, রত্নগিরি, অঞ্জনবেল প্রভৃতি বন্দরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমর-পোত নির্মাণের "ডক" ছিল। মহারাষ্ট্র নৌ-সেনাপতি আঙগ্রের তত্ত্বাবধানে নির্মিত এক একখানি জাহাজে চারি শত টন বা ৮,০০০ হন্দর পর্যন্ত মাল বোঝাই হইত। তদ্ভিন্ন রণপোত-সমূহে ১৬ হইতে ৭৪টি পর্যন্ত বড় বড় তোপ সুসজ্জিত থাকিত। অন্যতম নৌ-সেনানী আনন্দ রাও ধুলপের তত্ত্বাবধানে ৫০ খানি বৃহৎ রণপোত ছিল। তাহাতে তিন শত বড় বড় কামান সর্বদা সাজান থাকিত, প্রত্যেক জাহাজে ৩।৪ শত সৈনিক অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ করিত। সেকালের ইংরাজ ও পোর্তুগীজদিগের রণতরী-সমূহও উল্লিখিত রণপোত-সমুহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত।

লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল এ. ওয়াকার মহোদয়ের ১৮১১ খৃষ্টাব্দে লিখিত Considerations on the affairs of India নামক পুস্তক এ বিষয়ের যে বিস্তারিত বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহার ৩১৬ পৃষ্ঠা হইতে কয়েক পঙক্তি এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

It is calculated that every ship in the navy of Great Britain is renewed every 12 years. It is well known that teak-wood-built ships last 50 years and upwards. Many ships Bombay-built, after running 14 to 15 years, have been bought into the navy and considered as strong as ever. The *Sir Edward Hughes* performed, I believe, eight voyages as an Indiaman before she was purchased for the navy. No Europe-built ship is capable of going more than six voyages with safety.

এই বর্ণনা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেকালের বিলাতী জাহাজগুলি ১২ বৎসর ব্যবহারের পর নৌ-সেনা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট অকর্মণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বোম্বায়ের সেগুন কাষ্ঠে নির্মিত দেশীয় জাহাজ পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত প্রায় অবিকৃত থাকিত। ১৪।১৫ বৎসর কাল ব্যবহৃত দেশীয়-অর্ণব-পোতসমূহও বিলাতে নৌ-সেনা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ অতীব আগ্রহের সহিত কিনিয়া লইতেন। ইউরোপে নির্মিত পোতনিচয় ছয় বার ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ গমনাগমন করিলেই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া উঠিত, কিন্তু দেশীয় জাহাজ আট বার সমুদ্রে ঘুরিয়া আসিয়াও নূতনের মত থাকিত এবং ইংলণ্ডীয় নৌ-বিভাগে সাদরে ক্রীত হইত।

ওয়াকার মহোদয় আরও বলেন,—ভারতীয়-অর্ণবপোতসমূহ এরূপ সুদৃঢ় হইলেও উহাদিগের নির্মাণার্থ, ইউরোপের তুলনায় অনেক অল্প ব্যয় হয়। বিলাতে যেরূপ জাহাজ সহস্র মুদ্রায় নির্মিত হয়, ভারতে ৭৫০ টাকায় তদপেক্ষা চতুর্গুণ উৎকৃষ্ট পোত নির্মিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডীয় পোত অধিক ব্যয়ে রচিত হইয়াও বার বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় না। কিন্তু ভারতীয় অর্ণবযানসমূহ অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে নির্মিত হইলেও ৫০ বৎসরেরও অধিককাল অবিকৃত থাকে। এই কারণে ভারতে নৌ-নির্মাণের কর্মশালা প্রতিষ্ঠা করিলে ইংলণ্ডের বহু পরিমাণে ব্যয়-লাঘবের সম্ভাবনা।"

ওয়াকার মহোদয়ের এই উপদেশ যদি পালিত হইত, তাহা হইলে যুগপৎ ইংলণ্ডের উপকার ও ভারতীয় নৌ-নির্মাণ বিদ্যার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কর্তৃপক্ষ এই বিজ্ঞ কর্মচারীর উপদেশ অনুসারে কার্য করিতে সম্মত হইলেন না। যে কারণে ভারতীয় পোত রচনা-বিদ্যার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, তাহা মিঃ টেলার প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ২১৬ পৃষ্ঠার পশ্চাল্লিখিত অংশ পাঠ করিলেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

The arrival in the port of London of Indian produce in Indian-built ships created a sensation among the monoplists which could not have been exceeded if a hostile fleet had appeared in the Thames. The ship-builders of the port of London took the lead in raising the cry of alarm, they declared that their business was on the point of ruin and that the families of all the ship-wrights in England were certain to be reduced to starvation.

ভাবার্থ—ভারতবর্ষে নির্মিত পোতসমূহ ভারতীয় পণ্যসামগ্রী লইয়া যখন লণ্ডনের বন্দরে উপস্থিত হইল তখন বিলাতের একাধিপত্য-কামী শিল্প-ব্যবসায়ী সমাজে ভয়ঙ্কর হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। এই ঘটনায় বিলাতের জনসমাজ যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, শত্রুসৈন্য কতিপয় রণতরী লইয়া সহসা টেম্‌স নদীতে আবির্ভূত হইলেও বোধ হয় তদপেক্ষা অধিকতর বিচলিত হইত না। লণ্ডনের পোত-নির্মাণ-কারীরা ভয়সূচক চীৎকারে চারিদিক কম্পিত করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—"আমাদিগের ব্যবসায় এইবার মাটি হইল! বিলাতের সমস্ত নৌ-শিল্পীদিগকে এইবার নিশ্চিত সপরিবারে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"

শিল্পীদিগের এইরূপ আর্তনাদে ও আন্দোলনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বদেশ-ভক্ত সদস্যেরা আত্মবিস্মৃত হইলেন। স্থির হইল, শ্বেতাঙ্গ শিল্পীর মঙ্গলের জন্য ভারতীয় কৃষ্ণাঙ্গ শিল্পীর অন্নে ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে; ভারতবর্ষ হইতে

উৎকৃষ্ট উপকরণসমূহ বিলাতে লইয়া গিয়া বিলাতী কারিকরের দ্বারা পোত-নির্মাণ করাইতে হইবে। এই সময়েই ভারতীয় মুসলমান লস্করদিগের জীবিকা-হরণেরও ব্যবস্থা হয়। সে ব্যবস্থার আংশিক পরিচয় ইতঃপূর্বে ৩৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডে তখন "ওক" কাষ্ঠে জাহাজ নির্মিত হইত। কিন্তু তদবধি সেগুন কাষ্ঠে নির্মিত হইতে লাগিল। এখনও জাহাজ নির্মাণের জন্য এ দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ সেগুন কাষ্ঠ প্রতিবৎসর বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

রেল ও খাল

এইরূপে কেবল যে, সমুদ্রগামী বৃহৎ পোত নির্মাণের বিদ্যাই ভারতবর্ষ হইতে এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলযান-নির্মাণ করিবার কৌশলও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও আরব্যোপসাগরের উপকূলে সহস্র সহস্র ভারতীয় শিল্পীর নির্মিত জলযান পণ্যসামগ্রী বহন করিত, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এই কার্য করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। সুসভ্য ইংরাজের সংসর্গে ভারতের নৌ-নির্মাণ ব্যবসায় বিস্তার লাভ করিবে, বিজ্ঞানবিদ্ ইংরাজের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ভারতবাসী সেই শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তদ্বিপরীত ফলের উৎপত্তি হইয়াছে। সরকারি (Statistical) Abstract of British India) ও বেসরকারী (O'Conor's Trade Report) কাগজপত্র হইতে নিম্নে চারিটি বৎসরে পণ্যবহন কার্যে যতগুলি দেশীয় সমুদ্রযান নিযুক্ত ছিল, তাহাদের সংখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে ভারতীয় নৌ-শিল্পের বর্তমান অবস্থা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সাল	নৌ সংখ্যা
১৮৫৭	৩৪,২৮৬
১৮৯৯	২,৩০২
১৯০০	১,৬৭৬
১৯০১	১,০৪৯

ইহাতে কত লোক যে জীবিকাশূন্য হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? ইংরাজ যদি সহৃদয়তা প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় শিল্পিকুল নৌ-নির্মাণ বিদ্যায় পাশ্চাত্য শিল্পীদিগকে পরাস্ত করিতে পারিত, সন্দেহ নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আমাদের দেশের নৌ-শিল্পের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা শুনুন.—

The correct forms of ships—only elaborated within the past ten years by the science of Europe—have been familiar to India for ten centuries. *Notes on India* Dr. Buist (Bombay).

বিগত জানুয়ারি মাসের The Indian Textile Journal-পত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির জামালপুরস্থিত এঞ্জিনের কারখানার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি।

The finished locomotive, as we see it the paint shop in its new decorations, ready to take its place upon the Indian railway, is *the best epitome of the capability of the native Indian craftsman.* If he can build an E. I. R. Co.'s locomotive under European supervision from start to finish, he can build any thing ……The pro-verbial laziness of the Indian worker is not to be discerned in the busy shops of Jamalpur and the best evidence of Indian capacity for when properly directed and instructed, is to be found in the "Lady Curzon" the new E. I. Railway express locomotive.

যদি জামালপুরের কর্মশালায় ভারতীয় শিল্পী এঞ্জিন নির্মাণের কার্য প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে নৌ-শিল্পের উন্নতি-সাধনে তাহারা যে অসমর্থ হইবে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু এ সকল উন্নতি-সাধনে রাজশক্তির অনুকূলতা আবশ্যক। রাজশক্তির আনুকূল্য লাভ না করিলে, শ্যাম, জাপান ও জার্মানি শিল্প বাণিজ্যে ঈদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় রাজশক্তি দেশীয় শিল্পোন্নতির প্রতিকূল। তাই ভারতের বহু শিল্পের বিলোপ ঘটিয়াছে, প্রজাকুল অন্নের কাঙ্গাল হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় শিল্পকুশল বিজ্ঞানবিৎ সভ্যজাতির সংস্রবে ভারতবর্ষের শিল্পকলা-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিবে, না, তাহার সমূল উচ্ছেদ ঘটিল!

ভারতের বাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্ট-সমূহে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, বিগত ১৮৩৪।৩৫ সাল হইতে ১৯০২।১৯০৩ সাল পর্যন্ত এদেশে ২৪৪৪,৫০,১০,৬৫৬ টাকার মাল আমদানি ও এদেশ হইতে ৩০৩৪,৩২,৪৭,৪৪৪ টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে। বিগত ৬৫ বৎসরে এই ৫৪৭৮,৮২,৫৮,১৯০ টাকার পণ্যজাত বৈদেশিক নৌ-ব্যবসায়িগণ দেশ-দেশান্তরে বহন করিয়া যে অর্থ উপার্জন করিয়াছে, তাহার অধিকাংশ যদি এদেশের নৌ-শিল্পের মস্তকে ইংরাজ বজ্রাঘাত না করিতেন তাহা

হইলে এই দেশের লোকেরাই পাইত, সন্দেহ নাই। ইহার উপর যদি মহাজনের লাভের হিসাব শতকরা দশ টাকা হিসাবে ধরা যায়, তাহা হইলে, বিগত শতাব্দীর বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় মহাজনেরা বিশুদ্ধ লভ্যাংশ ন্যূনাধিক ৮০০,০০,০০,০০ টাকা পাইতে পারিতেন। নৌ-শিল্পের বিলোপে এখন এ সমস্ত আয়ই বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের হস্তগত হইয়াছে, ভারতবাসী অর্থহীন পথের ভিক্ষুক হইয়া উঠিয়াছে।

পুরাতন কূপ-তড়াগাদির সংস্কারে যথোচিত মনোযোগ প্রকাশ করিলেও গ্রামে বর্ষাকালীন জল-সঞ্চয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু এদিকেও কর্তৃপক্ষ অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত! কাজেই অধিকাংশ পুষ্করিণী মজিয়া গিয়া লোকের জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। লর্ড লিটনের আমলে যখন রাজ্যের ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, তখন দেশের পুষ্করিণী প্রভৃতির সংস্কারের জন্য প্রতি বৎসর যে অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ হ্রাস করিলে কত যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইতে পারে, ভারত গবর্নমেণ্ট, তাহা প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট সমূহের নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তখন রেল বিভাগের ব্যয় লাঘবের কথা তাঁহাদিগের মনে পড়িয়াছিল কি? ফলতঃ জলাশয়াদির সংস্কারে কর্তৃপক্ষ অমনোযোগ করায় দেশের অনেক স্বল্প-পরিসর নদী, বিল ও খাল ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতেছে। ম্যালেরিয়াদি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি ও দেশের মৎস্য বংশ-লোপের ইহাই প্রধান কারণ।

ফলকথা, ভারতে রেলপথের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি না করিয়া যদি ইংরাজ, জল-প্রণালী ও তড়াগ-সরোবরাদির সংখ্যাবর্ধনে সমধিক মনোযোগ করিতেন, তাহা হইলে ভূমি উর্বরা ও কৃষক-সম্প্রদায় অর্থাৎ শতকরা ৮৫ জন ভারতবাসী সমৃদ্ধ হইতে পারিত, প্রাচীন নৌ-বাহী, নৌ-ব্যবসায়ী, ও নৌ-শিল্পীদিগের বিলোপ না ঘটিয়া শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারিত। ইংলণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বন্ধুর দেশের পক্ষে রেল যেরূপ সুফলপ্রদ, ভারতের ন্যায় বিশাল ও প্রায় সমতল দেশের পক্ষে সেরূপ নহে,—এ কথা রাজপুরুষেরা অদ্যাপি বুঝিলেন না, অথবা বুঝিয়াও বিলাতের লৌহ ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থ-রক্ষার জন্য জল-পূর্তের পরিবর্তে লৌহবর্ত্মের বিস্তারে সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। ইহার পরিণাম কিরূপ ভীষণ হইয়াছে, বিগত অক্টোবর মাসের Asiatic Ouarterly Review পত্রে জেনারেল ফিশার (General J. H. Fischer,R.E) নামক একজন ইংরাজ লেখক সরল ভাষায় এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

No words could have better described the railway administration in India during the past half Century; the advocates of this system have never ceased to din into the

ears of the public in England "the incalculable benefits" the railways have conferred on India, without producing the shadow of evidence to support their assertions. *Those works of extreme utility,* without which it is impossible to make land of any country valuable, have been entirely neglected, being too mean and paltry for the consideration of such very great minds; and the results have been that the country has been brought to the verge of ruin and its whole population are in the most pitiable condition of hopeless poverty, misery and desolation.

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ভারত গবর্নমেণ্টের ভূমি রাজস্ব-বিষয়ক নীতির দোষ প্রদর্শন করিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ-স্বরূপ ভারত গবর্নমেণ্ট ও মাদ্রাজের রাজস্ব-সচিব মহাশয় দুইখানি গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন, এ কথা অনেকের বিদিত থাকিতে পারে। সেই দুই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে জেনারেল ফিশার মহোদয় বলিয়াছেন,—

Examine these documents through and through, and you will not find one word in then to show that the slightest attention whatever has ever been paid by any one of the revenue authorities towards promoting the real weath of the country by any one of those means which Adam Smith and and all modern authorities agree in declaring every country must be provided with, to make its land and labour as productive as possible......

There is, we fear very little excuse for us in this matter: "*We knew the good and chose to follow the evil*", and "we have reaped as we have sown. The awful famines which have so frequently prevailed in India, accompanied with plague, cholera and pestilences, are the just judgments of God upon us for neglecting the interests of all the subjects placed under us by Him......

এখনও যদি ইংরাজ সহৃদয়তা প্রকাশ করেন, রেলের জন্য আর অর্থ ব্যয় না করিয়া কৃষিকার্যকে বৃষ্টি নিরপেক্ষ করিবার জন্য সমগ্র শক্তি ব্যয়িত করেন, তাহা হইলেও ভারতীয় প্রজার দুর্দশা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে, দেশবাসীর ধন-বলবৃদ্ধির সহিত ইংলণ্ডের ভারতীয় বাণিজ্যেরও প্রসার বৃদ্ধি হইতে পারে।

বঙ্গীয় শিল্পি-কূলের সর্বনাশ

দেশের দারিদ্র্য-বৃদ্ধির সহিত দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িতেছে। কৃষক সমাজের ঘোর অন্ন কষ্ট ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের জীবিকার্জনের পথ কণ্টকাকীর্ণ দেখিয়া দেশীয় শিল্পের উৎকর্ষ-সাধন-কল্পে কেহ কেহ বিশেষভাবে মনোযোগ করিয়াছেন। ইহা শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই।

অনেকের বিশ্বাস, বিলাতে বাষ্পীয় বলে পরিচালিত যন্ত্রাদির উদ্ভাবন হওয়াতেই এ দেশের শিল্পীর গৌরব হ্রাস পাইয়াছে। বাষ্পীয় যন্ত্রে জাত পণ্যের সহিত হস্তকৌশলে নির্মিত শিল্প-সামগ্রী প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হওয়াতেই ভারতীয় শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। এই ধারণার বশবর্তি হইয়া অনেকেই এ দেশীয় শিল্পিকুলের নিন্দায় অগ্রসর হন, তাহারা শিল্পকার্যে বাষ্পীয় যন্ত্রাদির সহায়তা গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী, তাঁহারা দেশীয় শিল্প-নাশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত অবগত নহেন। বিজ্ঞানানুমোদিত যন্ত্রাদির সহিত প্রতিযোগিতায় যে এ দেশের শিল্পীদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে বিপন্ন হইতে হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পি-সমাজে যে বিষম দুর্দিনের উদয় হইয়াছে, তাহার অন্যবিধ গুরুতর কারণ আছে। এ স্থলে সেই কারণের আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারতবর্ষীয় শিল্প-নাশের সর্বপ্রধান কারণ ইংরাজের অত্যাচার ও অপরিমেয় স্বার্থপরতা। ইংরাজ এদেশে বণিগ্ বেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কাজেই এ দেশের বাণিজ্যে একাধিপত্য লাভের বাসনা তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বভাবতই বলবতী হইয়াছিল। এই বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা যে সকল অবৈধ ও লোমহর্ষণ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন. তাহা শ্রবণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে বিলাতের একদল ব্যবসায়ী ৭০ হাজার পাউণ্ড (বা সে সময়কার হিসাবে ৭ লক্ষ টাকা) মূলধন লইয়া ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য প্রথম পদার্পণ করেন। এই ব্যবসায়ীর দল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে পরিচিত। প্রায় একশত বৎসর কাল মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে ব্যবসায় চালাইয়া ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ইহারা বঙ্গদেশে কলিকাতা ক্রয়-পূর্বক তথায় একটি বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। ভারতবাসীর নিকট এই পাশ্চাত্য বণিকদিগের যে মূর্তি প্রথমে প্রকাশিত হয়, ৩৬ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইহারা ব্যবসায়ের ও প্রতিপত্তি-লাভের সুবিধার জন্য মুখে বড় বড় নীতিকথার প্রচার করিলেও—

From the outset the Company maintained the strictest principles of monopoly......They contrived to make some

money to establish themselves as colonists in several important places, to commit an *infinity of misdemeanours* of various degrees of enormity upon friends and foes.—*Empire in Asia* by W. M. Torrens.

কার্যতঃ সর্বপ্রকার নীতি বিগহিত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া অর্থ-সংগ্রহে পরম আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তজ্জন্য শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সমান দুর্ব্যবহারে বিরত হইতেন না। ব্যবসায়ে একাধিপত্য রক্ষার প্রতি ইহাদিগের পূর্বাবধি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তদানীন্তন মোগল সম্রাট অওরঙ্গজেবের নিকট এই সকল দস্যুবৃত্ত পাশ্চাত্য বণিকদিগের কীর্ত্তিকলাপ অগোচর রহিল না। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ মাত্রে সুরাট হইতে ইংরেজরা নিষ্কাশিত হইলেন, তাঁহাদের ধৃষ্ট কর্মচারিগণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন; বোম্বাই, মছলীপত্তন ও ভিজিগাপত্তন প্রভৃতি ইংরাজের বাণিজ্য-কেন্দ্র-সমূহ অধিকৃত হইল, ইংরাজ বিষম বিপন্ন হইলেন। পরিশেষে তাঁহারা নিতান্ত দীনভাবে (most abject) পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ও ১,৫০,০০০ টাকা জরিমানা দিয়া অব্যাহতিলাভ করিলেন। অওরঙজেব ভাবিলেন,—ইংরাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, তাহাদিগের শক্তি প্রায় নির্মূল হইয়া গিয়াছে, আর তাহারা মস্তকোত্তোলন করিতে পারিবে না। এইরূপে সম্রাটের উদারতায় ইংরাজ পুনর্বার বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

অওরঙজেবের পৌত্রের নিকট হইতে ইংরাজেরা নানা কৌশলে এদেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এই অধিকারের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পণ্যাদি আমদানি রপ্তানির মাশুল না দিয়াও বঙ্গদেশের নানাস্থানে প্রেরিত হইত। বলা বাহুল্য, কোম্পানির ব্যবসায় তখন বড় অধিক বিস্তৃত ছিল না। কিন্তু কোম্পানির ভৃত্যগণ বাদশাহী সনন্দের ও কোম্পানির নামের দোহাই দিয়া, যাহাকে তাহাকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার পরোয়ানা বিক্রয়পূর্বক আত্মোদর পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে দেশের লোকের স্বাধীন বাণিজ্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। বঙ্গেশ্বরও ন্যায্য শুল্কলাভে বঞ্চিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ইংরাজ বণিকের কল্যাণে সর্বপ্রথম বঙ্গীয় রাজকোষের ও দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের ক্ষতি আরব্ধ হইল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর এদেশে ইংরাজের প্রতিপত্তি বাড়িল। ইংরাজেরা মীরজাফরকে প্রথমে নবাব করিয়া পরে স্বপ্রয়োজনানুরোধে পদচ্যুত করিলেন। মীরজাফরের পর মীরকাশিমের প্রতি তাঁহারা বিশেষ সদয় হইলেন।

ফলে তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাইতে লাগিল। তিনি নামে নবাব হইলেন, ইংরাজেরা প্রায় সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মীরকাশিম নিতান্ত দুর্বলচিত্ত ছিলেন না। দেশে ইংরাজের যথেচ্ছাচার তিনি সহিতে পারিলেন না। দরিদ্র প্রজার কষ্ট মোচন করিতে গিয়া তাঁহাকে ইংরাজের কোপানলে ভস্মীভূত হইতে হইল। মীরজাফর আবার নবাবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইংরাজেরা আবার অকথ্য অত্যাচারে বাঙ্গালীকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। লোকের সর্বস্ব অপহরণই সে সময়ে ইংরাজদিগের এদেশ শাসনের মূলমন্ত্র ছিল।

পলাশীতে যুদ্ধাভিনয়ের পর হইতে বঙ্গে ইংরাজের যেমন প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল, তেমনই তাঁহারা বাণিজ্যের স্বত্ব বলপূর্বক বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোম্পানির ভৃত্যেরা তাঁহাদিগের প্রভুর জন্য অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পাইয়া প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ব্যক্তিগত ব্যবসায় বিনা শুল্কে এদেশে চালাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। প্রথমে এই কার্য গোপনে সম্পাদিত হইত। বঙ্গের হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলা এই অবৈধ বাণিজ্য-ব্যাপারে বাধা প্রদান করিতে গিয়া ইংরাজের বিষ নয়নে পতিত হন। সুচতুর ইংরাজ সেকালের কতিপয় অদূরদর্শী বঙ্গীয় কূটনীতি-পরায়ণ ব্যক্তির সাহায্যে সিরাজকে পদচ্যুত ও নিহত করাইয়া আপনাদিগের অবাধ বাণিজ্য-বিস্তারের পথ নিষ্কণ্টক করিলেন।

এই প্রসঙ্গে কোনও সহৃদয় লেখক বলিয়াছেন—যেদিন হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলা রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া ফকিরের বেশে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিন হইতে ভারত লুণ্ঠন আরব্ধ হইল। মীরজাফর, ক্লাইব ও অন্য কয়েকজন ইংরাজ, আমীর বেগ্‌খাঁ, নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ একত্র হইয়া মুরশিদাবাদের ধনাগারে প্রবেশপূর্বক ধনবিভাগ করিতে লাগিলেন। কলিকাতাস্থ কাউন্সিলের ইংরাজ সদস্যগণ ১২,৮০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্‌ভিন্ন ক্লাইভ গোপনে ১৬,০০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করিলেন। ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রায় এক কোটি টাকা দিতে হইল। বাঙ্গালীর ভাগ্যে চিরকালই পাত্রাবশিষ্ট; সুতরাং বাঙ্গালী বণিকদিগকে পিতৃ শ্রাদ্ধের ভিক্ষার ন্যায়, বিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হইল। ইংরাজ সৈনিকগণ প্রায় প্রত্যেকেই নবদ্বীপের পণ্ডিতের ন্যায়, ছলে বলে ষোল আনা বিদায় প্রাপ্ত হইলেন, আর সিপাহীরা ও দেশীয় অন্যান্য সকলেই রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধের গড় বিদায়ের ন্যায় কিছু কিছু লাভ করিতে লাগিল। এই ধন বিভাগের মধ্যে ইংরাজ পক্ষ হইতে বিশ্বাসঘাতকতা ও নৃশংসতাময় ব্যাপার যথেষ্ট ঘটিয়াছিল। কোম্পানির ভৃত্যগণের অর্থ পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য ভারতের কত ধনী দরিদ্র হইয়া পড়িলেন, আবার তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গগণের সদৃশ-প্রকৃতি

কত নিম্নশ্রেণীর লোক সহসা সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। যেরূপে ইহাদের নিষ্ঠুর ব্যবহারে আর্য সন্তানদিগের কোমল হৃদয় ক্রমে পাষাণবৎ কঠিন হইয়া উঠিল, যেরূপ ইহাদের অসৎ দৃষ্টান্তে ভারতবাসী অপরিজ্ঞাতপূর্ব নানাবিধ ধূর্ততা, শঠতা ও বীভৎস পাপাচারের অনুষ্ঠান করিতে শিখিল, তাহা বিশেষ রূপে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে টরেন্স (W. M. Torrens) সাহেবের রচিত "এম্পায়ার ইন এশিয়া" (Empire in Asia) নামক পুস্তক মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।*

নবাব মীরকাশিম ইংরাজের অবাধ-বাণিজ্যে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় তিনি দেশীয় বাণিজ্যেরও শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন যে, স্বরাজ্যে বিদেশীয় বণিকদিগকে বিনা শুল্কে ব্যবসায় করিতে দেওয়ায় শুল্কদানকারী স্বদেশীয় বণিক-সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তাঁহার এই সৎকার্যে বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙ্গালী ও ইংরাজ বণিক সমান অধিকার লাভ করিলেন। ইহাতে বাণিজ্য-বিভাগীয় রাজস্বের আশা নবাবকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু প্রজার মঙ্গলের জন্য এইরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও মীরকাশিম অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিলেন না। কলিকাতার স্বার্থান্ধ ইংরাজ বণিকেরা অতীব নির্লজ্জের ন্যায় মীরকাশিমের এই ন্যায়-সঙ্গত ব্যবহারে তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা কয়েকটি বিশেষ পণ্যের একাধিকার লাভের জন্যই যদি বিবাদ করিতেন, তাহা হইলেও তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা বঙ্গদেশে শ্বেতাঙ্গমাত্রের পক্ষে সর্ববিধ পণ্যের অবাধ বাণিজ্যে একাধিপত্য লাভ ও দেশী বণিকদিগের উপর গুরুতর শুল্কভার স্থাপনের জন্য মীরকাশিমকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মীরকাশিম সে অবৈধ অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় ইংরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে ১৭৬৩ খৃঃ প্রজাহিতৈষী নবাবকে গেড়িয়া ও উদয়নালায় পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে হইল।

জগতের ইতিহাসে এইরূপ অন্যায় সমরের আর একটি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ। কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায়ে মনুষ্য মাত্রেরই যে সাধারণ অধিকার আছে, এদেশের তদানীন্তন ইংরাজ রাজপুরুষেরা সেই স্বাভাবিক অধিকার হইতেও এদেশবাসীকে বঞ্চিত করিবার জন্য যে বহু প্রকার গর্হিত উপায়ের অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। দীর্ঘকাল-ব্যাপী

* নব্যভারত, ১২৯০ সাল, চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

এইরূপ পৈশাচিক চেষ্টার পর যদি দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য বিলুপ্ত হয়, শিল্পের অবনতি ঘটে, এদেশবাসী যদি সহৃদয় কবির বর্ণিত—

"হল চাকরি সার যথায় তথায়,
অপমান সদাই কথায় কথায় ॥"

অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি থাকিতে পারে?

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা এ দেশের পূর্বতন শাসন-কর্তাদিগের আমলের অরাজকতার বিষয় স্বল্পাধিক পরিমাণে অতিরঞ্জিত করিয়া অতি বিস্তারিত ভাবেই স্ব স্ব গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশে আসিয়া তাঁহারা যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়া বঙ্গদেশে ঘোর অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ কোনও প্রচলিত বাঙ্গালার ইতিহাসেই পরিদৃষ্ট হয় না। তথাপি সে সময়ের সরকারি কাগজপত্রে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে এবং এখনও আমরা সে অরাজকতার ফল ভোগ করিতেছি।

বঙ্গের তৃতীয় গবর্নর মিঃ ভেরেল্‌স্ট ইংরাজের জুলুমের বিবরণ এইরূপে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

A trade was carried on without payment of duties, in the prosecution of which *infinite oppressions* were committed. English agents or Gomastahs, nor contended with injuring the people, trampled on the authority of the Government binding and punishing the Nabab's officers whenever they presumed to interfere. This was the immediate cause of the war with Meer Cassim.—*View of Bengal.*

ইহার মর্ম এই যে, এদেশে আসিয়া ইংরাজ বণিকেরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য চালাইতে আরম্ভ করায় ও দেশীয় বণিকেরা উচ্চহারে শুল্ক দানে বাধ্য হওয়ায় বঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তার লাভ করিল। এই বাণিজ্য বিস্তার-কার্যে ইংরাজ পক্ষে অসীম অত্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল। ইংরাজ বণিকের গোমস্তারা কেবল দেশবাসীকে উৎপীড়িত করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, তাহারা কোম্পানির ভৃত্যগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশীয় রাজসরকারের আদেশও লঙ্ঘন করিত। দেশীয় রাজপুরুষেরা ইংরাজ বণিকের অত্যাচারে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে, শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীর দল তাঁহাদিগকে পর্যন্ত নিগৃহীত করিতে ভীত হইত না। নবাব মীরকাশিম এই সকল অত্যাচারের প্রতিকারে কৃতসংকল্প হওয়ায় ইংরাজেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন।

গবর্নর ভেরেলেস্টের উক্তি এইরূপ। কিন্তু এ বিষয়ে তিনিই একমাত্র সাক্ষী

নহেন। অন্য স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাক্ষীরও অভাব নাই। স্বয়ং মীরকাশিম কলিকাতার গবর্নরের নিকট যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোম্পানির ভৃত্যগণের বহুল অত্যাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিষিদ্ধ পণ্যের ব্যবসায় নবাবের কর্মচারীদিগের আদেশ ও রাজ-বিধানাদি লঙ্ঘন তাঁহাদিগের নিত্য কার্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজ বণিকেরা এদেশে সোরা ক্রয়-বিক্রয়ের একাধিকার লাভ কবিয়াছিলেন। একজন বণিক নবাবের ব্যবহারের জন্য সামান্য পরিমাণে সোরা ক্রয় করিয়াছিল তাহার এই কার্যে সন্ধির সর্ত ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া কোম্পানির পাটনা-স্থিত প্রতিনিধি মিঃ এলিস নবাবের বণিককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করেন। দুইজন ইংরাজ সৈনিক পলাতক হওয়ায় এলিস নবাবের মুঙ্গের-স্থিত দুর্গে প্রবেশপূর্বক তাহাদিগের অনুসন্ধানের জন্য স্বীয় ভৃত্যদিগকে প্রেরণ করেন। যাঁহারা স্বয়ং নবাবের প্রতি এইরূপ দুর্ব্যবহার কপিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, তাঁহারা জনসমাজের উপর জুলুম আরম্ভ করিলে, তাহার বেগ কিরূপ অপ্রতিহত হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের দুইখানি পত্রে উল্লিখিত দুইটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। পারসী ইতিহাস লেখক সৈর-মুতাক্ষরীণ-প্রণেতা ইংরাজের সামরিক চরিত্রের প্রশংসা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন, "এদেশবাসীর মঙ্গলের দিকে ইহাদিগের আদৌ দৃষ্টি নাই—তাহাদের অধীন প্রজাকুল অত্যাচার-পীড়িত হইয়া চারিদিকে ঘোর আর্তনাদ করিতেছে, দারিদ্র্য ও বিপন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। হা ভগবান! তোমার এই আর্ত সন্তানদিগের সহায়তার জন্য আগমন কর এবং ইহাদিগকে ঘোর অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার কর।"

মিঃ টমাস সিডেনহাম যথার্থই বলিয়াছেন,—

Englishmen are most apt than those of any other nation to commit violence in foreign countries. This I believe to be the case in India.

এই অত্যাচারের প্রকৃতি-সম্বন্ধে স্বয়ং নবাব মীরকাশিমের একখানি এত্রে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়—"ইংরাজ বণিকেরা এদেশবাসী প্রজা ও ব্যবসায়ীর গৃহ হইতে বলপূর্বক মাল উঠাইয়া লইয়া যায় এবং প্রকৃত মূল্যের চতুর্থাংশমাত্র তাহাদিগকে প্রদান করে। পক্ষান্তরে রায়তদিগকে বিলাতী জিনিস গছাইয়া দিয়া, নানা প্রকার জোর জুলুমের দ্বারা এক টাকার স্থলে পাঁচ টাকা আদায় করা হয়। আমার রাজপুরুষদিগকে ইহারা শাসন বা বিচার কার্য করিতে দেয় না। এইরূপ অত্যাচারে দেশে দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমার বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব কমিয়া

গিয়াছে। আমি কোম্পানির সহিত সন্ধির সর্ত্ত অদ্যাপি পালন করিতেছি; কিন্তু কোম্পানির ভৃত্যেরা আমাকে ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে।"

নবাব মীরকাশিমের কথায় যাঁহাদিগের বিশ্বাস না জন্মিবে, তাঁহাদিগকে আমরা সার্জেণ্ট ব্রেগো নামক শ্বেত-পুরুষের ১৭৬২ সালের ২৬শে মে তারিখে লিখিত পত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সার্জেণ্ট মহোদয় ঐ পত্রে বলিয়াছেন,—"কোম্পানির ভৃত্যেরা আপনাদিগকে অসীম ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে করে। কোম্পানির জন্য কোনও দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে ইহারা গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া অধিবাসীদিগকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাল খরিদ বিক্রয় করিতে বাধ্য করে। কেহ কোম্পানির ভৃত্যদিগের আদেশ-পালনে অসম্মত হইলে তাহাকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত বা তৎক্ষণাৎ কারারুদ্ধ করা হয়। কেবল তাহাই নহে, অধিবাসীরা ইংরাজ বণিক ভিন্ন আর কাহারও মালের ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে না—এইরূপ সর্ত্তেও তাহাদিগকে বাধ্য করিবার জন্য বল প্রযুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত কোম্পানির নামে কোম্পানির ভৃত্যগণের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য এইরূপ জোর জুলুম করিয়া যে দ্রব্য ক্রয় করা হয়, তাহার পূর্ণ মূল্যও হতভাগ্য দেশবাসীদিগকে প্রদত্ত হয় না—কখনও কখনও আদৌ মূল্য দেওয়া হয় না। এইরূপ অত্যাচারের ফলে বাখরগঞ্জ জেলা ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। এখানকার বিখ্যাত হাট বাজারেও আর বেশী জিনিষপত্র কিনিতে পাওয়া যায় না। তথাপি ইংরাজ বণিকের পিয়নেরা অবাধে দরিদ্র লোকের উপর জুলুম করিতে বিরত নহে। জমীদারেরা প্রজা রক্ষার চেষ্টা করিলে তাঁহাদিগকেও বিপন্ন করিবার ভয় দেখান হয়। পূর্ব্বে সরকারি কাছারীতে সাধারণে অভিযোগ করিয়া বিচার পাইত। এখন ইংরাজ বণিকের গোমস্তাই বিচারকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রত্যেক গোমস্তার ঘরেই আদালত বসিতেছে। গোমস্তারা বিচারক-রূপে জমীদারদিগের বিরুদ্ধেও দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। জমীদারদের ব্যবহারে কোম্পানির ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে অকারণে টাকা আদায় করা হয়। গোমস্তার নিজের লোকেরা কোনও জিনিষ চুরি করিলেও জমীদারের লোকে করিয়াছে বলিয়া ভয় দেখাইয়া জমিদারের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইয়া থাকে।"

কেবল যে বাখরগঞ্জেই এইরূপ অত্যাচার হইত, তাহা নহে। বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র এইরূপ পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় ঘটিত। ঢাকার তদানীন্তন কলেক্টার মহম্মদ আলি ১৭৬২ সালের অক্টোবর মাসে ইংরাজ বণিকদিগের অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া কলিকাতার গবর্ণরের নিকট যে পত্র লিখেন, তাহাতেও এক প্রকার অত্যাচারের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"কোম্পানির ভৃত্যেরা ঢাকা ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে অধিবাসীদিগকে তামাক, তুলা, লৌহ প্রভৃতি পণ্য বাজারদরের অপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য করে। মূল্য আদায় কার্য সকল স্থলেই বলপূর্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। এতদ্‌ভিন্ন পিয়নের খোরাকী বলিয়াও কিছু আদায় করা হয়। ফলে, এখানকার আড়তগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোম্পানির লক্ষ্মীপুর-স্থিত কর্মচারীরা আপনাদিগের বাসের জন্য বলপূর্বক লোকের জমি-জায়গা কাড়িয়া লয়, তাহার খাজনাও দেয় না। দুষ্ট লোকের পরামর্শে সিপাহী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া শ্বেতাঙ্গেরা অনেক গ্রামে গমন-পূর্বক অকারণে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে। স্থানে স্থানে মাশুল আদায়ের জন্য চৌকি স্থাপিত হইয়াছে। কোম্পানির ভৃত্যেরা দরিদ্র লোকদিগের গৃহে যাহা পায়, তাহা বিক্রয় করিয়া লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ করে। এই সকল জুলুমে দেশ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। প্রজারা ঘরে থাকিতে পায় না, মালগুজারী দিতে পারে না। অনেক স্থানে মিঃ শিভেলিয়ার জোর করিয়া কয়েকটি নূতন হাট ও শিল্পশালা (ফ্যাক্টরী) স্থাপন করিয়াছেন। তিনি জাল সিপাহী পাঠাইয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিতেছেন। ইঁহার জুলুমে অনেক হাট, ঘাট, পরগণা একেবারে উৎপন্ন হইয়াছে।"

উইলিয়াম বোল্টস নামক তদানীন্তন মেয়র কোর্টের জজ এই অত্যাচারের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আরও ভয়ানক। Considerations on Indian Affairs (1772 A.D.) নামক গ্রন্থে পাঠক সে বর্ণনা দেখিতে পাইবেন। তিনি বলেন,—"বঙ্গদেশে ইংরাজের বাণিজ্যকে অত্যাচারের ধারাবাহিক দৃশ্যাবলী বলিয়া উল্লেখ করিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। এই অত্যাচারের কুফল ঐ দেশের প্রত্যেক তন্তুবায় ও শিল্পী ভোগ করিতেছে। দেশের প্রত্যেক শিল্প-দ্রব্যই ইংরাজ বণিকেরা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ শিল্পীকে কত মাল, কিরূপ মূল্যে, সরবরাহ করিতে হইবে, তাহা ইংরাজেরাই স্বেচ্ছামত স্থির করিয়া দেন। এজন্য দালাল, পাইকার ও তন্তুবায় প্রভৃতিকে সিপাহীর সাহায্যে কোম্পানির ভৃত্যদিগের নিকট হাজির করা হয়, এবং মালের পরিমাণ, মূল্য ও মাল দিবার সময় সম্বন্ধে একটা দলিলে আপনাদিগের সুবিধামত সর্ত্ত লিখিয়া তাহাতে শিল্পীদিগের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। সে বিষয়ে শিল্পীর সম্মতির বা মতামতের অপেক্ষা কেহই করেন না। শিল্পীর (তন্তুবায় প্রভৃতির) হস্তে কিছু টাকা প্রথমে বায়না প্রদত্ত হইয়া থাকে। সে লইতে অস্বীকৃত হইলে, তাহার কাপড়ে উহা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর কাছারীর সিপাহীরা চাবুক মারিতে মারিতে তাহাদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দেয়। অন্য কাহারও কাজ করিবে না, এই

সর্ত্তে অনেক শিল্পীকে বাধ্য করা হয়। এই সময় কার্যে কল্পনাতীত জুয়াচুরি খেলা হয়। প্রথমতঃ যে দরে তন্তুবায়দিগের নিকট বস্ত্রাদি ক্রীত হইয়া থাকে, তাহাই বাজার দরের অপেক্ষা অল্প। তাহার উপর "যাচনদার" বা বস্ত্র পরীক্ষকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া উৎকৃষ্ট মালও অপকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহাতে হতভাগ্য তন্তুবায়দিগকে শতকরা ৪০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। এই সকল জুয়াচুরির জন্য যে সকল তন্তুবায় এগ্রিমেণ্ট বা চুক্তিপত্র অনুসারে মাল যোগাইতে অসমর্থ হয়, তাহাদিগের গৃহ ও গৃহজাতসমূহ তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করিয়া ক্ষতিপূরণ লওয়া হয়। রেশম-শিল্পী নাগোয়াড়-দিগেরও প্রতি নানাপ্রকার জুলুম হইয়া থাকে। ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াও ইহাদিগের নিষ্কৃতি ঘটে না। পাছে কোম্পানির লোকেরা ইহাদিগকে উৎপীড়নে জর্জরিত করিয়া বস্ত্রবয়ন কার্যে বাধ্য করে, এই ভয়ে অনেক হতভাগ্য স্বহস্তে আপনাদিগের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিয়া অক্ষম সাজিয়া বসিয়া থাকিত।"

ইংরাজ বণিকের অত্যাচারে কেবল বঙ্গের শিল্প-বাণিজ্যই যে বিনষ্ট হইতেছিল তাহা নহে, কৃষিকার্যেরও ঘোর অবনতি ঘটিয়াছিল। এই বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে বোণ্টস্ মহোদয় বলেন,—"বঙ্গীয় প্রজার মধ্যে সাধারণতঃ সকলেই কৃষি ও শিল্পের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে। কোম্পানির গোমস্তারা তাহাদিগের নিকট হইতে শিল্প-জাত সংগ্রহের জন্য যে প্রকার অত্যাচার করে, তাহাতে হতভাগ্যেরা এরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, ভূমির উন্নতি সাধনের শক্তি আর তাহাদিগের নাই। এমন কি, তাহাদিগের খাজনা দিবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে শিল্পজাতের জন্য তাহাদিগের উপর যেরূপ জুলুম হয়, ভূমির রাজস্ব আদায়ের জন্যেও সেইরূপ হইয়া থাকে। রাজস্ব-কর্মচারীদিগের অমানুষিক অত্যাচারে হতভাগ্য প্রজাকুল খাজনার টাকা যোগাড় করিবার নিমিত্ত প্রায়শঃ আপনাদিগের প্রাণ-প্রিয়তম সন্তানদিগকে পর্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। যাহারা এই পৈশাচিক কার্যে অসমর্থ হয়, দেশ ছাড়িয়া পলায়ন ভিন্ন তাহাদিগের আর উপায়ান্তর নাই।"

পাঠক! এরূপ অত্যাচার ভারতবর্ষে, বা বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক কালের মধ্যে কখনও হইয়াছিল কি? নাদিরশাহ, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতির নামে ত নিষ্ঠুরতার কলঙ্ককালিমা অক্ষয়ভাবেই লেপিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারাও কখনও এরূপ অত্যাচারের বিষয় কল্পনায় আনিতে পারিয়াছিলেন কি? অপরের কথা কি বলিব, কোম্পানির ডিরেক্টারেরাই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—

We think vast fortunes acquired in the inland trade have been obtained by a *scene of the most tyrranic and oppressive conduct that was ever known in any age or country.*

বঙ্গীয় প্রজাকুলের উপর এই অকথ্য অত্যাচার দর্শন করিয়া সেকালে একটি ব্রাহ্মণ-কুমারের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তিনি এই ঘোর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শক্তির অভাবেই হউক, বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। এই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কলিকাতার ইংরাজ কাউন্সিল ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন,—

Nabab Mir Jaffer has entered into an agreement with us that he or his officers should, on no account, interfere with the acts or conduct of the Factors and Gomastas of the East India Company and that these Factors and Gomastas should be allowed perfect liberty to act just as they pleased in furtherance of the commercial interests of the Company, But *a wicked Brahmin, named Nundcumar*, not withstanding the remonstrances of his master, the present Nabab of Murshidabad, always stands between the Company's servants and the weavers who take advances from them.

This man makes frequent complaints that the weavers are being oppressed by the servants and Gomastas of the East India Company. He has no right to make any such complaints when the Company's servants are authorised by the Nabab himself to deal with these weavers just as they please in furtherance of their most lawful trade. Nundcumar is really an enemy of the East India Company.

ইহার ভাবার্থ এই যে,—নবাব মীরজাফর আমাদিগের সহিত এই মর্মে সন্ধি করিয়াছেন যে, তিনি অথবা তাঁহার কর্মচারীরা কোনও কারণে কোম্পানির কুঠিয়াল বা গোমস্তাদিগের কার্যে বা ব্যবহারে হস্তক্ষেপ বা বাধা-দান করিতে পারিবেন না; তিনি কোম্পানির ভৃত্যদিগকে যদৃচ্ছা কার্য করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিবেন। কিন্তু নন্দকুমার নামক এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাহার প্রভু মুর্শিদাবাদের বর্তমান নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও কোম্পানির কর্মচারিগণের কার্যে পদে পদে বাধা-দান করিতে অগ্রসর হয়, যে সকল তন্তুবায় টাকা দাদন লয়, সে তাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিভ্রাট উপস্থিত করে। কোম্পানির গোমস্তা ও

কুঠিয়ালেরা তন্তুবায়দিগের উপর জুলুম করিতেছে বলিয়া এই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অভিযোগ উপস্থিত করে। বস্তুতঃ এই ব্রাহ্মণের এইরূপ অভিযোগ উত্থাপনের কোনও অধিকার নাই। কারণ, নবাবের নিকট কোম্পানির ভৃত্যেরা তাহাদিগের প্রভুর ব্যবসায়-বৃদ্ধির জন্য তন্তুবায়দিগের সহিত স্বেচ্ছামত ব্যবহার করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। নন্দকুমার প্রকৃতপক্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন শত্রু।

এইরূপে দরিদ্র স্বদেশীয় শিল্পীদিগের কষ্ট-মোচনের জন্য কোম্পানির সহিত শত্রুতা করিয়া পরিশেষে এই ব্রাহ্মণকে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। দুঃখের বিষয় বঙ্গে তদানীন্তন কূটনীতিকুশল প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের হৃদয় এই ঘটনাতেও তাদৃশ বিচলিত হয় নাই, স্বদেশীয় শিল্পিকুলের দুঃখ-নিবারণে কেহই আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। ইংরাজেরা অকর্মণ্য দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে "দেওয়ানি" সনন্দ লাভ করিয়া অক্ষুণ্ণভাবে দেশের রুধির শোষণ করিতে লাগিলেন। লর্ড ক্লাইভ বিলাতের কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—

No future Nabab will either have *power or riches* sufficient to attempt your overthrow by means either of force or corruption.

অর্থাৎ অতঃপর কোনও ভাবি নবাবের এমন ক্ষমতা বা অর্থবল থাকিবে না যে, তদ্দ্বারা এদেশে আপনাদিগের শক্তির উচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে।*

* কিন্তু এইরূপ রুধিরশোষণ করিয়াও কোম্পানি সম্পূর্ণ বিঘ্ন-শূন্য হইতে পারেন নাই। সদাশয় পেশওয়ে মাধব রাওয়ের আদেশে এই সময়ে সিন্ধিয়া বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজকে বিতাড়িত করিয়া তথায় হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অভিযানের আয়োজন করিতেছিলেন। লালা সেবক রাম নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় দূতের সহিত জগমোহন দত্ত নামক জনৈক বাঙ্গালীর এবিষয়ে গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছিল। ইংরাজেরা সে সংবাদ পাইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণকে জগমোহনের কার্যকলাপ গোপনে অনুসন্ধান করিবার জন্য গুপ্তচর (spy) নিযুক্ত করেন। ফলে জগমোহন ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এই সকল ঘটনায় ইংরাজ আপনাদিগের পরিণাম চিন্তা করিয়া কিরূপ ভীত হইয়াছিলেন, ওয়ারেন হেষ্টিংসের পশ্চাল্লিখিত উক্তি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়,—

I much fear that it is not understood as it ought to be how near the Company's existence has on many occasions vibrated to the edge of perdition and that it has at all times been suspended by a thread so fine that the touch of chance might break, or the breath of opinion dissolve it and instantaneous will be its fall whenever it shall happen. (*British India* by R. M. Frasar),

ইংরাজ মনীষী লর্ড মেকলেও এই সময়কার অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

In what was this confusion to end? Was the strife to continue during centuries? Was it to terminate in the rise of another great monarchy? Was the Mussalman or the Maratha to be the Lord of India? Was another Babar to descend from the mountains and to lead the hardy tribes of Kabul and

বঙ্গের যে সকল মনীষী সিরাজের ঔদ্ধত্য-দর্শনে বিচলিত হইয়া তাঁহার পদচ্যুতির জন্য অসাধারণ-কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইংরাজ বণিকের এই কুটিল নীতির মর্ম্মোদ্‌ভেদে অসমর্থ হইয়া নীরবে লক্ষ লক্ষ স্বজাতীয়ের অমানুষিক দুর্দশা দর্শন করিতেছিলেন। কোম্পানির ভৃত্যেরা অত্যাচারপ্রিয়তায় সিরাজকে পরাজিত করিয়াও কিরূপে বঙ্গের প্রধান ব্যক্তিগণের বিরাগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। সে যাহা হউক, ভৃত্যদিগের অনুষ্ঠিত অত্যাচার-নিবারণে পরিশেষে কোম্পানির ডিরেক্টারদিগকেই মনোযোগ করিতে হইল। তাঁহারা দেখিলেন, তাদৃশ অত্যাচার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে দেশ একেবারে উৎসন্ন হইবে, এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদিগের বাণিজ্যগত উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে, অর্থলাভের নবাবিষ্কৃত উপায়গুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বার্থ-রক্ষার উদ্দেশ্যেও প্রজা-রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইল। কিন্তু দুর্বৃত্ত কর্ম্মচারীদিগের দুর্নিবার অর্থলোভ ও অত্যাচার-প্রিয়তায় সুশাসন প্রবর্তন সম্বন্ধে ডিরেক্টারদিগের আদেশ পদে পদে লঙ্ঘিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, পরিশেষে তাঁহাদিগের দীর্ঘকালের চেষ্টায় অল্পে অল্পে অত্যাচারের মাত্রা হ্রাস পাইল।

এইরূপে কালক্রমে কোম্পানীর ভৃত্যদিগের অত্যাচার নিবারিত হইল বটে, কিন্তু তথাপি বঙ্গবাসী শিল্পি-সমাজের দুর্দৈব ঘুচিল না। কোম্পানির ডিরেক্টারেরা ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মার্চের আদেশপত্রে এখানকার কর্ম্মচারীদিগের প্রতি অভিনব অত্যাচারের সূত্রপাত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "বঙ্গের সমস্ত রেশম-শিল্পীদিগকে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। অতঃপর কেহ যাহাতে স্বগৃহে স্বাধীনভাবে পট্টবস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতে না পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কোম্পানির শিল্পশালায় (ফ্যাক্টরীতে) গিয়া কার্য করিতে শিল্পীদিগকে বাধ্য করিতে হইবে। যাহারা স্বাধীনভাবে রেশম-শিল্পের ব্যবসায় করিবে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবে।" এই অত্যাচার-মূলক আদেশ প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে

Khorasan against a wealthier and less warlike race? ***None of these events seemed improbable.***

এই সকল সম্ভবপর ঘটনার কোন একটি যদি সত্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস কিরূপ মূর্তি ধারণ করিত, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মারাঠা বা মুসলমানের শাসনাধীন থাকিলেও যে ভারতবর্ষ তুরস্ক বা জাপানের ন্যায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় ও সুফল লাভ করিতে সমর্থ হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বঙ্গীয় রেশম-শিল্পের ধ্বংস-সাধন ও ইংলণ্ডের ইংরাজ শিল্পীদিগের উন্নতির পথ-প্রসার, একথা দশম বর্ষীয় বালকেও বোধ হয় বুঝিতে পারে।

দীর্ঘকালব্যাপী এইরূপ অকথ্য অত্যাচারের ফলে এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। ইংরাজ বণিকেরা বৈধ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে এই প্রকার পাশব-বলের সাহায্যে ভারতবর্ষীয় শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন, এদেশবাসীর অপরিমেয় ধন-সম্পত্তি অন্যায়-পূর্বক লুণ্ঠন করিয়া ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছেন। কেবল ইংলণ্ড নহে, ইউরোপের অনেক জাতি এইরূপে পরস্বাপহরণ করিয়াই বর্তমান সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন।*

দেশীয় শিল্পের ধ্বংস

The cotton and silk goods of India up to the period (1813 A.D.) could be sold for a profit in the British market at a price from 50 to 60 per cent lower than those fabricated in England. It consequently became necessary to protect the latter by duties of 70 and 80 per cent on their value or by positive prohibition. Had this not been the case, had not such prohibitory duties and decrees existed, the mills of Paisley and Manchester would have been stopped in their outset, and could scarcely have been again set in motion, *even by power of steam.* They were created by the sacrifice of the Indian manufacture. Had India been independent, she would have retaliated, would have imposed prohibitive

* Much of modern European national prosperity is based upon the plunder of nations representing ancient civilisations. Spain robbed South America. England from Elizabeth to Cromwell seized as many of the Lusitanian treasure ships on their way to Spain as she could and appropriated what they carried.

England's industrial supremacy owes its origin to the vast hoards of Bengal and the Karnatik treasure being made available for her use. Before Plassy was fought and won, and before the stream of treasure began to flow to England, the industries of our country was at a very low ebb. Lancashire spinning and weaving were on a par with the corresponding industry in India so far as machinery was concerned, but the skill which made Indian cotton a marvel of manufacture was wholly wanting in any of the Western nations. As with cotton so with iron, industry was in Britain at a very low ebb, alike in mining and in manufacture.

duties upon British goods and would thus have preserved her own productive industry from annihilation. This act of self-defence was not permitted her ; she was at the mercy of the stranger. British goods were forced upon her without paying any duty and the foreign manufacturer employed *the arm of political injustice* to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not have contended on equal terms.—*Mill's History of British India* (Wilson).

যাঁহারা মনে করেন, বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে নির্মিত পণ্য সামগ্রীর সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হওয়াতেই আমাদিগের স্বদেশীয় শিল্পিগণের হস্ত-কৌশলে নির্মিত পণ্য ক্রমশঃ পরাভূত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা ঐতিহাসিক উইলসনের উপরি উদ্ধৃত উক্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলে, আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। ইতঃপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে শ্বেতাঙ্গ বণিকদিগের অতি ভীষণ অত্যাচারে বঙ্গের শিল্পী ও ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় নিতান্ত জর্জর হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্তারা সে সকল জুলুম বন্ধ করিয়া অভিনব অত্যাচারের সূত্রপাত করেন। তাঁহাদিগের আদেশে বঙ্গের অধিকাংশ শিল্পী স্বাধীনভাবে বস্ত্রাদি-বয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়।

এই সকল অত্যাচারে বঙ্গীয় শিল্প-বাণিজ্য বহু পরিমাণে ব্যহত হইলেও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই। দীর্ঘকাল অত্যাচার সহ্য করিয়াও বঙ্গীয় শিল্পিগণ যে সকল বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া বিলাতে প্রেরণ করিতেন তাহা সেখানকার বাজারে বিলাতী শিল্পীদিগের নির্মিত পণ্য অপেক্ষা শতকরা ৫০।৬০ টাকা কম মূল্যে বিক্রয় করিয়াও যথেষ্ট লাভ থাকিত। ইংরাজ বণিকেরা ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা একদিকে ভারতীয় পণ্য সামগ্রীর উপর গুরুতর শুল্ক স্থাপন করিয়া ও অপরদিকে বিলাতী মাল বিনা শুল্কে এদেশে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষে বিলাতী মালের কাটৃতি বাড়িতে পারে, তাহাই তাঁহাদিগের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। সেই জন্য পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্সের আদেশে গঠিত একটি কমিশনে ওয়ারেন হেষ্টিংস, টমাস মনরো, স্যার

Modern England has been made great by Indian wealth, wealth never preferred by its possessor, but always taken by the might or skill of the stranger.—*Prosperous British India*.

জন ম্যালকম, জন স্ট্রাচী প্রভৃতির ন্যায় ভারতের অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইতে লাগিল,—

From your knowledge of the Indian character and habits, are you able to speak to the probability, of a demand for European commodities by the population of India, for their own use ?

অর্থাৎ ভারতবাসীর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আপনাদিগের যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আপনারা কি বলিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের পক্ষে তাহাদের নিজের ব্যবহারের জন্য ইউরোপীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় করিবার সম্ভাবনা আছে কি না ?

এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষীদিগের সকলেই বলিলেন, "ভারতবর্ষ-জাত দ্রব্যেই ভারতবাসীর সকল অভাব দূরীভূত হইয়া থাকে। তাহারা আদৌ বিলাস-প্রিয় নহে। ভারতীয় শ্রমজীবীরা মাসে তিন চারি টাকার অধিক উপার্জন করিতে পারে না। ফল কথা, ভারতবাসীর নিকট বিলাতী দ্রব্যের আদর হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।" টমাস মনরো মহোদয় সেই সময়ে সাক্ষ্যদান-কালে বলিয়াছিলেন, "ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বিলাতী পণ্যের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। একখানি ভারতীয় শাল আমি সাত বৎসরকাল ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু এই দীর্ঘকালের ব্যবহারেও উহার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমি ইউরোপীয় শাল বিনামূল্যে উপঢৌকন-স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেও তাহা ব্যবহার করিতে চাহি না।"

এইরূপ নৈরাশ্যজনক উত্তর পাইয়াও বিলাতী বণিক-সমাজ নিরস্ত হইলেন না। তাঁহারা স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া রাজশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের উপর অতি গুরুতর শুল্ক স্থাপিত করিয়া উহার শক্তিনাশ করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলেন। ইতঃপূর্বেই স্বতন্ত্রভাবে বস্ত্রবয়নাদি কার্য নানা স্থানে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের উপর বিলাতে শতকরা ৭০ হইতে ৮০ টাকা পর্যন্ত কর বসান হইল। এদিকে ভারতে আমদানী বিলাতী কাপড় বিনা শুল্কে দেশের সর্বত্র প্রবর্তিত হইতে লাগিল। এইরূপ গর্হিত আচরণে লজ্জিত না হইয়া ইংরাজ বণিকেরা স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেন, ইহা কোনও ক্রমেই দূষ্য নহে। আমরা ইহাকে আমাদিগের স্বদেশী পণ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধক "রক্ষা শুল্ক" বলিয়া মনে করি—

(We) Look upon it as a protecting duty to encourage our own manufactures.

মালাবার অঞ্চলের ক্যালিকো নামক ছিটের কাপড় পূর্বে বিলাতে বহু পরিমাণে রপ্তানি হইত। ১৬০৬ সালে বিলাতে প্রথম এই কাপড় প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপিত হয়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এই শিশুশিল্পের সহায়তা-কল্পে তন্তুবায়দিগের আবেদন পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষীয় ক্যালিকো ছিটের অবাধ আমদানি নিষিদ্ধ করিয়া এক আইন পাশ করিলেন। ফলে ভারতীয় ছিটের উপর প্রতি বর্গ গজে তিন পেন্স বা দেড় আনা করিয়া শুল্ক স্থাপিত হইল। সেই সঙ্গে সাদা ক্যালিকোর উপরও আমদানি শুল্ক বসান হইল। দুই বৎসর পরে বিলাতী তন্তুবায়দিগের অনুরোধে পার্লামেণ্ট ক্যালিকো ছিটের শুল্ক দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রতি গজে তিন আনা করিলেন। ১৭২০ সালে আইন হইল, ভারতীয় ক্যালিকো বিলাতে যাহারা বিক্রয় করিবে, তাহাদিগকে ২০ পাউণ্ড বা দুই শত টাকা ও উহার ব্যবহারকারীকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করা হইবে।*

অন্যান্য পণ্যের উপর কিরূপ শুল্ক গৃহীত হইত, দেখুন—

ঘৃতকুমারী	শতকরা	৭০ টাকা হইতে		২৮০ টাকা
হিঙ্গু	,,	২৩৩	,,	৬২২
এলাচী	,,	১১০	,,	২৬৬
কাফি	,,	১০৫	,,	৩৭৩
মরিচ	,,	২৬৬	,,	৩৭৩
চিনি	,,	৯৪	,,	৩৯৩
চা	,,	৬	,,	১০০
ছাগলোম জাত পণ্য	,,	৮৪·৬২		
মাদুর	,,	৮৪·৬২		
মসলিন	,,	৩২·৫০		
ক্যালিকো	,,	৮১		
কার্পাস প্রতিমণে প্রায়	,,	১৫		
কার্পাস বস্ত্র	,,	৮১		
লাক্ষা	,,	৮১		
রেশম	,,	২·৭৫ তৎভিন্ন প্রতি সের ৪ টাকা		

রেশমী কাপড় বিলাতে প্রেরণ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

একে কোম্পানির কুঠীতে দেশীয় শিল্পীদিগকে বল-পূর্বক ধরিয়া লইয়া কার্য করিতে বাধ্য করায় দেশীয় কারখানাগুলির লোকসান হইতেছিল, তাহার উপর

* *Useful Arts and Manufactures of Great Britain*, p. 363.

দেশীয় পণ্যের উপর উল্লিখিত প্রকারে উচ্চ হারে শুল্ক স্থাপিত হওয়ায় এখানকার শিল্প-বাণিজ্যের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল।

এইরূপ গর্হিত উপায়ে ভারতীয় শিল্পের বিনাশ-সাধন ও এদেশে বিলাতী মালের প্রচলন করা হইল। ফলে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে যে ভারতে ১৫৬ পাউণ্ডের অধিক বিলাতী কার্পাস-জাত বস্ত্রের আমদানি হয় নাই, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সেই ভারতে ১ লক্ষ ১৮ হাজার চারি শতাধিক পাউণ্ড মূল্যের শুদ্ধ বিলাতী কাপড়ের আমদানি হইল। এই প্রকারে ক্রমশঃ ভারতবর্ষ বিলাতী মালের খরস্রোতে প্লাবিত হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে বিলাতে ও অপরাপর দেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে, দেশীয় শিল্প-জাতের অবনতির বেগ কিরূপ প্রবল হইয়াছিল, তাহা উপলব্ধ হইবে।

বিলাতে দেশীয় পণ্যের রপ্তানির হিসাব,—

তুলা।

১৮১৮ খৃঃ	১,২৭,১২৪ গাঁইট।
১৮২৮ খৃঃ	৪,১০৫ গাঁইট।

কাপড়।

১৮০২ খৃঃ	১৪,৮১৭ গাঁইট।
১৮২৯ খৃঃ	৪৩৩ গাঁইট।

লাক্ষা।

১৮২৪ খৃঃ	১৭,৬০৭ মণ
১৮২৯ খৃঃ	৮,২৫১ মণ

কিন্তু নীলের ও কাঁচা রেশমের রপ্তানি বাড়িতে লাগিল। সেই সঙ্গে গুরুতর শুল্কের জন্য রেশমী কাপড়ের প্রতিপত্তি বিলাতে কমিতে লাগিল।

এই সময়েও আবেদন নিবেদনের ত্রুটী হয় নাই। ভারতবাসীর পক্ষ হইতে ঐ অবৈধ কর লাঘব করিবার জন্য অনেকবার পার্লামেণ্টে আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ দেশীয় শর্করাদির শুল্ক হ্রাস করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কতিপয় ইংরাজ বণিক্ তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" নীতির অনুসরণ করিলেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একমাত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিই ভারতে মাল আমদানি রপ্তানি করিতেন। ঐ অব্দ হইতে ইংলণ্ডের সকল বণিকেরাই ভারতে ব্যবসায় করিবার অধিকার লাভ করিলেন। সুতরাং বিলাতী মালে ভারতবর্ষের বিপণীনিচয়

ক্রমেই পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সর্বশুদ্ধ প্রায় ৬৫.৫০ লক্ষ পাউণ্ড বা সাড়ে ছয় কোটী টাকার বিলাতী মাল ভারতে আমদানি হইল।

ভারতীয় শিল্প-ব্যণিজ্য-নাশের জন্য কোম্পানি বাহাদুর পূর্বে কথিত গর্হিত উপায়াবলীর অবলম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা ভারতেও দেশীয় শিল্পের উপর গুরু করভার স্থাপন করিয়াছিলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান হয়, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, বিলাতী কাপড় ভারতে শতকরা ২.৫০ টাকা কর দিয়া বিক্রীত হইত; কিন্তু ভারতবাসীরা আপনাদিগের ব্যবহারের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিলেও তাহার উপর শতকরা ১৭.৫০ টাকা কর দিতে বাধ্য হইতেন। দেশীয় চর্ম-নির্মিত দ্রব্যাদি দেশে ব্যবহৃত হইলেও কর্তৃপক্ষ তাহার উপর শতকরা ১৫ টাকা শুল্ক আদায় করিতেন। দেশীয় চিনির উপর বিলাতী চিনি অপেক্ষা শতকরা ৫ টাকা অধিক কর আদায় হইত। এইরূপে ভারতের প্রায় ২৩৫ প্রকার বিভিন্ন পণ্যের উপর অতি গর্হিত অন্তর্বাণিজ্য কর (Inland duties) সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রায় ষষ্টি বর্ষ পর্যন্ত এই প্রকার উচ্চ হারে কর দান করিতে বাধ্য হইয়া ভারতীয় শিল্পী ও ব্যবসায়ীর দল অবনতির নিম্নস্তরে পতিত হইলেন।

এই সকল অত্যাচারে বিদেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি কমিতে লাগিল। আমেরিকা, ডেনমার্ক, স্পেন, পোর্তুগাল, মরীচ দ্বীপ ও এসিয়া খণ্ডের অন্যান্য প্রদেশের সহিত ভারতীয় শিল্পীর সম্বন্ধ হ্রাস পাইতে লাগিল। ১৮০১ খৃঃ এদেশ হইতে আমেরিকায় ১৩,৬৩৩ গাঁইট কাপড় গিয়াছিল, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে উহার পরিমাণ কমিয়া ২৫৮ গাঁইটে পরিণত হইল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসর ডেনমার্কে ন্যূনাধিক ১,৭৫০ গাঁইট কাপড় রপ্তানি হইত; কিন্তু ১৮২০ সালের পর ঐ দেশে ১৫০ গাঁইটের অধিক কাপড় আর কখনই রপ্তানি হয় নাই। ১৭৯৯ খৃঃ ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়িগণ ৯,৭১৪ গাঁইট কাপড় পোর্তুগালে পাঠাইয়া ছিলেন; ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের পর আর তাঁহারা ১০০০ গাঁইটের অধিক কাপড় পাঠাইতে পারেন নাই। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরব ও পারস্য সাগরের উপকূলবর্তী প্রদেশে ৪ হাজার হইতে ৭ হাজার গাঁইট কাপড় ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইত; কিন্তু ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের পর ঐ সকল অঞ্চলের ২ হাজার গাঁইটের অধিক মাল আর কখনই প্রেরিত হয় নাই। মহম্মদ রেজা খাঁর আমলে বঙ্গদেশীয় তন্তুবায়গণ ছয় কোটী স্বদেশবাসীর লজ্জা নিবারণ করিয়াও প্রতি বৎসর ১৫ কোটী টাকার বস্ত্রজাত বিদেশে প্রেরণ করিতেন। ইদানিং তাঁহারা বৎসরে ৩ লক্ষ টাকার মালও রপ্তানি করিতে পারেন না। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পীদিগের স্বাধীন ব্যবসায়ে বাধা দান করিয়া ইংরাজ

এ-দেশের শিল্প বাণিজ্যের কিরূপ সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, এই সকল অঙ্ক হইতে তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিলাতে অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্তনে অর্থনীতিবিদ্‌-গণের আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের শিল্প-ব্যবসায় যতদিন সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হইল, ততদিন বৃটিশ বণিক সমাজ অবাধ বাণিজ্য-নীতির অবলম্বনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন না। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে অন্তর্বাণিজ্য শুল্ক তিরোহিত হয়। কিন্তু তখন দেশীয় বণিক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের শরীর শোণিত-শূণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যদিকে রেলপথ-বিস্তারে দেশের নৌ-জীবী ও যান-ব্যবসায়ী-দিগের সর্বনাশ সাধিত হইল, সুদূর পল্লীগ্রামেও বিলাতী মাল অপ্রতিহত বেগে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিল।

ডাঃ বুকানন কোম্পানির আদেশে উত্তর ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে পাটনা, শাহাবাদ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। তাঁহার তদন্তে প্রকাশ পায়, পাটনা জেলায় ধানের দর টাকায় ১.৭৫ মণ ছিল। ২৪০০ বিঘা ভূমিতে তুলার ও ১৮০০ বিঘা ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হইত। তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার চারি শত ছাব্বিশ জন স্ত্রীলোক কেবল সূত্র-কর্ত্তন-ব্যবসায়ে জীবিকা-নির্বাহ করিত। দিবসের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র কার্য করিয়া তাহারা সংবৎসরে ১০,৮১,০০৫ টাকা লাভ করিত। ইংরাজের অনুগ্রহে, সূক্ষ্ম সূত্রের রপ্তানি হ্রাসের সহিত তাহাদিগের ব্যবসায়ে অবনতি ও জীবন-যাত্রা কষ্টকর হইতে লাগিল। তন্তুবায়েরা বস্ত্রবয়ন করিয়া বার্ষিক (ব্যয় বাদে) ৭.৫০ লক্ষ টাকা রোজগার করিত। ফতুহা, গয়া, নওয়াদা প্রভৃতি স্থান তসরের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শাহাবাদে ১,৫৯,৫০০ রমণী বৎসরে ১২.৫০ লক্ষ টাকার সূতা কাটিত। জেলায় সর্বশুদ্ধ ৭,৯৫০টি তাঁত ছিল। তাহাতে ১৬,০০,০০০ টাকার বস্ত্র বৎসরে প্রস্তুত হইত। এতদ্‌ভিন্ন কাগজ, গন্ধ-দ্রব্য, তৈল, লবণ ও মদ্যাদির ব্যবসায়ও অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল। ভাগলপুরে চাউলের দর টাকায় ৩'৫০ সের ছিল। ১২,০০০ বিঘা জমিতে কার্পাসের কৃষি হইত। তসর বুনিবার ৩,২৭৫টি তাঁত ও কাপড় বুনিবার ৭,২৭৯টি তাঁত ছিল। গোরক্ষপুরে ১,৭৫,৬০০ স্ত্রীলোক চরখা কাটিয়া দিনপাত করিত; ৬,১১৪টি তাঁত চলিত। ২০০ হইতে ৪০০ পর্যন্ত নৌকা প্রতি বৎসর নির্মিত হইত। তদ্ভিন্ন লবণ ও শর্করা প্রস্তুত করিবার কারখানাও অনেক ছিল। দিনাজপুরে ৩৯,০০০ বিঘা পাট, ২৪.০০ বিঘা তুলা, ২৪,০০০ বিঘা ইক্ষু, ১৫,০০০ বিঘা নীল ও ১৫০০ বিঘা তামাকের চাষ হইত। এই জেলায় ত্রয়োদশ লক্ষেরও অধিক গাভী ও বলদ ছিল। উচ্চবর্ণের বিধবা ও

কৃষক পত্নীগণ সূতা কাটিয়া বার্ষিক (ব্যয় বাদে) ৯,১৫,০০০ টাকা উপার্জন করিতেন। পাঁচশত ঘর রেশম ব্যবসায়ী বৎসরে ১,২০,০০০ টাকা লাভ করিত। তন্তুবায়েরা বার্ষিক ১৬,৭৪,০০০ টাকার কাপড় বুনিত। মালদহের মুসলমান রমণীদিগের মধ্যে সূচী-শিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল। সূতায় ও কাপড়ে নানা রকমের রং করিয়াও বহু সহস্র ব্যক্তির জীবিকা-নির্বাহ হইত। পূর্ণিয়া জেলায় রমণীগণ প্রতি বর্ষে গড়ে আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকার কার্পাস কিনিয়া যে সূতা প্রস্তুত করিতেন, তাহা বাজারে ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। তন্তুবায়দিগের ৩৫০০ তাঁতে ৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা মূল্যের বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ইহাতে শিল্পীরা প্রায় ১.৫০ লক্ষ টাকা লাভ করিতে পারিত। এতৎভিন্ন ১০,০০০ তাঁতে মোটা কাপড় বুনিয়া তাহারা ৩,২৪,০০০ টাকা লাভ করিত। সতরঞ্চী ফিতা প্রভৃতির ব্যবসায়ও অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল।

এই সকল জেলার অবস্থা হইতেই পাঠক সেকালে সমগ্র দেশে শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার কিরূপ ছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। ইংরাজ বণিকের স্বার্থপরতায় দেশের এই বিশাল বাণিজ্য ধূলিসাৎ হইয়াছে, তাই এখন ভারতে লক্ষ লক্ষ লোকে, 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও ইংরাজ সরকার ইংলণ্ডীয় বণিকদিগের মঙ্গলের জন্য ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের পুনরভ্যুদয়ের পথে কণ্টকারোপ করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। এদেশে কার্পাসজাত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি বয়নের জন্য কয়েকটি কল স্থাপিত হইতে না হইতে গবর্ণমেণ্ট বিলাতী বস্ত্রের শুল্ক হ্রাস ও দেশীয় বস্ত্রের শুল্কবৃদ্ধি করিয়া অবৈধ স্বজাতিপ্রিয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। বিগত ১৮৯৬ সাল হইতে বিলাতী বস্ত্রে শতকরা ১.৫০ টাকা কর কমাইয়া দেশীয় বস্ত্রে শতকরা ৩.৫০ টাকা নূতন শুল্ক স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার ফলে চীন ও জাপান দেশে ভারতীয় বস্ত্র-পণ্যের রপ্তানি বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। রাজা এই পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার পরিহার না করিলে এদেশীয় শিল্পের সম্যক্ উন্নতি কতদূর সম্ভবপর হইবে, তাহা প্রত্যেক দেশহিতকামী ব্যক্তিরই বিবেচনার বিষয়।

ঐতিহাসিক উইলসন যথার্থই বলিয়াছেন, "ভারতীয় পণ্যের বিলোপ-সাধনের জন্য এইরূপ গর্হিত উপায়বলী অবলম্বিত না হইলে, ম্যানচেস্টার ও পায়েসলির কাপড়ের কলগুলি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত; এমন কি, সেই কলগুলিকে বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যেও পুনরায় পরিচালিত করা সহজ সাধ্য হইত না। ফলতঃ ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের বিনাশ সাধন করিয়াই বিলাতী কলগুলিকে সজীব রাখা হইয়াছে। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন দেশ হইত, তাহা হইলে সে এই বাণিজ্য-

সংঘর্ষে আত্মরক্ষা করিতে পারিত, বিলাতী মালের উপর গুরুতর শুল্ক স্থাপন করিয়া স্বদেশীয় লাভজনক শিল্পসমূহের রক্ষা করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু এই আত্মরক্ষার ন্যায্য অধিকার ইংরাজ ভারতবর্ষকে প্রদান করেন নাই—ভারতবাসীকে বৈদেশিক বণিক সম্প্রদায়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছে।"

ইংরাজ যদি রাজশক্তির সাহায্যে এদেশবাসীর শিল্প-বুদ্ধি বিকাশের পথ রুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে বহু দিন পূর্বেই ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রাদির সাহায্যে বিবিধ শিল্পজাত উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে পারিত। ভারতবাসী সর্ব প্রথমে বিজ্ঞান-সম্মত অভিনব যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ না হইলেও যে অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় উহাদের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। ভারতবাসী অনুকরণ-ক্ষমতায় পৃথিবীর কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নহে। তথাপি ভারতীয় আর্য-সন্তানেরা যন্ত্র-বিজ্ঞানে সকলের পশ্চাৎবর্তী। ইহার একমাত্র কারণ, ভারতের রাজশক্তি এ বিষয়ে ভারতবাসীর একান্ত প্রতিকূল। এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অনেকে অবগত আছেন, ইংরাজ সর্বপ্রথম দীপশলাকার উদ্ভাবন করেন, এক সময়ে পৃথিবীতে ব্যবহৃত দীপশলাকার দশ ভাগের নয় ভাগ এক ইংলণ্ডেই প্রস্তুত হইত। কিন্তু আজকাল ফ্রান্স, বেলজিয়ম, সুইডেন ও জাপানের দিয়াশলাই ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিয়াছে। এখন এক ফ্রান্স দেশ হইতে ইংলণ্ডে ৩৭০০,০০,০০,০০০ বাক্স দিয়াশলাই আমদানি হইয়া থাকে। ইংলণ্ড "টাইপ রাইটারের" উদ্ভাবন করিলেও জগতে আজ মার্কিণ দেশীয় "টাইপ রাইটার" সর্বত্র সমাদৃত। তাহার পর লেড (বা উড) পেনসিল, পিয়ানো ও ঘড়ির ব্যবসায়ের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করুন। এক্ষেত্রেও ইংরাজ উদ্ভাবন-কর্তা, কিন্তু মার্কিণ, জর্মান ও সুইস জাতিই এই শিল্পের বাণিজ্যে এক্ষণে একাধিপত্য করিতেছেন। এখন ইংলণ্ডেই বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে পিয়ানো, ঘড়ি ও পেনসিল আমদানি হইয়া থাকে। সীবই যন্ত্র বা সেলাইয়ের কল সম্বন্ধেও সেই কথা—একজাতি উদ্ভাবন করিয়াছে, কিন্তু অন্য জাতি উহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিয়া ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে।

স্বয়ং ইংরাজেরাই ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমর-পোত-নির্মাণ-বিদ্যায় ফরাসীদিগের অপেক্ষা হীনতর ছিলেন। পরে ফরাসী জাতির নিকট হইতে সেই বিদ্যা অপহরণ করিবার জন্য একজন ইংরাজ শিল্পী দরিদ্র পান্থের বেশে ফ্রান্সে প্রেরিত হইল। সেই শিল্পী ফ্রান্সে গিয়া ফরাসীদিগের রণ-পোত-নির্মাণ-প্রণালীর প্রতি গোপনে লক্ষ্য স্থাপন করিল। কিছুদিনের গুপ্ত পর্যবেক্ষণের ফলে সে ঐ বিদ্যার পরিচয় লাভ

করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তদবধি ইংরাজের সমর-পোতসমূহ নব মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন ফরাসীদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাদিগের নৌ-নির্ম্মাণ-বিদ্যা গোপন করিবার জন্য কঠোর বিধানাদির প্রণয়ন করেন। আবার প্রতিভাবান ফরাসী শিল্পীরা রণপোত-নির্ম্মাণের উৎকৃষ্টতর প্রণালীর উদ্ভাবন করিলেন; আবার ইংরাজ গুপ্তচরের সাহায্যে সে বিদ্যার গুহ্য-তত্ত্বসমূহ সংগ্রহ করিলেন। নির্ধূম বারুদও ফরাসীর নিকট হইতেই বহু চেষ্টার পর ইংরাজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমেরিকার অস্ত্র-শিল্পীদিগের নিকট হইতে ইংরাজের ম্যাক্সিম গন প্রভৃতি বহু প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র-নির্ম্মাণের কৌশলে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।

ফলতঃ সকল জাতিই এইরূপে পরের উদ্ভাবিত শিল্প-কৌশলের অনুকরণ ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। জাপানও পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষীণালোক প্রাপ্তি মাত্র সেই পথের অনুসরণ করিয়া আপনার জাতীয় ধনবৃদ্ধি করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবাসী দেড়শত বৎসর কাল সুসভ্য যন্ত্র-শাস্ত্রবিৎ ইংরাজের সহবাসলাভ করিয়াও শিল্প-বাণিজ্যে কোনও প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারিল না। রাজশক্তির প্রতিকূলতায় ভারতবাসী বদ্ধচক্ষুঃ বলীবর্দ্দের ন্যায় এই দেড়শত বর্ষ কাল কেবল ঘানি টানিতেছে, ইচ্ছা ও বুদ্ধি সত্ত্বেও ভারতবাসী এ বিষয়ে উপায়হীন।

ভারতবর্ষের ধন-বল বিনষ্ট না হইলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ন্যায় ভারতবাসীও যন্ত্র-জাত শিল্প-বাণিজ্যে সম্যক্ উন্নতি লাভ করিতে পারিত, সন্দেহ নাই। ধন-বল থাকিলে, শিল্প-বাণিজ্যে বিদ্যা ও বুদ্ধি-বলের অভাব হয় না। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতির ইতিহাসই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উদ্ধৃত হইতে পারে। মিঃ ব্রুক্‌স্ এডাম্‌স্ "সভ্যতা ও বিনাশের নিয়ম" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

The influx of the Indian treasure, by adding considerably to the nations cash capital, not only increased its stock of energy, but adding much no its flexibility and the rapidity of its movement.

Very soon after Plassy, the Bengal plunder began to arrive in London, and the effect appears to have been instantaneous; for all authorities agree that the "industrial revolution," the event which divided the 19th century from all antecedent time began with the year 1760. Prior to 1760 according to Baines, the machinery used for spinning cotton in Lancashire was almost as simple as in India; while about 1750 the English iron industry was in full decline .....At

that time four-fifths of the iron used in the kingdom came from Sweden.

Plassy was fought in 1757, and probably nothing has ever equalled the apidity of the change which followed..... In themselves inventions are passive, many of the most important having lain dormant for centuries, waiting for a sufficient store of force to have accumulated to set them working. That store must always take the shape of money and money not hoarded, but in motion.

From 1694 to Plassy, the growth (of Banks) had been relatively slow . ...Writing in 1760 Burke mentioned that when he came to England in 1750 there were not "twelve bankers" shops in the provinces, though then, he said, they were in every market town. Thus the arrival of the Bengal silver not only increased the mass of money, but stimulated its movement.—*Law of Civilisation and Decay* by Brooks Adams. pp. 259-64.

ভারতীয় ধনরাশির বিলাতে আমদানি হওয়ায় শুদ্ধ যে ইংলণ্ডের জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল, তাহা নহে ; উহাতে জাতীয় উদ্যমশীলতার বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নতির বেগ দ্রুততর হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বঙ্গের লুণ্ঠিত ধন বিলাতে আনয়নের সূত্রপাত হয় ; তাহার সুফলও সঙ্গে সঙ্গে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বিলাতের ল্যাঙ্কাশায়ারে সূতা প্রস্তুত করিবার কল কারখানা ও লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদির ব্যবসায়ের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল ; তখন বিলাতে সুইডেন হইতে অধিকাংশ লৌহনির্মিত দ্রব্যাদির আমদানি হইত ; কিন্তু ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর বিদ্যুদ্বেগে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হইল।

উদ্ভাবনী শক্তি জাতীয় জীবনে সুপ্তভাবে অবস্থিতি করে। উদ্দীপনা না পাইলে উহার স্ফূর্তি হয় না। যন্ত্রাদির উদ্ভাবন ও সকল সময়ে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে পারে না। অনেক বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্রও উদ্ভাবিত হইবার পর, তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার শক্তির অভাবে দীর্ঘ কাল অকর্মণ্য অবস্থায় পড়িয়াছিল ; অর্থ-বল সংগৃহীত হইলে সেগুলি কার্য্যোপযোগী হয়। প্রভূত অর্থ-শক্তির সাহায্যেই সকল দেশে যন্ত্রাদি যথারীতি পরিচালিত হইয়া থাকে।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কের অবস্থাও অতি শোচনীয় ছিল। কিন্তু পলাশীর পরে বঙ্গীয় রজতের আমদানির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ব্যাঙ্ক সমূহের প্রতিষ্ঠা

হইতে লাগিল। টাকা জমা হওয়ার টাকা খাটাইবার দিকে লোকের প্রবৃত্তি ধাবিত হইল।

যে অর্থবলে ইংলণ্ডীয় শিল্প-সমাজে নবযুগের আবির্ভাব হইল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদিগের দৌরাত্ম্যে আমরা সেই অর্থ-বলে বঞ্চিত হইলাম। পরন্তু নানা কঠোর বিধান প্রণয়ন করিয়া আমাদিগের দেশীয় শিল্পের উন্নতির পথও রুদ্ধ করা হইল। জাপান, জার্মানি, মার্কিন, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক ও সুইজারল্যাণ্ডের লোকে যে সকল সুবিধা-লাভ করিয়াছিলেন, ভারতবাসী রাজশক্তির প্রতিকূলতায় সে সকল সুবিধা অদ্যাপি লাভ করিতে পারিল না। কোম্পানির আমলে আমাদের শিল্পোন্নতির পথে কেবল যথাসাধ্য কণ্টকই আরোপিত হয় নাই, উহার মস্তকে কঠোর বজ্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক উইলসন এই কথা স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপে ভারতবাসীর সর্বনাশ সাধন করিয়াও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টার মিঃ সেণ্ট জর্জ টকার মহোদয় অম্লানবদনে বলিয়াছেন,—

No government ever manifested, perhaps a more constant solicitude to promote the welfare of a people and it is with satisfaction and with pride that I can bear an almost unqualified testimony in its favour.

ইহার সহিত ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব সেনাপতি লর্ড উলজ্লী মহোদয়ের পশ্চাল্লিখিত উক্তি পাঠ করিলে রাজপুরুষদিগের বচনবাগীশতা পরিস্ফুট হইবে।

As a nation we are bred up to feel it a disgrace even to succeed by falsehood. —*The Soldier's Pocket Book for Field Service.*

রাজশক্তির আনুকূল্য ঘটিলে ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের পুনরভ্যুদয় এখনও সম্ভবপর। আমাদের রাজপুরুষেরা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যেরূপ যত্ন-প্রকাশ করিয়া থাকেন, ভারতবাসী কৃষ্ণাঙ্গ প্রজার শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য যদি তাহার অর্ধেক যত্নও প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে এদেশের অনেকের অন্নের সংস্থান হইত। নীলের ব্যবসায়ের অবনতি নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট কত অর্থব্যয় করিয়াছেন, সে জন্য কত রাসায়নিক পণ্ডিতের নিয়োগ হইয়াছিল, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ভারতে চা-পানের প্রসার-বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষ "টী-সেস" নামক কর বসাইয়াছেন। রপ্তানী চায়ের উপর এই শুল্ক বসান হইয়াছে। বৈদেশিক ক্রেতাদিগের নিকট হইতে টী-সেস আদায় করা হয়। সেই শুল্কলব্ধ অর্থ কর্তৃপক্ষ চায়ের ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধনের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন। চা ও নীলের

ব্যবসায়ে শ্বেতাঙ্গেরা লিপ্ত আছেন বলিয়া এই দুই ব্যবসায়ের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ঈদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ অনুগ্রহ যদি দেশের অন্যান্য শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতি প্রদর্শিত হইত, তাহা হইলে আজ আমাদিগের নিশ্চিত অবস্থান্তর ঘটিত। চামড়ার উপর ইদানীং যে রপ্তানি শুল্ক আছে গবর্ণমেণ্ট তাহার মাত্রা যদি কিঞ্চিত বৃদ্ধি করেন, এবং সেই অতিরিক্ত শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থ যদি এদেশে পাশ্চাত্য চর্ম্ম-পরিষ্করণবিদ্যার প্রবর্তনে ব্যয় করেন, তাহা হইলে কত নিরন্নের অন্ন-সংস্থান হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এদেশ হইতে রাশি রাশি কাঁচা চামড়া আমেরিকার মহাজনেরা লইয়া যায় এবং সেই চর্মকে পরিষ্কৃত ও সুরঞ্জিত করিয়া পুনরায় চতুর্গুণ মূল্যে এই দেশেই আনিয়া বিক্রয় করে। রাজপুরুষেরা দেশীয় চর্মকারদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সম্মত চর্ম-পরিষ্করণ শিখাইলে ধনাগম হইত, সন্দেহ নাই। এইরূপে অন্যান্য রপ্তানি কাঁচা মালের উপর অতিরিক্ত শুল্ক স্থাপন করিয়া কর্তৃপক্ষ লব্ধ অর্থে এদেশের বহু শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন।

কিন্তু এই মুষ্টিযোগে ভারতীয় সকল শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর নহে। জর্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ন্যায় এদেশেও রক্ষা-শুল্কের প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় শিল্পীদিগকে বৃত্তিদান (bounty) করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জর্মান গবর্ণমেণ্ট শর্করা-ব্যবসায়ীদিগকে প্রভূত বৃত্তিদান করিয়া স্বদেশীয় শর্করা ভারতে বহুল পরিমাণে প্রচলিত করিয়াছেন। মার্কিন গবর্ণমেণ্ট স্বদেশীয় কাগজের কারখানাগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য বৈদেশিক কাগজের উপর শতকরা ৫০ টাকা হারে শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন। আমেরিকায় কয়েক বৎসর হইতে তিসির চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এই শিশু-ব্যবসায়ের রক্ষার জন্য মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে ভারতীয় তিসি ও তৈলের উপর গুরু-শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন। কাজেই মার্কিণে "কলিকাতা ওয়েল" (Calcutta oil) নামে পরিচিত ভারতীয় তিসির তৈলের আমদানি কমিয়াছে। এদেশের শিল্পবাণিজ্যের রক্ষা করিতে হইলে ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই সংরক্ষিত বা অবাধ বাণিজ্য-নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, এদিকে রাজ-পুরুষদিগের আদৌ দৃষ্টি নাই। এখনও যদি এবিষয়ে তাঁহাদিগের সানুগ্রহ দৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে ত্রিশ কোটী রাজভক্ত প্রজা তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিবে।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজ-শক্তির আনুকূল্য ভিন্ন কোনও দেশেই কখনও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে নাই। বর্তমান কালের পাশ্চাত্য বণিক্ সম্প্রদায় অনুকূল রাজ-শক্তির বলেই পৃথিবীর সর্বত্র আপনাদিগের বাণিজ্যাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের

বাণিজ্যাধিপত্য রাজশক্তির বলেই ঘটিয়াছে। যে জর্মানির বাণিজ্যের প্রবল স্রোতে আজ ইংরাজ বণিক্ ও শিল্পি-কুল ভাসিয়া যাইতেছেন, প্রতিপদে জর্মান শিল্প ইংলণ্ডীয় শিল্পকে পরাস্ত ও স্থানচ্যুত করিতেছে, সেই জর্মানি যদি এক মুহূর্তের জন্য স্বীয় রাজশক্তির সংহরণ করেন, তাহা হইলে এই বিশাল জর্মান বাণিজ্য নিমেষ মধ্যে জলের তিলকের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইতে পারে, একথা বিশেষজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই। তাই আমরা ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে রাজশক্তির আনুকূল্য কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি। যদি এ আনুকূল্যলাভ আমাদিগের ভাগ্যে না ঘটে, তাহা হইলে সহস্র "স্বদেশীয় ভাণ্ডারের" প্রতিষ্ঠা করিলেও কোনও ফললাভ হইবে না। রক্ষা-শুল্কের প্রবর্তন ভিন্ন দেশীয় শিল্পের উন্নতি কখনই সম্ভবপর হইবে না।

দেশের আয়-ব্যয়

India is a poor country, and cannot afford a good, expensive and scientific Government. Our Government is already far too expensive and gets more so every year. The departments to cut down would not, in my opinion, be far to seek. Native industries should be more protected to the exclusion, for instance, of Manchester trade.—Mr. Harris, Deputy Commissioner, the Panjab.

যে দেশে ২২ কোটী প্রজার মধ্যে দশ কোটী প্রজা সুভিক্ষের বৎসরেও অর্ধাশনে কালযাপন ও দুর্ভিক্ষকালে দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, যে দেশকে স্বয়ং ভারত সচিব পর্য্যন্ত **very very poor country,** বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই দেশের শাসন-কার্য্য যত স্বল্পব্যয়ে সম্ভব, সম্পন্ন করাই যুক্তিসঙ্গত, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এদেশের লোকেরা স্বভাবতঃ যেরূপ রাজভক্ত, শান্তশিষ্ট ও ধর্মভীরু, তাহাতে তাহাদিগের শাসনের জন্য অধিক আয়াস ও ব্যয়-স্বীকারের কোনও আবশ্যকতাই উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এদেশের শাসন-কার্য্যে ইংরাজ যেরূপ ব্যয়-বাহুল্য করিয়া থাকেন, পৃথিবীর আর কোনও দেশে অনুরূপ অবস্থায় সেরূপ ব্যয় হয় কি না সন্দেহ। যিনি সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান কর্ণধার, বিলাতের সেই প্রধান মন্ত্রী মহাশয়কে ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে বাৎসরিক ৭৫,০০০ টাকা বেতন প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের একাংশস্বরূপ দরিদ্র ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি বড়লাট বাহাদুরকে চিরদুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজার অর্থ হইতে বার্ষিক ২,৫০,৮০০ টাকা বেতন

দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন ভাতা, বাঁটার ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি উপলক্ষেও তিনি বহুসহস্র মুদ্রা পাইয়া থাকেন। এরূপ উচ্চ হারে বেতন পাইয়াও তিনি সন্তুষ্ট নহেন। অল্পদিন পূর্বে স্বীয় বেতনবৃদ্ধির জন্য তিনি বিলাতে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। দরিদ্র ভারতবাসীর সৌভাগ্যক্রমে সে আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। সে যাহা হউক, এই একটি ঘটনাতেই ভারতীয় প্রজার অর্থ কিরূপ মুক্তহস্তে ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভারত-সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের আলোচনা করিলে এরূপ ব্যয়বাহুল্য নানাদিকেই পরিদৃষ্ট হয়।

ইতঃপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা সমাজের প্রতিনিধি ও ধন-রক্ষক। সভ্যদেশে—বিশেষতঃ বৃটিশ রাজ্যে রাজকোষের সমুদায় অর্থ "প্রজার সাধারণ সম্পত্তি" বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বৃটিশ-ভারতীয় রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহাও পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে প্রকৃত পক্ষে বৃটিশ-ভারতীয় প্রজারই সম্পত্তি। তাই রাজকোষের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে আমাদিগের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্ক-বিতর্ক করিবার অধিকার আছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয় প্রকৃত পক্ষে "আমাদিগেরই দেশের আয়-ব্যয়"। দেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেশবাসীর জানা কর্তব্য। বৈদেশিক রাজপুরুষেরা অবৈধ ক্ষমতা-প্রিয়তার বশীভূত বা ভ্রান্ত-নীতির পক্ষপাতী হইয়া প্রজার গচ্ছিত সম্পত্তির অপব্যয় করিলে, বিধি-সঙ্গত উপায়ে তাহার প্রতিবাদ করাও আমাদের কর্তব্য।

আমাদের গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয় এতদিন সর্বপ্রকার ১১০ কোটী টাকা ছিল। বিগত চারি বৎসরের হিসাবে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, কয়েক বৎসর হইতে ক্রমাগত ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯০০।১ সালে প্রায় ১১৩ কোটী, ১৯০১।২ সালে ১১৪'৫০ কোটী, ১৯০২।৩ সালে ১১৬ কোটী ও ১৯০৩।৪ সালে ১২৪'৫০ কোটী টাকা আয় হইয়াছে। বৃদ্ধির হার যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটিলে, আগামী বর্ষে অন্যূন ১১৬ কোটী টাকা রাজস্ব আদায় হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ব্যয়ের অঙ্ক আয়েরই অনুরূপ। রাজপুরুষেরা আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে না পারায় আমাদিগের কিছু ঋণও হইয়াছে। সেই ঋণ "সার্বজনিক ঋণ" নামে পরিচিত। এই সার্বজনিক ঋণের পরিমাণ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড (বা তখনকার হিসাবে ৫১,০০,০০,০০০ টাকা) ছিল। এক্ষণে সেই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩,১০,০০,০০,০০০ টাকা হইয়াছে। এই ঋণের দায়ে দেশীয় ও বৈদেশিক মহাজনদিগের নিকট ভারতবর্ষের রেল, খাল, বিল, বন জঙ্গল ও প্রজার কৃষিক্ষেত্রাদি বন্ধক আছে।

এই প্রায় ৩১৫ কোটী টাকা ঋণের মধ্যে ভারতীয় ধনবান ব্যক্তিদিগের নিকট গবর্ণমেণ্ট প্রায় ১১৯ কোটী ১৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ধার করিয়াছেন। অবশিষ্ট ১৯৫ কোটী ৪৬ লক্ষ ৬'৫০ হাজার টাকা ইংলণ্ডীয় মহাজনদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই ঋণের নিমিত্ত দরিদ্র ভারতবাসীকে বার্ষিক ৯ কোটী ৫২'৫০ লক্ষ টাকা সুদ দিতে হয়। এই সুদের অর্ধাংশ বিলাতের মহাজনেরা পাইয়া থাকেন। সার্বজনিক ঋণের ৩.৫ কোটী টাকার মধ্যে ১৭৫ কোটী ৭৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা রেলপথ বিভাগের জন্য ও ৩৭ কোটী ও :৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা জল-পূর্তের জন্য ধার করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ১০৩ কোটী ৭৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকার মধ্যে ৭৬ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ভূতপূর্ব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারতবর্ষের স্বত্ব ক্রয় করিবার জন্য ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ধার করা হয়। তখন ইহার পরিমাণ ৫১ কোটী টাকা (অর্থাৎ ৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড) ছিল। এখন পাউণ্ডের দর বৃদ্ধি হওয়ায় ৫১ কোটীর স্থলে ৭৬'৫০ কোটী হইয়াছে! বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট আমাদের সার্বজনিক ঋণের প্রায় কিছুই পরিশোধ করিতে পারেন নাই। যদি কোম্পানিকে প্রদত্ত ৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ডের ঋণ কর্তৃপক্ষ এত দিন শোধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধির জন্য ৫১ কোটী টাকা এক্ষণে অকারণে ৭৬ কোটী ৫০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইত না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ দেশের লোকের নিকট হইতে নানাপ্রকারে প্রায় সহস্র কোটী মুদ্রা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের হস্ত হইতে ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করিবার সময় তাঁহাদিগকে ৮১ কোটী টাকা ক্ষতিপূরণ বা মূল্য স্বরূপ দেওয়া হইল। কোম্পানির নিকট হইতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারত-রাজ্য ক্রয় করিলেন; সুতরাং ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে ভারত-সাম্রাজ্যের মূল্য প্রদত্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হইল না। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারত-সাম্রাজ্যের লভ্যাংশের ভাগী হইবেন জানিয়াও "পণের টাকা" ভারতবাসী প্রজার নামে খরচ লিখিয়া রাখিলেন। অর্থাৎ আমরাই পণের টাকা দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিলাম। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিন্দুমাত্র শোণিত বা একটি কপর্দকও ব্যয় না করিয়া ত্রিংশ কোটী ভারতবাসীর প্রভুত্বের অধিকারী হইলেন! ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপার্জিত রাজত্বের মূল্যদান করিল—ভারতবাসী, কিন্তু রাজ্যাধিকারী হইলেন—ইংরাজ! তাহারা অর্ধ শতাব্দী কাল রাজ্য-শাসন করিতে না করিতে নিত্য-অনশন-পীড়িত রাজভক্ত প্রজাপুঞ্জকে ৩১৫ কোটী টাকার ঋণপঙ্কে নিমজ্জিত করিলেন! এরূপ অপূর্ব ঘটনা জগতের ইতিহাসে আর কোথাও দৃষ্ট হয় কি?

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৮২ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। ১৮৯৬ সালে উহা কমিয়া ৬৫ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষেরা ৩৬ বৎসরে ১৭ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ভারতীয় ঋণের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়াছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এদেশের ঋণের পরিমাণ ৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড বা ৫১ কোটী টাকা ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৯৭ কোটী টাকা হয়। তৎপরবর্তী ৪০ বৎসরে উহা ৩০৬ কোটী টাকায় পরিণত হইয়াছে। গত দুই বৎসরে আরও ৮'৭৫ কোটী টাকা ঋণ স্থায়িভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বিগত ৫০ বৎসরে রাজ্যের আয় যেমন বাড়িয়াছে, ঋণও সেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে। ঋণ-প্রিয়তায় ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় অশিক্ষিত কৃষকদিগকেও পশ্চাৎপদ করিয়াছেন।

১৯০৩—১৯০৪ সালে আয়-ব্যয়ের সম্পূর্ণ হিসাব নিকাশ এখনও হয় নাই। এই কারণে ১৯০২-৩ সালের আয়-ব্যয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। ঐ সালে সর্বশুদ্ধ ভারত গবর্ণমেণ্টের ১১৬ কোটী ১৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৭২৫ টাকা আয় হইয়াছিল। এই আয়ের মধ্যে ভূমি-রাজস্বের প্রায় ২৭ কোটী ৬৪'৫০ লক্ষ, অহিফেনে ৬ কোটী ৭৪ লক্ষ ৭৬'৫০ হাজার, লবণ শুল্কে ৯ কোটী ২৭ লক্ষ ৬৫ হাজার, ষ্ট্যাম্পে ৫ কোটী ২০ লক্ষ, আবগারিতে ৬ কোটী ৬৩ লক্ষ, প্রাদেশিক রাজস্বে (প্রবিন্সিয়াল রেণ্টস্) ৪ কোটী ১২ লক্ষ, আমদানি রপ্তানি শুল্কে ৬ কোটী ৩'৫০ লক্ষ, বিবিধ করে ২ কোটী ১১'৫০ লক্ষ, বন-বিভাগে ১ কোটী ৯৪'৭৫ লক্ষ, রেজিস্ট্রেশনে ৫৭ লক্ষ ৩ হাজার ৮ শত ও দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট প্রাপ্ত করে ৯২ লক্ষ ৫ হাজার ৭২৮ টাকা আদায় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য আয়ও আছে। সর্বসমেত ৭১ কোটী ৭ লক্ষ ১৩'৫০ হাজার টাকা প্রজার নিকট হইতে কর-স্বরূপ আদায় হইয়া থাকে। রেল, ডাক, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ব্যবসায়-মূলক বিভাগের আয় অবশিষ্ট ৪৫ কোটী টাকা।

রাজস্বের এই ৭১ কোটী টাকার মধ্যে ভূমিকর, লবণকর, ষ্ট্যাম্পকর ও বনকর প্রজার পক্ষে কতদূর কষ্টদায়ক, তাহার একটু বিশদরূপে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। ভূমির করের আদায় কার্যে যেরূপ কঠোর নীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে, ইতঃপূর্বে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা গিয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য করের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

লবণের ন্যায় সর্বজন-প্রয়োজনীয় দ্রব্যে প্রতিমণে ২'৫০ টাকা কর এত দিন আদায় করা হইয়াছে। গত বৎসরের প্রারম্ভ হইতে ২ টাকা শুল্ক আদায়ের আদেশ হইয়াছে। পৃথিবীর কোনও দেশেই লবণের উপর এরূপ অস্বাভাবিক গুরু

শুল্ক গৃহীত হয় না। লবণের শুল্ক বৃদ্ধি হওয়ায় লবণের কাটতি যে কমিয়াছে, একথা সরাকারি রিপোর্টেই প্রকাশ। ইংরাজের আগমনের পূর্বে ভারতের অধিকাংশ স্থলেই লবণের উপর কুড়ি মণে ১'৫০ টাকা হইতে ১'৭৫ টাকার অধিক কর ছিল না। তখন লবণের দরও ৫৩ পয়সা হইতে ৬৫ পয়সা মণ ছিল। দরিদ্র লোকে তখন যথেষ্ট লবণ খাইতে পাইত, গো মহিষাদিও লবণ-সেবনে বঞ্চিত হইত না। এক্ষণে লবণের উপর পঞ্চবিংশ গুণ কর বৃদ্ধি হওয়ায় দরিদ্রদিগের পক্ষে লবণ দুর্লভ হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন, খাদ্যে লবণের পরিমাণ হ্রাস হইলে ওলাউঠা, প্লেগ, রক্তপিত্ত জ্বর প্রভৃতি রোগের আক্রমণ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ভারতবাসী এই সকল রোগের আক্রমণে দিন দিন জীর্ণ হইতেছে, তথাপি কর্তৃপক্ষ লবণের উপর গুরু শুল্ক আদায় করিয়া থাকেন।

এক মণ লবণ প্রস্তুত করিতে সাধারণতঃ ছয় পয়সা হইতে দুই আনা পর্যন্ত খরচ পড়িয়া থাকে। দুই আনার মালের উপর দুই টাকা করও নিঃসন্দেহ ঘোর নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বৎসরে প্রতি জনে অন্ততঃ ১০ সের লবণ-ব্যবহার আবশ্যক। কিন্তু করের আধিক্যবশতঃ লবণ অক্রেয় হওয়ায় ভারতবাসী বৎসরে গড়ে জনপ্রতি ৬'৫ সেরের অধিক লবণ ভক্ষণ করিতে পায় না। বলা বাহুল্য, সঙ্গতিপন্ন পরিবারেরা এই ৬'৫০ সেরের অধিক যে পরিমাণ লবণ ভক্ষণ করেন, দরিদ্রজনেরা সেই পরিমাণে কম লবণ পাইতেছে। আবার গো-মহিষাদির জন্য যে লবণ ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহাও উক্ত গড় ৬'৫ সেরের অন্তর্গত। সুতরাং অতিরিক্ত করের জন্য এদেশের দরিদ্র জন-সমাজকে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কত কম লবণ সেবন করিয়া দিন যাপন করিতে হইতেছে, ইহা হইতে তাহা সম্যক বুঝিতে পারা যায়। সকল দেশেই বিলাস দ্রব্যের উপর কর বসান হইয়া থাকে। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে লবণের উপর কর বসান হইয়া থাকে। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে লবণের ন্যায় স্বাস্থ্য রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপরও অতি গুরুতর শুল্ক স্থাপিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বৈদেশিক লবণ আমদানির বিষয়ও সংক্ষেপে আলোচ্য। পূর্বে লবণের ব্যবসায়ে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান নরপতিগণের একাধিপত্য ছিল না। সমুদ্রতীরে নানাস্থানে দেশীয় মহাজনদের লবণ উৎপাদনের কারখানা ছিল। তখন দেশে যে লবণ উৎপন্ন হইত, তাহাতেই দেশবাসীর অভাব দূর হইত; বিদেশ হইতে লবণ আমদানি করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি হইত না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত দেশের লবণ ব্যবসায়েরও বিস্তার ঘটিত। কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া করায় দেশীয়দিগের অবাধ বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটিয়াছে, দিন দিন

বিদেশ হইতে বহু লবণ আমদানি করিতে হইতেছে, বৈদেশিক লবণের আমদানি বিগত দশ বৎসরে শতকরা ৩৮ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৯১৷২ সালে বিলাত হইতে ৬০ লক্ষ ২ হাজার ১ শত মণ লবণ এদেশে আসিয়াছিল, ১৯০১৷২ সালে প্রায় ৭০ লক্ষ মণ আসিয়াছে। অন্যান্য দেশের লবণেরও আমদানি বাড়িয়াছে। ১৮৯১৷২ সালে ভারতে সর্বশুদ্ধ ১ কোটী ৯৮ হাজার মণ লবণ আমদানি হইয়াছিল, গত ১৯০১৷২ সালে ২ কোটী ৪১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪০০ মণ আমদানি হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি দেশীয় বণিকদিগকে উৎসাহ দান করেন, তাহা হইলে এই লবণাম্বু-বেষ্টিত ভারতে বিদেশের লবণ আনয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনায়াসে দূরীভূত হইতে পারে।

গত বৎসর লবণের শুল্ক হ্রাস করায় এদেশে লবণের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, শুল্ক হ্রাসের ফলে দেশে লবণের ব্যবহার যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে কর লাঘবের জন্য রাজকোষের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজেই পরিপুরিত হইবে। ফলতঃ যদি কর্তৃপক্ষ লবণের শুল্ক অর্ধেক কমাইয়া দেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ লবণের কাটতি দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। ফলে প্রজাপুঞ্জের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে এবং লবণের ব্যবহার বৃদ্ধির সহিত রাজকোষেরও ক্ষতির আশঙ্কা দূরীভূত হয়। এই সকল কারণে মাননীয় অধ্যাপক গোখলে লবণের শুল্ক আরও মণ করা অন্ততঃ আট আনা কমাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই যুক্তি-সঙ্গত প্রার্থনায় রাজপুরুষেরা কর্ণপাত করেন নাই। পরন্তু প্রার্থনাকারীকে তিরস্কার বাক্যে মর্মপীড়িত ও প্রত্যাখ্যাত করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে এদেশে মাদক দ্রব্যের প্রসার বৃদ্ধি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। পঞ্চবিংশ বৎসরের পূর্বে দেশে যে পরিমাণ মাদক দ্রব্য বিক্রয় হইত, তাহাতে গবর্নমেণ্টের ২ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। এক্ষণে আবগারি বিভাগের সরকারি আয় ৭ কোটী টাকা হইয়াছে। রাজা কোথায় প্রজার চরিত্র-বল-বর্ধনে সহায়তা করিবেন, না অর্থলোভে অন্ধ হইয়া প্রজার মাদক দ্রব্যে আসক্তি বৃদ্ধি ও পশুত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন। দেশবাসীকে জ্ঞানদান করিবার জন্য প্রতি গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কর্তৃপক্ষের তাদৃশ আগ্রহ দৃষ্ট হয় না ; কিন্তু মদ, গাঁজা, আফিমের দোকান যাহাতে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই খোলা হয়, সেজন্য তাঁহাদিগের বিশেষ যত্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আদমসুমারির রিপোর্টে প্রকাশ, বৃটিশ ভারতে পল্লীগ্রামের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ। তন্মধ্যে কেবল এক-পঞ্চমাংশ গ্রামে বিদ্যালয় আছে। অবশিষ্ট পাঁচভাগের চারিভাগ গ্রামে লেখা পড়া শিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত নাই। কিন্তু অনেক গ্রামেই মাদক দ্রব্যের

দোকান আছে। মাদক প্রসারে কর্তৃপক্ষের অনুরাগ ও জনসাধারণের ক্ষতি-সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে; এক্ষণে কেবল ধর্মপাল মহাশয় আমেরিকায় বক্তৃতাকালে গত ২০শে আগস্ট যে মত প্রকাশ করেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

If you were to go through the village of India and Ceylon you would find that there are no schools, and that British Government makes it a very expensive matter to obtain an education. But on the other hand it is comparatively easy to carry on the liquor traffic : hence in many of these villages you will find the British liquor dealer, who has gone there add opened a saloon. He generally begins with the children, by enticing them to come and taste of his liquor free. Thus a drinking community is manufactured. If the people say, "we do not want it", the Government, backed with big guns comes and says. "You must have it," This was the cause of the war in China.

সুখের বিষয়, এতদিন পরে গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, যে, তাঁহারা আর আবগারি বিভাগের রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন না। এই প্রতিশ্রুতি কার্যকালে রক্ষিত হইলে প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃপক্ষের ধন্যবাদ করিবে।

ষ্ট্যাম্পের আইনও লোকের সামান্য যন্ত্রণার কারণ নহে। বর্তমান কালের ন্যায় বিচার-বিক্রয় এদেশে কখনও ছিল না। অধিকতর পরিতাপের বিষয় এই যে, ধনশালী ইংলণ্ডে যে হারে ষ্ট্যাম্পের মূল্য গৃহীত হয়, দরিদ্র ভারতে তদপেক্ষা অধিক করদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিলাতে বন্ধকী স্বত্ব-বিষয়ক দলিলে ৫ পাউণ্ড ৭৫ টাকায় ৩ পেন্স বা তিন আনা, ৫০০ পাউণ্ড বা ৭৫০০ টাকায় ১ পাউণ্ড বা ১৫ টাকার কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। ভারতবর্ষে ঐরূপ দলিলের জন্য ৫০ টাকায় চারি আনা ও এক হাজার টাকায় পাঁচ টাকা লাগে। বিলাতে সম্পত্তির হস্তান্তর বিষয়ক দলিলে ৫ পাউণ্ড বা ৭৫ টাকায় ৬ পেন্স বা ছয় আনা এবং ২০০ পাউণ্ড বা ৩০০০ টাকায় ১৫ টাকা গবর্ণমেণ্ট লইয়া থাকেন। ঐরূপ কার্যে ভারতবর্ষে ৫০ টাকায় আট আনা এবং এক হাজার টাকায় ১০ টাকা গৃহীত হয়। এদেশে ২০ টাকার অধিক মূল্যের রসীদে এক আনার ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতে হয়; বিলাতে ত্রিশ টাকার খতে এক পেন্সের (আনার) রসীদ ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন ষ্ট্যাম্প-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েও ভারতবাসীকে বিলাতের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজস্ব দান করিতে হয়।

পূর্বে দেশে যে পঞ্চায়েৎ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা ইংরাজের নীতি কৌশলে বিনষ্ট হওয়ায় লোকের আত্ম-শাসন-শক্তি ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়াছে। কাজেই সর্বস্বান্ত হইলেও লোকের মামলা-মোকদ্দমায় প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।* ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এদেশে সর্বশুদ্ধ ২০,০১,৩৮৪টি দেওয়ানি মোকদ্দমা হইয়াছিল, গত ১৯০১ সালে ২২,২৮,৫৫৬টি হইয়াছে।

ইংরাজের আমলে বৃটিশ ভারতে বনবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দরিদ্র প্রজাকুলের ইন্ধনের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড মহোদয়ের রাজ্যাভিষেক-কালে ভারতবর্ষের কোনও কোনও অঞ্চলের প্রজাগণ বিনা শুল্কে কাষ্ঠ আহরণের অধিকার প্রার্থনা করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, প্রজার সেই সামান্য প্রার্থনাও পূর্ণ হয় নাই। বলা বাহুল্য, পূর্ববর্তী রাজ্যদিগের শাসনকালে ভারতীয় প্রজার জঙ্গল হইতে কাষ্ঠাহরণের অধিকার অক্ষুন্ন ছিল। শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষেরা সে অধিকার হরণ করায় দরিদ্র প্রজার ব্যয় ও ক্লেশ উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাণিজ্য সংগ্রামে পরাভূত ধন-বল-হীন প্রজার লবণ, বিচার ও কাষ্ঠ-সংগ্রহে ব্যয়-বৃদ্ধি কখনই সুখকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বনবিভাগের জন্য ভারতের অনেক স্থলে প্রজাপুঞ্জের গোচারণ বিষয়ে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

এই সকল কারণ ব্যতীত অন্য বহু কারণেও প্রজার কষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ২০ বৎসরের মধ্যে রাজকোষে যখনই অর্থাভাব ঘটিয়াছে, তখনই রাজস্ব সচিব মুদ্রার মূল্য-হ্রাসকে তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ পূর্বক অর্থাভাব দূরীকরণের জন্য প্রজার উপর অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাভাবের জন্য প্রথমে দুর্ভিক্ষে সাহায্য-দান বন্ধ করা হইয়াছিল। ১৮৮৬, ১৮৮৭ ও ১৮৮৮ এই তিন সালে কর্তৃপক্ষের অর্থাভাবের জন্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজা কোন প্রকার রাজ সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার পর দুই বৎসর ঐ সাহায্যের পরিমাণ আংশিক লাঘব

* কোইম্বাটুরের ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট ও মান্দ্রাজ মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মিঃ আরুণ্ডেল বলেন,—

It is a singular feature, of the centralising tendency of our bureaucratic rule, that the village communities have lost much of the power of self-rule and self-help they formerly possessed. The native jury-system, the *punchayt* has been rudely shaken.

ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও কৃষিবিভাগীয় ভূতপূর্ব সেক্রেটারী স্যার এডোওয়ার্ড বক্ অল্পদিন পূর্বে বোম্বাইয়ের মালাবারি মহাশয়কে ভারতের পল্লী-সমাজের পুনর্গঠনের অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে,—

During the first half of the last century, we destroyed the village community in this part of India, Sir Richard Temple strikes the final blow in the Central provinces.

করা হয় এবং পরে উহা স্থায়িভাবেই কম করা হইল। কাজেই প্রজার কষ্ট বাড়িল। কিন্তু ইহাতেও গবর্ণমেণ্টের কল্পিত অর্থাভাব দূরীভূত হয় নাই। কাজেই তাঁহারা ক্রমাগত প্রজার করভার বৃদ্ধি করিয়া আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৮৩।৪ সাল হইতে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট নয় বার প্রজার উপর নূতন কর সংস্থাপন করিলেন।

প্রথমতঃ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আয়কর প্রবর্তিত হয়। তাহার এক বৎসর পরেই ১৮৮৭।৮ সালে লবণের শুল্ক-বৃদ্ধি ঘটে। পরবর্তী বর্ষে পাটওয়ারি ট্যাক্স ও কেরোসিন তৈলের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশবাসীকেও সেই বৎসর আয়করের অধীন করা হইল। তাহার পর বৎসর বিদেশী মদ্যের উপর কর্তৃপক্ষ আমদানি মাশুল বসাইলেন। ১৮৯০-৯১ সালে দেশীয় মদ্যের উপরেও কর বসিল। ১৮৯২-৯৩ সালে ব্রহ্মদেশে লোণা মৎস্যের উপর আমদানি মাশুল বসে। ১৮৯৩-৯৪ সালে কার্পাসজাত সামগ্রী ভিন্ন অন্য পণ্যের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে কর পুনঃ সংস্থাপন করা হয়। পরিশেষে ১৮৯৪-৯৫ সালে কার্পাসজাত পণ্যের উপরেও কর্তৃপক্ষ আমদানি মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পণ্য শুল্ক সম্বন্ধে যে পরিবর্তন হয়, তাহার ফলে বিলাতের আমদানি কার্পাস সূত্রের উপর যে, শতকরা ৫ টাকা কর আদায় করা হইত, তাহা রহিত হইয়া গেল। তদ্ভিন্ন বৈদেশিক বস্ত্র-জাতের আমদানি মাশুল কমাইয়া ৫ টাকার স্থলে ৩'৫০ সাড়ে তিন টাকা করা হইল। এইজন্য গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়কুলের মঙ্গলের জন্য গবর্ণমেণ্ট সে ক্ষতি সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন এবং ভারতীয় কলের কাপড়ের উপর শতকরা ৩ ৫০ টাকা কর বসাইয়া সেই ক্ষতির আংশিক পূরণ করিলেন।* ১৮৯৯ সালে বৈদেশিক বৃত্তিপুষ্ট শর্করার উপর আমদানি মাশুল বসান হইয়াছে। এইরূপে বার বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত শুল্ক সমূহের সংস্থাপনে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয় প্রায় ১২ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এইখানেই গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধির শেষ হয় নাই। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভূমির রাজস্বও উক্ত দ্বাদশবর্ষের মধ্যে বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ রাজস্বের পরিমাণই দুই কোটী ৮২ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিগত ৮ বৎসরের মধ্যে, দেশে দুইবার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষপাত হইলেও,

---

* A 3½ per cent duty in cloth is equivalent to about a 7 per cent duty on weaving capital; since the produce per loom sells for about twice as much as the value of the fixed capital per loom —*The Cotton Industry of India and the Cotton duties* by B. J. Padshah.

রাজকোষে ভূমির রাজস্ব অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৯৬ সাল হইতে বিগত ১৯০১ সাল পর্যন্ত গবর্ণমেণ্ট গড়ে বার্ষিক ২৬ কোটীর অধিক টাকা প্রজার নিকট হইতে ভূমির কর-স্বরূপ আদায় করিয়াছেন। দরিদ্র দেশে এইরূপ ঘন ঘন কর বৃদ্ধি করিয়া কর্তৃপক্ষ রাজকোষের যে আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহার কিরূপ সদ্ব্যয় হইতেছে, তাহার আলোচনা করা যাউক।

জ্ঞানপূর্বক হউক, অজ্ঞানপূর্বক হউক প্রজার কষ্ট বৃদ্ধি করিয়াও রাজপুরুষেরা দিন দিন কৃষিজীবী-সম্প্রদায়ের যেরূপ খাজনা বাড়াইতেছেন, তাহা ইতঃপূর্বে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদনুপাতে কৃষিকার্যের উন্নতি-সাধনের জন্য তাঁহারা অর্থ-ব্যয় করিতে বিশেষ কাতর। ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। ইংরাজ বণিকদিগের কল্যাণে এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের বিলোপ ঘটায় ভারতবাসী এক্ষণে কৃষিমাত্র-সম্বল হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার প্রায় ১৮ কোটী লোকেরই কৃষি ভিন্ন জীবিকা-নির্বাহের অন্য উপায় নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই ১৮ কোটী কৃষকের উন্নতি-কল্পে বৎসরে দশ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন না। পাশ্চাত্য দেশ-সমূহ বাণিজ্যে প্রধান হইলেও সেখানকার শাসন-কর্তারা কৃষির উন্নতি-সাধনের জন্য বৎসরে কত টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

দেশ	ব্যয়িত অর্থ
অষ্ট্রিয়া	২,৪৭,৫০,০০,০০০ টাকা
রুশিয়া	৬,০০,০০,০০,০০০ „
হাঙ্গেরী	২,৫৫,০০,০০,০০০ „
মার্কিন যুক্তরাজ্য	১,২০,০০,০০০ „
ইটালি	৯০,০০,০০০ „
সুইডেন	৫২,৫০,০০০ „
ডেনমার্ক	৩০,০০,০০০ „

ডেনমার্কের জনসংখ্যা ২৫ লক্ষের অধিক নহে।* অথচ ডেনিশ গবর্ণমেণ্ট এই ক্ষুদ্র জন-সমাজের কৃষি-বিষয়ক উন্নতি সাধনের জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, আর এই ত্রিংশ কোটী জনপূর্ণা ভারত ভূমিতে ১৮ কোটী কৃষিজীবির মঙ্গলার্থ আমাদের সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট বৎসরে দশ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করিতে পারেন না! ইহা অপেক্ষা তাঁহাদিগের পক্ষে লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে?

---

* পাশ্চাত্য দেশসমূহে কৃষিজীবীর সংখ্যা কিরূপ, তাহাও এস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইল। অষ্ট্রিয়ায় শতকরা ৩৮ জন, হাঙ্গেরীতে ৬৪ জন, ইটালিতে ৫৭ জন, সুইজারল্যাণ্ডে ৩৭ জন, ফ্রান্সে ৪৪ জন, ইংলণ্ডে ১০ জন, স্কটল্যাণ্ডে ১৪ জন, আয়ারল্যাণ্ডে ৪৪ জন, মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ৩৬ জন ও ডেনমার্কে ৫০ জন।

কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনের প্রথম ও প্রধান উপায় জল-পূর্ত্তের বিস্তার। কিন্তু এই উপায়ের অবলম্বনে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ব্যয়কুণ্ঠা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কৃষকদিগের জল সেচনের সুব্যবস্থা করিবার জন্য পূর্ব্বে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর ছিল। তাহার পর ঐ কার্য্যে বৎসরে এক কোটী টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের যত্ন ও আগ্রহের অভাবে কোনও বৎসরই পূর্ণ এক কোটী টাকা জল-পূর্ত্তের জন্য ব্যয়িত হয় নাই! পক্ষান্তরে রেলের বিস্তারেই রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াছেন।

গত ১৯০২।৩ সালের হিসাবে দেখা যায়, রেলের জন্য গবর্নমেণ্ট ২৯ কোটী ৮৫ লক্ষ ৭৪'২৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ৩০ কোটী ২০ লক্ষ ৮'৫০ হাজার টাকা পাইয়াছেন। ঐ সালে জল-পূর্ত্তের জন্য ৩ কোটী ৮৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৬০ টাকা ব্যয় ও ৪ কোটী ১৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৫০ টাকা আয় হইয়াছে। অর্থাৎ ত্রিশ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া কর্তৃপক্ষ রেলে ৩০ লক্ষ ৩৪'২৫ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন; কিন্তু জল-পূর্ত্তে প্রায় পৌণে চারি কোটী টাকা ব্যয়ে ২৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকা লভ্য হইয়াছে। জল-প্রণালীর খননকার্য্যে এরূপ প্রভূত লাভ-সত্ত্বেও ইংরাজ-রাজ যদি জল-পূর্ত্তে অধিক অর্থ-ব্যয়ে কুণ্ঠিত হন, তাহা হইলে এদেশে কৃষিকার্য্য বৃষ্টি-নিরপেক্ষ হইবে কিরূপে? শুনিতেছি, আগামী বর্ষ হইতে জল-সেচন-ব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১'২৫ কোটী টাকা ব্যয় করিবেন। ভারতের জল-পূর্ত্ত-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল তাহার বিজ্ঞ-সদস্যগণ বলিয়াছিলেন,—অন্ততঃ আরও ৪৪ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া দেশের নানাস্থানে খাল খননের ব্যবস্থা না করিলে, কৃষিকার্য্যে জলাভাব দূরীভূত হইবে না। প্রতিবর্ষে দুই কোটী টাকা ব্যয় করিলে ২২ বৎসরে কমিশনের প্রস্তাব অনায়াসে কার্য্যে পরিণত করা যায়। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের কৃষিকার্য্যকে বৃষ্টি-নিরপেক্ষ করিবার জন্য বার্ষিক ২ কোটী টাকা ব্যয় করিতে সম্মত হন নাই। দুর্ভিক্ষে বহু লোক-ক্ষয় ও প্রজা-সাধারণের পক্ষ হইতে অনেক আন্দোলন আলোচনা হওয়ায় আগামী বর্ষ হইতে তাঁহারা ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা জল-পূর্ত্তের জন্য ব্যয় করিবেন বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে আগামী বর্ষে নূতন রেল বিস্তারের জন্য রাজপুরুষেরা ১২ কোটী ১৫ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনের দ্বিতীয় উপায় বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালীর প্রবর্তন। এই কার্য্য ব্যয়-সাধ্য হইলেও সভ্যদেশ-সমূহ তাহাতে পশ্চাৎপদ নহেন, পূর্ব্বোল্লিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু বিগত দেড় শত বৎসরের মধ্যে সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে উন্নত কৃষি-বিজ্ঞানের প্রসার জন্য

পাশ্চাত্য দেশ প্রচলিত উপায়াবলীর একটিরও যথারীতি অবলম্বন করেন নাই। এদেশে কৃষিবিজ্ঞান-শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুণা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, শিবপুর প্রভৃতি স্থানে কৃষিবিদ্যা শিখিবার সামান্য ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সন্তোষজনক শিক্ষালাভ হয় না। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট দ্বারবঙ্গের পুষা নামক স্থানে একটি সুবৃহৎ কৃষি-বিদ্যালয় ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনে অভিলাষী হইয়াছেন। শুনিতেছি, এই কলেজের দ্বারা এদেশের কৃষিকার্য্যের নাকি বিশেষ উন্নতি হইবে। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, ভারতের ১৮ কোটী কৃষি-জীবীর জন্য অন্ততঃ ১৮টি উচ্চ অঙ্গের কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে এদেশে কৃষি-প্রণালীর বিশেষ পরিবর্তন বা সংস্কার হইবে না। মাকিন যুক্তরাজ্যের লোক সংখ্যা ৭'৭৫ কোটী। ঐ রাজ্যে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ১০টি কলেজ ও ৫৪টি আদর্শ কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র আছে। পরীক্ষা-ক্ষেত্রগুলির জন্য মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট বৎসরে অন্যূন ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। আমেরিকার লোকসংখ্যার তুলনায় ভারত-সাম্রাজ্যে ইংরাজ-রাজ্যের বার্ষিক ১ কোটী টাকা ব্যয়ে অন্যূন ১৫০টি আদর্শ কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ পাইলে রাজানুগ্রহপ্রার্থী অনেক রাজা জমিদার, এই কার্য্যে অর্থ-সাহায্য-দানে অগ্রসর হইবেন, এরূপ আশা করা যায়। আমেরিকায় কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ প্রকাশ পাওয়ায় সেখানকার বড়লোকেরা বার্ষিক দুই কোটী টাকা কৃষি-বিদ্যালয়-সমূহের উন্নতি সাধনের জন্য প্রদান করিয়া থাকেন।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত ভড়োচ জেলার কমিশনার মিঃ লেলি দুই বৎসর পূর্বে ঐ অঞ্চলের ভূমির অবনতি বিষয়ে আলোচনাকালে তদীয় রিপোর্টে বলিয়াছেন, ঐ প্রদেশে তিন বৎসর পরে এক বৎসর কাল জমি বিনা আবাদে ফেলিয়া রাখিবার রীতি বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। এই প্রথার ফলে সার না পাইলেও ভূমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্ত্তী বর্ষে দ্বিগুণ শস্য উৎপন্ন হয়। প্রাচীন জমীদার ও শাসন-কর্তারা এই উদ্দেশ্যে প্রজাদিগকে তিন বৎসরের পরে এক বৎসরের খাজনা রেহাই দিতেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও প্রথম কিছুদিন এই প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, তাঁহারা এই হিতকর প্রথার পরিহার করিয়াছেন। মিঃ লেলি বলেন, তদবধি ভড়োচ জেলায় দিন দিন জমীর অবনতি ঘটিতেছে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম না পাওয়ায় ভারতবর্ষের অনেক স্থানেরই জমী যে দিন দিন অনুর্বর ও কৃষককুল হীনতাপন্ন হইতেছে, একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং শুধু কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেই ভারতে কৃষি-ব্যবসায়ের উন্নতি সাধিত হইবে না। দরিদ্র কৃষককুল

যাহাতে ঋণ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতির ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ হয়, তাহার জন্য ভূমি-রাজস্ব হ্রাস করাও বিশেষ প্রয়োজন।

দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে, ভারতের কৃষক-সমাজের এক-তৃতীয়াংশ এরূপ গভীর ঋণ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে যে, তাহাদিগের আর পুনরুদ্ধারের আশা মাত্র নাই। অবশিষ্ট কৃষকদিগের অর্ধাংশ অল্পাধিক পরিমাণে ঋণগ্রস্ত। কেবল এক-তৃতীয়াংশ কৃষিজীবীর কোনও প্রকার ঋণ নাই। ১৮৮০ সালে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তথাপি কর্তৃপক্ষ এতদিন প্রতিকারে অগ্রসর হন নাই। কাজেই বিগত কয়েক বৎসরের দুর্ভিক্ষে বহুলক্ষ কৃষিজীবীর ভাব-যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে।

কৃষককুলের দুরবস্থার নিরাকরণ করিতে হইলে, রাজা ও প্রজা উভয়কেই কিয়ৎ পরিমাণে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। দেশের উত্তমর্ণ সম্প্রদায়কে সুদের হার কমাইতে হইবে এবং রাজাকে দরিদ্র শিল্পীদিগের উৎসাহ বর্ধন, পঞ্চায়েৎ প্রথার প্রবর্তন ও রাজস্ব-সংক্রান্ত নিয়মাবলীর কঠোরতা-হ্রাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষিত জন-সাধারণের ইহাই অভিমত। এই মতানুসারে ২৫ বৎসর পূর্বে দেশের কতিপয় সহৃদয় উত্তমর্ণ সমবেতভাবে কৃষি-ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা পূর্বক স্বল্প সুদে কৃষক-দিগকে ঋণ-দানের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা এজন্য রাজপুরুষদিগের আনুকূল্যভিক্ষাও করিয়াছিলেন। মহামতি ওয়েডারবরণের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উত্তমর্ণদিগের সদ্ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিভূ হইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, এ সদনুষ্ঠানে সহায়তা করিতে গবর্ণমেণ্ট সম্মত হন নাই। রাজশক্তি ও দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্তরে জমীদার বা মহাজনের ন্যায় কোনও শ্রেণীঃ ধনবান ও শক্তিশালী সম্প্রদায় থাকিতে দেওয়া এই দেশের রাজপুরুষদিগের নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এই কারণে তাঁহারা দেশের সহৃদয় উত্তমর্ণদিগের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কাজেই বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের হতভাগ্য কৃষকেরা নীরবে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এতদিন পরে এদেশীয় কৃষকসমাজ যাহাতে অল্প সুদে টাকা ধার করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি-সাধনের সহিত মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ বা পরস্পর সাহায্যকারী মণ্ডলী গঠনের বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু মণ্ডলীর কার্য্যে দেশের মধ্য স্তরে স্থিত মধ্যবিত্ত ও উত্তমর্ণ সম্প্রদায় যাহাতে কোনও প্রকারে যোগদান করিতে না

পারেন, সে বিষয়ে ভেদনীতি-কুশল গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বনে বিরত হন নাই। তাঁহারা যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে কোনও উত্তমর্ণ, মণ্ডলীর সদস্য হইতে পারিবেন না। কোনও সদস্য ২৫০ টাকার অধিক ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে বা ধন-ভাণ্ডারের দশমাংশের অধিক অংশ ক্রয় করিতে পারিবেন না! একটি বৃহৎ ধনভাণ্ডার অপেক্ষা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী ও ধনভাণ্ডার স্থাপিত হওয়াই কর্তৃপক্ষ অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন। শিল্পীদিগের জন্যও কর্তৃপক্ষ এই প্রকার মণ্ডলী স্থাপনের পক্ষপাতী। কিন্তু দুই তিনটি গ্রামের কৃষকেরা ইচ্ছা করিলে যেরূপ সমবেত হইয়া মণ্ডলী গঠন করিতে পারিবে, না! এক গ্রামের শিল্পীরা যাহাতে সংযোগ না ঘটে, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সতর্কতা দেখিয়া কেহই প্রীতি প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

ফলকথা, এই বিধানে ভারতের কৃষিজীবীদিগের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা অতি সামান্য। কারণ, যে সকল কৃষক বহুদিন হইতে ঋণপঙ্কে নিমগ্ন, তাহাদিগের ঋণশোধ না হইলে তাহারা ভাণ্ডারের জন্য অর্থ দান করিয়া মণ্ডলীর সদস্য হইতে পারিবে কিরূপে? অপর লোকেই বা তাহাদিগের সহিত অর্থের আদান প্রদান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইবে কেন? জর্মনীতে যখন এইরূপ মণ্ডলী স্থাপনের বিধান প্রণীত হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট প্রথম কৃষকদিগের পূর্ব্বের গৃহীত ঋণ-পরিশোধ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে ভারত গবর্ণমেণ্ট সেইরূপ কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ফলকথা, যতদিন কর্তৃপক্ষ অন্যান্য অপব্যয় লাঘব করিয়া প্রজার মঙ্গলসাধনে পাশ্চাত্য দেশীয় ভূপতিগণের ন্যায় অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে সম্মত না হইবেন, ততদিন শুদ্ধ বিধান প্রণয়নে ও বচনবাগীশতায় কোনও সুফল লাভের আশা করা যায় না।

প্রজাকুলের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য অর্থ-ব্যয়েও রাজপুরুষদিগের কৃপণতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নানা বিষয়ে প্রজার করভার বৃদ্ধি করিয়া যে রাজস্ব সংগৃহীত হয়, তাহার প্রায় ৭০ ভাগের এক ভাগ বা রাজ্যের সমগ্র আয়ের ১২০ ভাগের এক ভাগ (এক কোটী চারি লক্ষ টাকা) ২৩ কোটী প্রজার শিক্ষা-দান-কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে গমনের যোগ্য বালকের সংখ্যা বৃটিশ ভারতে ২ কোটী ১০ লক্ষের কম নহে। সুসভ্য ইংরাজ-রাজের অনুগ্রহে ইহাদিগের এক-সপ্তমাংশমাত্র অর্থাৎ ৩৮ লক্ষ ৮৫'৫০ হাজার জন লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা পাইতেছে। তন্মধ্যে এক বঙ্গদেশীয় (বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার) ছাত্রের সংখ্যা ১৬ লক্ষ। যে দেশে প্রায় ৮ কোটী লোকের বাস, সে দেশের পক্ষে এই ছাত্র সংখ্যা কিরূপ সামান্য, সকলেই বুঝিতে পারেন। বঙ্গে দেড় শত বর্ষ ইংরাজ শাসনের

পরও লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা প্রতি সহস্রে ১৪৬ জনের অধিক নহে! সমগ্র বৃটিশ ভারতে ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার বালিকা বিদ্যালয়ে গমন করে। ইহাদের মধ্যে বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যাবাসিনীর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৮ হাজার। মান্দ্রাজে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ও বোম্বাই অঞ্চলে ৮৮ হাজার ৪ শত বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। ব্রহ্মদেশে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ২,৫৫,৫০০ ও ৩২,৪০০। সমগ্র ভারতবর্ষে গড়ে শতকরা দশ জনের অধিক পুরুষ ও হাজার করা ৭ জনের অধিক স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানে না, তথাপি গবর্ণমেণ্ট প্রজার শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থ অধিক অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। পক্ষান্তরে শিক্ষা-সংস্কারের ব্যপদেশে শিক্ষা-সংহারের নানা উপায় অবলম্বিত হইতেছে। দেশীয় গ্রন্থকারদিগের অন্নে ধূলিনিক্ষেপ পূর্ব্বক একদিকে লঙ্‌ম্যান ও ম্যাক্‌মিলান কোম্পানির ধনাগমের পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অন্যদিকে দেশীয় বালকগণ সাহেবী বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইবার অপূর্ব্ব যোগ্যতা লাভ করিতেছে। এ সকল দেখিলে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া প্রত্যেক স্বদেশভক্ত ব্যক্তিরই চিত্তে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

প্রায় দেড়শত বৎসরব্যাপী ইংরাজ শাসনের পরেও ভারতবর্ষে গড়ে শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর, ইহা অপেক্ষা সুসভ্য শাসন-কর্তার পক্ষে কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু সভ্যতাভিমানী ভারত গবর্ণমেণ্ট সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের ও উচ্চ বেতনভোগী বাঁটার ক্ষতিপূরণ-প্রার্থী সিবিলিয়ানদিগের অবদান রক্ষা করিবার জন্য সে কলঙ্ক অনায়াসে মস্তকে বহন করিতেছেন।

১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও এদেশে শিক্ষা বিস্তারকল্পে রাজপুরুষদিগের তাদৃশ যত্ন প্রকাশ পায় নাই। এতদিনে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; কিন্তু তজ্জন্য এদেশের উচ্চ-শিক্ষার সমূহ ক্ষতি-সাধনে তাঁহাদিগের যত্ন দেখা যাইতেছে। উচ্চ শিক্ষার বিনিময়ে নিম্নশিক্ষার বিস্তার কল্পনা উদ্ভাবিত হইয়াছে। এখন নিম্নশিক্ষার জন্যও আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যে ব্যয় করিতেছেন, তাহার সহিত অন্যান্য সকল দেশের নিম্নশিক্ষার ব্যয়ের তুলনা করিলে সকলেই বিস্মিত হইবেন।

প্রথমতঃ নিম্নশিক্ষার অনুপাত কোন্ দেশে কিরূপ, তাহা দেখা যাউক। ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর গড়ে শতকরা ১৭.৫০ জনের অধিক নিম্নশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। ফ্রান্সে শতকরা ১৪.৫০ জন, অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীতে ১৫ জন, ইটালিতে ৭.২৫ জন, জাপানে প্রায় ৮ জন, গ্রীসে প্রায় ৭ জন, রুশিয়ায় ৩ জন, আর ব্রিটিশ

ভারতবর্ষে শতকরা দেড় জনও নহে, অথবা ৫ শত জনের মধ্যে ৭ জন মাত্র।* ব্যয়ের হিসাবেও ভারতবর্ষ ইংরাজেরই কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। ইংলণ্ডে ও প্রুশিয়ায় নিম্নশিক্ষার ব্যয় প্রতি জনে ৫ শিলিং, ফ্রান্সে ৪ শিলিং ১১ পেন্স, অষ্ট্রিয়ায় ২'৫০ শিলিং, ইটালীতে ১ শিলিং ৭ পেন্স, রুশিয়ায় ৮ পেন্স, জাপানে ১১ পেন্স আর বৃটিশ ভারতে পূর্ণ এক পেনিও নহে। বলা বাহুল্য দুই একটি দেশ ভিন্ন প্রায় সর্বত্রই নিম্নশিক্ষার তিন-চতুর্থাংশ ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। একবার উচ্চশিক্ষার অঙ্কেও দৃষ্টিপাত করুন। উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতে প্রতি জনে সিকি পেনি বা এক পয়সা ব্যয় হয়। রুশিয়ায়, গ্রীসে দুই পেন্স, ইটালীতে ৩'৫০ পেন্স, অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সে ৬ পেন্স, জর্মণীতে ৭ পেন্স, ক্যানেডায় ১০ পেন্স, মার্কিন যুক্তরাজ্যে ও ইংলণ্ডে ১১ পেন্স হিসাবে ব্যয়িত হইয়া থাকে। অর্ধসভ্য রুশও শিক্ষা বিস্তারকার্যে সুসভ্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে পশ্চাৎ-পদ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র সিংহলে ইংরাজ শিক্ষার জন্য প্রতি জনে দুই আনা ও মরীচ দ্বীপে দশ আনা ব্যয় করেন। কিন্তু ভারতবাসীর প্রজার মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কার্যে তাঁহাদিগের বিশেষ কৃপণতা দৃষ্ট হয়।

ক্ষুদ্র ইংলণ্ডে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। অষ্ট্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭, বেলজিয়মে ৪, জর্মণীতে ৩০, তন্মধ্যে ৭টি শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক। জর্মণীতে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বার্ষিক প্রায় ৩০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে আকারে ও লোকসংখ্যায় জর্মণীর ৫'৫০ গুণ; কিন্তু ভারতে শিক্ষার জন্য পূর্ণ দেড় কোটি টাকাও ব্যয়িত হয় না। জর্মণীতে ৮৮ লক্ষ ত্রিশ হাজার বালক-বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। বৃটিশ ভারতে ৫৩ লক্ষের অধিক বালক ও ৪ লক্ষ ৪৪'৫০ হাজারের অধিক বালিকা বিদ্যালয়ে গমন করে না। বোম্বাই ও বঙ্গদেশে বিদ্যালয়ে গমনযোগ্য বালকদিগের মধ্যে শতকরা ২২।২৩ জন এবং পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে শতকরা ৮।৯ জন মাত্র বালক লেখাপড়া শিক্ষায় নিযুক্ত আছে! ইহা অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষালাভার্থী ছাত্র সংখ্যার হিসাব।

সকল সভ্য দেশেই দরিদ্র বালকদিগকে বিনাব্যয়ে শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড, বেলজিয়ম, জর্মণী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে পিতামাতার

* ১৯০১।২ সালে সমগ্র বৃটিশ ভারতে প্রাইমারী বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৮,৫৩৮ ও ছাত্র সংখ্যা ৩২,৬৮,৭২৬ ছিল। সেকেণ্ডারি বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় ৫,৪৯৩ এবং ছাত্র ৫,৫৮০,৩৭৮ ছিল। শিল্পবিদ্যালয়ের সংখ্যা এদেশে অত্যল্প। ছোট-বড়, সরকারী ও বেসরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২৩টির অধিক নহে। এই সকল বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক ৮,৪০৫ ছাত্র সামান্য সূত্রধরের কার্য ও কিঞ্চিৎ অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষালাভ করে। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্ধনও আপাততঃ সম্ভবপর হইবে না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বালকদিগকে রাজবিধানের বলে অবৈতনিক বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষাগ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। কাজেই ঐ সকল দেশে নিরক্ষর মূর্খ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। ইংলণ্ডে শতকরা ৭ জন নিরক্ষর, বেলজিয়ামে ২৯ জন, জাপানের আরও অল্প। জাপানের রাজস্বে সর্বপ্রকারে ৩০ কোটি টাকা আয় হয়, কিন্তু জাপানী গবর্ণমেণ্ট তন্মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারকার্যে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। তদনুপাতে সুসভ্য ভারত গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৩ কোটি টাকা শিক্ষা-বিভাগে ব্যয় করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা বিগত দশ বৎসরে গড়ে বার্ষিক ১ কোটির অধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন কি না সন্দেহ। বিগত দুই বৎসর হইতে প্রায় দেড় কোটি টাকা করিয়া ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ এত অধিক টাকা ব্যয় করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। গত ১৯০২।৩ সালের আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায়, শিক্ষাবিভাগে ব্যয় করিবার সুযোগ না ঘটায় ২৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা প্রাদেশিক রাজকোষসমূহে উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। যে দেশে শতকরা প্রায় ৯০ জন নিরক্ষর, সে দেশে রাজপুরুষেরা শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ব্যয় করিবার উপায় দেখিতে পান না, ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে।

বলিয়াছি, সভ্য দেশসমূহে দরিদ্র বালকগণের শিক্ষার জন্য রাজ ব্যয়ে বহুসংখ্যক অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সরকারী ও অর্দ্ধ-সরকারী বিদ্যালয়সমূহে "ফ্রি স্টুডেণ্ট" বা অবৈতনিক ছাত্রের সংখ্যা যাহাতে প্রতি শ্রেণীতে ২।৩ জনের অধিক না হয়, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষ সতর্কতা দৃষ্ট হয়। ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয়-সম্বন্ধে নূতন বিধান প্রণয়ন করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে উচ্চশিক্ষা অধিকতর ব্যয়সাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। এ বিষয়ে দেশীয় ভূপতিগণের রাজ্যে বহু পরিমাণে উদারতা পরিলক্ষিত হয়। বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড় পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে স্বরাজ্যে বিনা-ব্যয়ে বিদ্যাদানের (Free Education) ব্যবস্থা করিয়া সুসভ্য ইংরাজ রাজের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন। ফল কথা, জগতে সভ্য শাসক মাত্রেই বিনা-ব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়ে শিক্ষা-বিস্তার করা একটি কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। যে চীনকে অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করা হয়, সেই চীনে শতকরা ৯৫ জন পুরুষ ও ১০ জন রমণী অল্পাধিক পরিমাণে লিখিতে পড়িতে পারে। কিন্তু ভারতে ১৫০ বৎসরের ইংরাজ-শাসনের পরও শতকরা নব্বই জন নিরক্ষর, ইহা রাজা ও প্রজা উভয়েরই ঘোরতর কলঙ্কের কথা। এ কলঙ্ক মোচনে সকলেরই অগ্রসর হওয়া উচিত। পরিশিষ্টে শিক্ষাবিষয়ক যে সকল তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নেত্রপাত করিলে উপলব্ধ হইবে যে, শিক্ষালাভ বিষয়ে

ভারতবাসীর আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বে-সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। প্রজার নিকট হইতে উচ্চহারে কর গ্রহণ করিয়াও গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার বিস্তারে ঔদাস্য প্রকাশ করিতেছেন। ভারতবাসী জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ইংরাজের সমকক্ষ হইবেন, ইহা এদেশীয় ইংরাজসমাজের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার সংকোচে যত্ন-প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা নিম্নশিক্ষার বিস্তারে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে অগ্রসর হইলেও ভারতীয় শিশুদিগকে ম্যাক্‌মিলন কোম্পানীর জঘন্য পুস্তকাবলী পাঠে বাধ্য করিয়া দেশীয় সাহিত্যের সমাধি রচনার সূত্রপাত করিয়াছেন।*

পূর্বোক্ত ১২৫ কোটি টাকার মধ্যে আমাদিগকে বার্ষিক পঁচিশ কোটি টাকা "হোম চার্জ" স্বরূপ বিলাতে পাঠাইতে হয়। শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী এই হোম চার্জকে "বার্ষিক ভারত লুণ্ঠনের টাকা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা ইহাকে সেলামী বা আক্কেল-সেলামী নামে অভিহিত করিতে পারি। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সেলামীর পরিমাণ বার্ষিক তিন কোটি টাকা ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও উহা বার্ষিক ৪ কোটির অধিক হয় নাই। কিন্তু তাহার পর যখন হইতে কোম্পানির হস্তস্থিত রাজ্যভার দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া মহোদয়ার হস্তগত হয়, তদবধি রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহে এই সেলামীর পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিংশতি বৎসরের মধ্যে ৪ কোটি টাকা ২০ কোটিতে পরিণত হয়। তদবধি বিগত বত্রিশ বৎসর কাল ২৬।২৫ কোটি টাকা হিসাবে দরিদ্র ভারতবাসীর নিকট হইতে বার্ষিক সেলামী গৃহীত হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই টাকার বিনিময়ে বিলাতী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভারতবাসী কোনও প্রকার উপকারই প্রাপ্ত হয় না। প্রতি বৎসর এইরূপ অজস্র অর্থনাশে ভারতবাসী দিন দিন ধনহীন হইতেছে।

এই হোমচার্জের অন্যায্যতার উল্লেখ করিয়া ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ মণ্টেগোমারি মার্টিন নামক জনৈক চিন্তাশীল লেখক পশ্চাল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,— "বৃটিশ ভারত হইতে প্রতি বৎসরে তিন কোটি হিসাবে বিগত ত্রিশ বৎসরে মায়

* জাপান গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর ১৫০ জন যুবককে শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সরকারি ব্যয়ে পাশ্চাত্য দেশে পাঠাইয়া থাকেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট তদনুরূপ কোনও ব্যবস্থা না করায় সকলেই তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছিলেন। সেই নিন্দার দায়ে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য অধুনা গবর্ণমেণ্ট প্রতিবর্ষে দশ জন করিয়া ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য দেশে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বৃত্তি দিয়া প্রেরণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই তৈল-কাঞ্চনের ব্যবস্থায় রাজপুরুষদিগের কলঙ্ক ঘুচিবে কি?

সুদ চক্রবৃদ্ধির নিয়মে (শতকরা বার্ষিক ১২ টাকা হিসাবে সুদ ধরিয়া) ৭২৩,৯৯,৭৯,১৭০ টাকা হোমচার্জ স্বরূপে বিলাতে আসিয়াছে। যদি গত পঞ্চাশ বৎসরের হিসাব ধরা যায়, তাহা হইলে অতি নিম্নহারেও ৮৪০০,০০,০০,০০০ টাকা হয়। ধারাবাহিকরূপে এইরূপ অর্থ শোষিত হইলে ইংলণ্ডেরও অল্পদিনের মধ্যে দারিদ্র্যদশা উপস্থিত হইতে পারে। যে ভারতের শ্রমজীবীরা প্রত্যহ দুই তিন আনার অধিক উপার্জন করিতে পারে না, সেই ভারতে এইরূপ অর্থ-শোষণের ফল কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—

I do not think it possible for human ingenuity to avert entirely the evil effects of a continued drain (for half a century) of three or four million pounds a year from a distant country like India and which is never returned in any shape.

ভাবার্থ এই যে, অর্ধশতাব্দী কাল বিদেশে এইরূপ অজস্র অর্থ-প্রেরণের ফলে ভারতীয় সমাজের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করা মানবের শক্তির অতীত বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ, এই রাশি রাশি অর্থের বিনিময়ে ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে কোনও আকারে এক কপর্দকও ফিরিয়া পায় না।

সহৃদয় গবর্ণর জেনারেল স্যার জন শোর মহোদয় এদেশের রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা-লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার Notes on Indian Affairs গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে তিনি বলেন,—

The halcyon days of India are over. She has been drained of a large proportion of the wealth she once possessed ; and her energies have been cramped by a sordid system of misrule to which the interests of millions have been sacrificed for the benefits of the few.

অর্থাৎ ভারতের শান্তি প্রসন্নতার দিন গত হইয়াছে। ভারতবর্ষ এককালে যে ধন-সম্পত্তির অধিকারী ছিল, তাহার অধিকাংশ বিদেশগত হইয়াছে। কু-শাসনের নীচতা-পূর্ণ পদ্ধতির দোষে ভারতভূমির কার্য করিবার সমস্ত শক্তি সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। বিলাতের স্বল্পসংখ্যক লোকের মঙ্গলের জন্য (ভারতের) লক্ষ লক্ষ লোকের স্বার্থ বিসর্জিত হইতেছে।

স্যার জর্জ উইঙ্গেট এই হোমচার্জের অর্থকে Cruel burden of tribute নামে অভিহিত করিয়াছেন। মিল সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডে এই অর্থ-শোষণের বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়—

It is an exhausting drain upon the resources of the country, the issue of which is replaced by no reflex ; it is an extraction of the life-blood from the veins of national industry which no subsequent introduction of nourishment is furnished to restore.

ভাবার্থ এই যে, অর্থশোষণ দেশীয় ধনসম্পত্তির নিঃশেষ-ক্ষয়কারী, এই ক্ষতির পূরণ কোনও প্রকারেই হইতেছে না। এই প্রকার অর্থশোষণ রাষ্ট্রীয় কর্ম-শক্তি-রূপ ধমনী হইতে প্রাণ-সার শোণিত-মোক্ষণের নামান্তর মাত্র। এই ভীষণ শোণিত-মোক্ষণের পর যতই পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হউক না কেন, তাহাতে পূর্ব স্বাস্থ্যের পূর্ণলাভ কিছুতেই হইবে না।

ষষ্টিবর্ষ পূর্বে এদেশ হইতে যে অর্থ-রাশি ইংলণ্ডে হোমচার্জ স্বরূপে নীত হইত, তদুপলক্ষেই অর্থনীতিবিদ্ সহৃদয় লেখকেরা এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর এদেশ হইতে উত্তরোত্তর বর্ধিত হারে যে অর্থ হোমচার্জের নামে বিলাতে প্রেরিত হইয়াছে, তাহার বিষয় যদি ইঁহাদিগের জানিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে ইঁহারা কিরূপ আতঙ্কবিহ্বল হইতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মণ্টেগোমারি মহাশয়ের প্রকাশিত হিসাবে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশ হইতে বিলাতে নীত অর্থের পরিমাণ ৮,৪০০ কোটি মুদ্রা বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। তাহার পর হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত বিংশ বর্ষকাল বার্ষিক ৩৪ কোটি টাকা দেশান্তরিত হইতেছিল। মণ্টেগোমারি প্রদর্শিত নিয়মানুসারে হিসাব করিলে ঐ ২০ বৎসরে সুদ সহ কত মুদ্রা আমাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছিল, গণিতজ্ঞ পাঠক তাহা সহজেই স্থির করিতে পারিবেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী দ্বাবিংশ বৎসরে কত অর্থ ভারতবসীর নিকট হইতে শোষিত হইয়াছিল, তাহার হিসাব পাওয়া যায় না। তবে এই সময়ে হোমচার্জের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। গত পঁয়ত্রিশ বৎসরে হোমচার্জ, শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদিগের বেতন ও বৃত্তিতে বার্ষিক অন্যূন ৪৫ কোটি টাকা হারে এদেশ হইতে ১৫৭৫ কোটি টাকা অন্তর্হিত হইয়াছে! চক্রবৃদ্ধির নিয়মানুসারে এই ১৫৭৫ কোটি টাকা পঁয়ত্রিশ বৎসরে সুদসহ কত টাকায় পরিণত হয়, তাহা ভাবিলে সকলকেই হতবুদ্ধি হইতে হয়।

দেশের এইরূপ অকারণ ধন-ক্ষয় দর্শনে ব্যথিত ও ধৈর্যচ্যুত হইয়া শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর তারিখে ভারত-সচিব মহোদয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পশ্চাল্লিখিত তীব্র মন্তব্য পরিদৃষ্ট হয়,—

The thoughtless past drain we may consider as our misfortune, but a similar future will, in plain English, be *deliberate blunder and destruction*

ফলতঃ এইরূপ লোমহর্ষণ রক্তমোক্ষণে পৃথিবীর অত্যন্ত ধনশালী সমাজও কঙ্কালসার হইয়া যায়। ইহার উপর শিল্প-বাণিজ্যের বিনাশ ঘটিলে সমাজের কঙ্কালও নিষ্পেশিত হইয়া যায়, দেশ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর লীলাস্থলে পরিণত হয়। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে এই অবিশ্রান্ত অর্থহানি ও দশ কোটি লোকের অর্ধাশন সত্ত্বেও রাজ-পুরুষেরা বলিতেছেন ভারতবাসী দিন দিন সমৃদ্ধ হইতেছে!

ভারতীয় রাজস্বের অবশিষ্ট অর্থের মধ্যে আজকাল প্রায় ২৬ কোটি টাকা সামরিক বিভাগের ব্যয়-নির্বাহের জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে প্রজার অর্থের প্রচুর অপব্যয় ঘটিতেছে। অতুল ধনশালী ইংলণ্ডে প্রজাপুঞ্জের নিকট হইতে যে পরিমাণ আয়-কর সংগৃহীত হয়, তাহার চতুর্গুণ অর্থ সামরিক বিভাগে ব্যয়িত হইয়া থাকে। কিন্তু অতি দরিদ্র ভারতবর্ষে রাজ-পুরুষেরা সামরিক বিভাগের জন্য এদেশীয় আয়করের চতুর্দশ গুণ অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। এই বিভাগের প্রভূত বেতনভোগী কর্মচারীদিগের সকলেই শ্বেতাঙ্গ। সুতরাং এই টাকার অতি অল্পাংশ দেশে থাকে—অধিকাংশ বিলাতে চলিয়া যায়।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট গোরা সৈনিকদিগের জন্য জনপ্রতি বার্ষিক ৮৯১ টাকা ব্যয় করিতেন, কিন্তু দেশীয় সিপাহীদিগের জন্য বার্ষিক গড়ে জনপ্রতি ৩৪০ টাকার অধিক প্রদান করেন নাই! ইহার পর গোরা সৈনিকদিগের বেতন বার্ষিক ১২৩ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমান বৎসরে ১লা এপ্রিল হইতে তাহাদিগের বেতন বার্ষিক আরও ১৪৬ টাকা বাড়ান হইয়াছে। ফলে গোরাদিগের জন্য গবর্ণমেণ্ট অতঃপর বার্ষিক ১১৬০ টাকা হিসাবে ব্যয় করিবেন। গোরা সৈনিকদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যেরূপ ব্যয়-বৃদ্ধি হইতেছে, দেশীয় সিপাহী-দিগের জন্য সেরূপ হয় নাই। তাহাদিগকে বার্ষিক ৩৪৪ টাকার স্থলে ৩৭০ টাকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অর্থাৎ গত ৮ বৎসরে গোরাদের বাড়িয়াছে—২৬৯ টাকা, সিপাহীদের বাড়িয়াছে—২৭ টাকা! অথচ শৌর্য-বীর্যে অনেক স্থলেই গোরাদিগের অপেক্ষা দেশীয় সিপাহী সেনাই উৎকর্ষ দেখাইয়াছে।

বিগত ১৯০৩ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে মাননীয় অধ্যাপক গোখলে ও মাননীয় শ্রীযুক্ত আগাখাঁ মহোদয় ভারতীয় সামরিক বিভাগের গঠন ও সংস্কার সম্বন্ধে কতিপয় অত্যাবশ্যক ও শুভকর প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, দেশীয়

সৈনিকদিগের কার্যকাল হ্রাস করিলে গবর্ণমেণ্টের সামরিক বলের বৃদ্ধি ও ব্যয়ের হ্রাস হইবে। গোরা সৈনিকদিগের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে ভারতবাসীর কিছুমাত্র ইষ্ট সাধিত হয় না। কারণ, অল্পদিন মাত্র কার্য করিয়া গোরা সৈনিকেরা স্বদেশে চলিয়া যায়, এবং তাহাদিগের স্থানে বিলাত হইতে নূতন সৈন্যদল এদেশে আগমন করে। ফলে ভারতবাসীকে এই সকল শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের ঘন ঘন বিলাত গমনাগমনের ব্যয়-ভার বহন করিতে হয়। নবাগত গোরাদিগের মধ্যে অশিক্ষিত লোকের ভাগই বেশী থাকে। ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতবাসীব ব্যয়ে তাহারা যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত হয় এবং শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই কিছু দিন পরে স্বদেশে চলিয়া যায়। এইরূপে ইংলণ্ড বিনা-ব্যয়ে ভারতবর্ষ হইতে কিছুদিন অন্তর একদল করিয়া সুশিক্ষিত সৈনিক প্রাপ্ত হইতেছেন, অনায়াসে বিলাতের রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

দেশীয় সৈনিকদিগের সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম নাই। তাহাদিগকে প্রায় আজীবন কার্য করিতে হয়। কর্তৃপক্ষ যদি উভয় সৈন্যকে এক নিয়মের অধীন করেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হয়। দেশীয় সৈন্যগণ যদি অল্প দিন কার্য করিয়াই বিদায় লাভ করে এবং তাহাদিগের স্থলে নূতন লোকের নিয়োগ হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ দেশের অনেক লোকেরই যুদ্ধ-বিদ্যা-শিক্ষা করিবার অবসর ঘটিতে পারে। দেশে এইরূপ সমর-দক্ষ ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য ঘটিলে, গবর্ণমেণ্টকে আর এখনকার ন্যায় অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া সর্বদা বহুল পরিমাণে সৈন্য.পোষণ করিতে হইবে না। বর্তমান সৈন্য সংখ্যার চতুর্থাংশ মাত্র বেতনভোগী সৈন্য রাখিলেই গবর্ণমেণ্টের কার্যোদ্ধার হইবে। কারণ, বিপৎকালে পুরাতন শিক্ষিত সৈনিকদিগকে আহ্বান করিলেই অত্যল্পকাল মধ্যে যত বড় ইচ্ছা সৈন্যদল গঠন করিয়া লইতে পারা যাইবে। এজন্য অবসর প্রাপ্ত সৈনিকদিগকে নামমাত্র বৃত্তিদান করিয়া রিজার্ভ তালিকাভুক্ত করিয়া রাখাই সুসঙ্গত। ভারতীয় সামরিক বিভাগে এই প্রথা প্রবর্তিত না থাকায় শান্তির সময়েও আমাদিগকে অনর্থক অতিরিক্ত সৈন্যপোষণের ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, বিপৎকালে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়া উঠে। এই প্রস্তাবের সমর্থন-কল্পে অধ্যাপক গোখলে জাপানের সামরিক ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছিলেন। জাপানের সৈন্যসংখ্যা ভারতীয় সৈন্যসংখ্যার অর্ধেকের অধিক নহে, অথচ ঐ দেশের সামরিক বিভাগের ব্যয় আমাদিগের ব্যয়ের চতুর্থাংশ মাত্র। জাপানীরা দেশের রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য সাধারণ সৈনিকদিগের কার্যকাল হ্রাস করিয়াছেন এবং দেশের যত অধিক লোককে সামরিক শিক্ষা দান করা সম্ভবপর, তাহা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এই প্রকার ব্যবস্থার ফলে জাপান সামরিক বিভাগে আমাদিগের চতুর্থাংশ ব্যয় করিয়াও বিপদের সময়ে আমাদিগের অপেক্ষা ৫।৬ গুণ অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিবার সামর্থ লাভ করিয়াছে।

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের সামরিক বলের কথা ভাবিলে হতাশ হইতে হয়। ইংরাজ-রাজ সমগ্র দেশটিকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। বাইশ কোটি লোকের প্রায় সকলেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ। তাহারা বিপৎকালে দেশরক্ষা করিবে কি প্রকারে? স্বদেশ রক্ষার পবিত্র কার্যে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা যেরূপ অবৈধ, একদল বেতনভোগী স্থায়ী সৈন্যের (standing army) উপর এরূপ বিশাল দেশ রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকাও সেইরূপ অসঙ্গত। পৃথিবীর কোনও দেশে এরূপ রাজ-নীতি-বিরুদ্ধ অদ্ভুত প্রথা বিদ্যমান নাই। ইংলণ্ডের বড় বড় সমর-নীতি-বিশারদেরাও এই নীতির দোষ দেখিতে পাইয়াছেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সিমলায় যে "আর্মি কমিশন" বসিয়াছিল, তাহাতে লর্ড রবার্টস প্রভৃতি সমরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সদস্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কমিশন এদেশে পূর্ববর্ণিত প্রণালীক্রমে রিজার্ভ সৈন্যদল গঠন বিষয়ে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন যে, দেশীয় সৈনিকদিগের কার্যকালের পরিমাণ হ্রাস করিয়া রিজার্ভ সৈন্যদল গঠনের চেষ্টা করিলে, প্রতি ১০ বৎসরে ৫২ হইতে ৮০ হাজার পর্যন্ত রিজার্ভ সৈন্য অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারিবে। এইরূপে ভারতে সমর-দক্ষ লোকের সংখ্যাধিক্য ঘটিলে যে, ইংরাজ-রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইবে, এদেশের অবস্থাভিজ্ঞ কমিশনের সদস্যেরা সে আশঙ্কা মনেও স্থান দেন নাই। কিন্তু বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিসের সংশয়-কলুষিতচিত্ত কর্তারা কমিশনের প্রস্তাবে অনুমোদন করা বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিলেন। কাজেই সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল না। প্রজার প্রতি অবিশ্বাস-বশে ইংরাজকে বহু ব্যয়ে ভূরি পরিমাণে সৈন্য পোষণ করিতে হইতেছে। ফলে দরিদ্র ভারতবাসী দিন দিন অন্ন কষ্টে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

শাসন-ব্যবস্থা-বিভাগেও অপব্যয়ের সীমা নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট হইতে আদেশ প্রচারিত হয় যে, শাসন-বিভাগের উচ্চপদসমূহেও দেশীয় কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। ইহার পর ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে পরলোকগতা মহারাণী যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহাতেও পূর্ব আদেশ সমর্থিত হয়। কিন্তু লর্ড লিটনের কথাতেই প্রকাশ যে, ঐ আদেশ-প্রচারের পরদিন হইতেই ভারত গবর্ণমেণ্ট আদেশ লঙ্ঘন করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইলেন। ফলে উচ্চপদ লাভের পথ এদেশবাসীর পক্ষে পূর্ববৎ রুদ্ধ রহিল। স্যার জন শোর লিখিয়াছেন,—

The Indians have been excluded from every honour, dignity or office, which the lowest Englishman could be prevailed upon to accept.

অর্থাৎ প্রত্যেক সম্মান, গৌরব ও উচ্চপদ হইতে দেশীয়দিগকে বঞ্চিত করা হইয়া থাকে। যে পদ গ্রহণে কোনও প্রকারে অতি গুণহীন ইংরাজকেও সম্মত করিতে পারা যায়, সে পদে আর দেশীয়দের নিয়োগ করা হয় না।

ইহা অবশ্যই ১৮৩৮ সালের কথা। তাহার পর বিগত ৬৫ বৎসরে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কতদূর সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতের ফাইন্যান্স কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য-দান-কালে স্যার চার্লস ট্রিবেলিয়ান মহোদয় বলিয়াছিলেন,—

All sorts of young men who fail at the competitive examinations in the country, or who do not even venture to go into them, go out to India with recommendations and they have been put into the police and then into the lower department of the Revenue as Deputy Collectors etc.

ভাবার্থ, যে সকল যুবক প্রতিযোগী পরীক্ষায় সাফল্য-লাভ করিতে পারে না, অথবা যাহারা উক্ত পরীক্ষার জন্য অগ্রসর হইতেও সাহস করে না, তাহারা ভদ্রাভদ্র নির্বিশেষে এক-একখানি অনুরোধপত্র লইয়া ভারতবর্ষে গমন করে। সুপারিশের জোরে তাহারা অনায়াসে ভারতীয় পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত হয়, অনেকে আবার রাজস্ব বিভাগের ডেপুটি কালেক্টার প্রভৃতি অধস্তন পদ লাভ করে।

বিভাগীয় কর্তৃ-পুরুষদিগের অনুগ্রহে ইদানীং অনেক সরকারী অফিসে ৫০ টাকার অপেক্ষা অধিক বেতনের কাযে যথাসম্ভব ফিরিঙ্গী নিয়োগেরই ব্যবস্থা হইতেছে! ১৮৯২ সালে, পার্লামেণ্টে যে হিসাব দাখিল হইয়াছিল, তাহাতে নেত্রপাত করিলে উপলব্ধ হয় যে, যে সকল শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী ১২৫ টাকা বা তদপেক্ষা অধিক বেতন পান, তাঁহাদিগের জন্য ভারতীয় রাজকোষ হইতে বৎসরে ২১ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গীদিগের বেতন-স্বরূপ বার্ষিক ১'৫০ কোটি মুদ্রা প্রদত্ত হয়। পক্ষান্তরে ভারত-সন্তানদিগকে বেতন প্রদানার্থ গবর্ণমেণ্ট বৎসরে ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন না! এই ৩১ কোটি ও ফিরিঙ্গীদিগের প্রাপ্ত ১'৫০ কোটি টাকাই এদেশে থাকে। শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদিগের লব্ধ ২১ কোটি টাকার অধিকাংশই হোমচার্জের টাকার ন্যায় দেশান্তরিত হয়। ঐ সালের পার্লামেণ্টে জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে তদানীন্তন ভারত-সচিবের আণ্ডার সেক্রেটারি মিঃ কর্জন (এখন লর্ড কর্জন) বলিয়াছিলেন, বার্ষিক ৫০ সহস্র মুদ্রা বা

তদধিক বেতনভোগী ২৭ জন রাজকর্মচারীর মধ্যে একজনমাত্র দেশীয়। যাহারা বার্ষিক ত্রিশ সহস্র হইতে পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা বেতন পাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তিনজন মাত্র দেশীয় ও ১৭২ জন ইউরোপীয়।

১৮৯২ সালের পর অনেক শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ ও ফিরিঙ্গী কর্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়াছে; তদনুপাতে ব্যয়েরও বৃদ্ধি হইয়াছে। সামরিক বিভাগে ব্যয়-বৃদ্ধির সীমা নাই। সিবিল বিভাগে ইদানীং প্রায় ৮ সহস্র বৈদেশিক বা শ্বেতাঙ্গ কার্য করিতেছেন। তাঁহাদিগকে আমাদিগের রাজকোষ হইতে বৎসরে কিঞ্চিদধিক অষ্ট কোটি মুদ্রা বেতন স্বরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের ভাতা, বাঁটার ক্ষতি-পূরণ প্রভৃতির স্বাতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। পক্ষান্তরে ঐ সিবিল বিভাগেই সর্বসমেত এক লক্ষ ত্রিশ সহস্র দেশীয় কর্মচারী কার্য করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের বার্ষিক বেতনে কর্তৃপক্ষ সাত কোটি মাত্র টাকা ব্যয় করেন। ছয় সহস্র ফিরিঙ্গী ৭৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা বেতন পান। অর্থাৎ গড়ে প্রতি ইংরাজ বৎসরে ৯,০০৫ টাকা, প্রত্যেক ফিরিঙ্গী ১,২১৫ টাকা ও প্রতি দেশীয় কর্মচারী ৫৪০ টাকা মাত্র পাইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-গুণে এদেশে যে জ্ঞান-সূর্যের উদয় হইয়াছে, অদূরদর্শী রাজ-পুরুষদিগের চেষ্টায় তাহা এক্ষণে অকাল জলদজালে আবৃত হইয়াছে। ইংরাজ কিয়ৎ পরিমাণে সহৃদয়তা প্রণোদিত ও বহু পরিমাণে প্রয়োজনের বশবর্তী হইয়া এদেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিস্তারে সহায়তাপূর্বক ভারতবাসীর হৃদয়ে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন, সঙ্কীর্ণ-চিত্ত রাজকর্মচারীরা তাহার সম্যক্ পরিপূরণে সহায়তা করিতে এখনও প্রস্তুত নহেন। ফলে, দেশীয় কর্মচারীরা রাজসেবায় প্রাণ ব্যয় করিয়াও যথোচিত পারিশ্রমিক ও পুরস্কার-লাভে বঞ্চিত হইতেছে।

কেবল শাসন বিভাগেই নহে, রেলবিভাগে প্রায় ছয় সহস্র বৈদেশিক শ্বেতাঙ্গ উচ্চপদ-সমূহ অধিকার করিয়া দেশীয়দিগের অধিক বেতন-লাভের পথে বিঘ্ন-স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। বলা বাহুল্য রেলের কাজে লোকসান হইলে, রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহে দরিদ্র দেশীয়দিগের প্রদত্ত রাজস্ব হইতেই ক্ষতিপূরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ফলে রেলের লাভের ভাগী শ্বেতাঙ্গেরা ও লোকসানের ভাগী কৃষ্ণাঙ্গ প্রজা, এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। রেলের কারবারে ভারত গবর্ণমেণ্টের এ পর্যন্ত ৪ কোটি পাউণ্ড বা প্রায় ৬০ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্ষতিপূরণের জন্য ভারতীয় রাজকোষ হইতে রাজপুরুষেরা দরিদ্র প্রজার শোণিত-সম অর্থ-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উচ্চপদ-সমূহে দেশীয়ের নিয়োগ হইলে, অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে

কর্তৃপক্ষের কার্য-সিদ্ধি হইত, ক্ষতির পরিমাণও এরূপ ভয়ঙ্কর হইত না, দেশবাসীরাও "দু পয়সা" পাইয়া তাহাদিগের দারিদ্র্য কষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিতে পারিত। কিন্তু সেদিকে বৈদেশিক রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি নাই। ভারতবাসীর যতই আর্থিক ক্ষতি ঘটুক, শ্বেতাঙ্গ-সমাজের স্বার্থ-রক্ষার বিষয়ে তাঁহারা সর্বদা যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে।

রেল, সামরিক ও শাসনাদি বিভাগে নিযুক্ত শ্বেতহস্তীদিগের পোষণার্থ অর্থদান করিয়াই আমাদিগের অব্যাহতি লাভ ঘটে না। এই শ্বেত-জীবগণকে ধর্ম-শিক্ষা দিবার ব্যয়ও আমাদিগকেই প্রদান করিতে হয়। এজন্য বৎসরে প্রায় অর্ধ-কোটি মুদ্রা আমাদের রাজকোষ হইতে ব্যয়িত হইয়া থাকে। শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদিগের ধর্ম-জ্ঞান-বৃদ্ধি বিষয়ে যদি মিশনরি মহাশয়েরা সত্য সত্যই সহায়তা করিতে পারিতেন, যদি তাঁহাদিগের রাজনীতিক কপটতার মাত্রা কমাইতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে আমরা সানন্দে মিশনরিদিগের পোষণ-ভার গ্রহণ করিতে পারিতাম। কিন্তু এই খৃষ্টিয় পুরোহিত মহাশয়েরা আমাদিগের এই প্রকার হিতসাধনে তাদৃশ মনোযোগী নহেন। এরূপ বিড়ম্বনা আর কোনও দেশে কি সম্ভবপর? "বর্বরস্য ধনক্ষয়" আর কাহাকে বলে?

১৮২০ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছিলেন,—

The Government of a people by itself has a meaning and a reality, but such a thing as the government of one people by another does not and cannot exist. One people may keep another for its own use, a place to make money in, a *human cattle farm* to be worked for the profit of its own inhabitants.

ভাবার্থ এই যে, স্বদেশীয় রাজশক্তির দ্বারা শাসিত হওয়ার একটা সার্থকতা ও যাথার্থ আছে। কিন্তু এক জাতির দ্বারা অন্য জাতির শাসনের কোনও অর্থই হয় না। এক জাতি অপর জাতিকে নিজের কার্য-সিদ্ধির জন্য রাখিতে পারে, অর্থোপার্জনের যন্ত্রস্বরূপ করিতে পারে, "মনুষ্যের গোশালায়" পরিণত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা (ঘানি টানা প্রভৃতি) প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া লইতে পারে।

রমেশবাবু যথার্থই বলিয়াছেন,—"কিন্তু এমনই বিড়ম্বনা যে, গরু মরিয়া যায়, ঘানি টানিবে কে?" তিনি আরও বলিয়াছেন, "মিলের এই তীব্র উক্তির মধ্যে, প্রথমে যতটা সত্য আছে বলিয়া মনে হয়, তাহার অপেক্ষাও গভীরতর সত্য নিহিত আছে। এক জাতি অন্য জাতিকে শাসন করিতেছে, অথচ শাসিত জাতির স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইতেছে—পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ একটিও

নাই। বিজাতীয় শাসকের হস্তে বিজিত জাতির স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, মনুষ্য জাতি অদ্যাপি এমন কোনও উপায়ের উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে এই অনিষ্টনিবারণের একটি মাত্র উপায় আছে। সে উপায় এই যে, বিজিত জাতির হস্তে দেশের আংশিক শাসনভার-সমর্পণ। ইহাতে জেতা ও বিজিত উভয় জাতিরই যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে।"

ফলতঃ দেশ হইতে সংগৃহীত করের অধিকাংশ দেশের মধ্যেই ব্যয়িত না হইলে প্রজার দুর্দশা-বৃদ্ধি অনিবার্য হইয়া পড়ে। ভূতপূর্ব হিন্দু ও মোগল আমলে, প্রজাপীড়ক রাজার শাসনকালেও দেশের টাকার অধিকাংশ দেশেই থাকিত। প্রজারা যে রাজকর প্রদান করিত, তাহার প্রায় সমস্তই নানা সূত্রে তাহারা ফিরিয়া পাইত। কিন্তু বর্তমান কালে তাহা ঘটিতেছে না। যে কপদকটি ইংরাজের হাতে বা ইংলণ্ডে যাইতেছে, সেটি আর দেশে ফিরিয়া আসিতেছে না। কাজেই প্রজার দারিদ্র্য বাড়িয়াছে, নানা বিষয়ে ভারতবাসী তাহাদিগের পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। ফলে "আমরা যে কাজে হাত দিতে যাই, সেই কাজই শেষ পর্যন্ত পণ্ড হইয়া পড়ে। অন্য দেশে যে কার্য যে প্রণালীতে সম্পন্ন হয়, আমাদের দেশে সে প্রণালীতে সেই কার্য সম্পন্ন করিতে গেলে, শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল হইতে হয়। আমরা পূর্ব হইতে গণনা করিয়া যে ফলের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকি, সে ফল যথাসময়ে উপস্থিত হয় না; পরন্তু যাহা আমরা মনে ভাবি না, তাহাই আসিয়া উপস্থিত হয়।" শ্রীযুক্ত নৌরোজী মহোদয়ও এই কথাই বলিয়াছেন,—

In India's present condition the very *sweets* of every other nation appear to act on it as *poison*. With this continuous and ever increasing drain by innumerable channels, as our normal condition at present, the most well-intentioned acts of the Government become disadvantageous.

এই অস্বাভাবিক অবস্থার নিরাকরণ এবং ভারতীয় সমাজকে প্রকৃতিস্থ করিতে হইলে, রমেশবাবুর ব্যবস্থিত ঔষধই সর্বাগ্রে ব্যবহার্য। সুবিজ্ঞ নৌরোজী মহাশয়ও ঐ ব্যবস্থার পক্ষপাতী। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার হণ্টার সাহেব, England's work in India নামক গ্রন্থে উচ্চ রাজকার্যে বহুসংখ্যক দেশীয়ের নিয়োগ করিবার পরামর্শ দান করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এখন যেরূপ দুই দশ জন দেশীয়কে সিবিল-সার্বিসের কার্য দান করিয়া আপ্যায়িত করা হইতেছে, সেরূপ করিলে, এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না। উচ্চ পদসমূহে বহু সংখ্যায় দেশীয়ের নিয়োগ করিতে হইবে। তাঁহাদের কার্যপরিদর্শনের জন্যও সকল স্থানে

শ্বেতাঙ্গের নিয়োগ সুফলপ্রদ হইবে না। হণ্টার সাহেব শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের সংখ্যা একেবারে কমাইবার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ডিউক অব ডিবনসায়ার মহোদয়ও এই মতাবলম্বী। তিনি বলেন, উচ্চ রাজকার্যে বহুলভাবে দেশীয়দিগের নিয়োগ না করিলে, ভারতে সুশাসন কখনই প্রবর্তিত হইবে না। স্যার জর্জ উইঙ্গেট কেবল যে অধিক মাত্রায় দেশীয়-নিয়োগেরই পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে; তিনি ভারতবাসীকে হোমচার্জের দায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দান করিতেও পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ইংলণ্ডের সংঘর্ষে ভারতের যে অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে, হোমচার্জের সম্পূর্ণ তিরোধান ও ভারতবাসীর প্রদত্ত সমস্ত কর ভারতেই ব্যয়িত করিবার ব্যবস্থা না করিলে তাহার পূরণ হইবে না। আরও অনেক বিজ্ঞ মনীষী এই প্রকার মতই ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদিগের জাতীয় মহাসমিতিও বিগত ২১ বৎসর ধরিয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি এ দেশের ক্ষমতাপ্রিয় রাজপুরুষেরা এ বিষয়ে সম্যক্ কর্ণপাত করিতেছেন না।

এদিকে ধর্মব্যবসায়ী মিশনারি মহাশয়েরা দেশের তরলমতি যুবকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে,—"তোমাদের সামাজিক কু-শিক্ষার দোষেই তোমরা দারিদ্র্য ভোগ করিতেছ। নচেৎ বর্তমান বৃটিশ আমলে তোমাদিগের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সেরূপ কোনও কালে হয় নাই। তোমাদের ধন যথেষ্ট বাড়িয়াছে; কিন্তু তোমরা (১) বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াই সব খোয়াইতেছ। (২) তোমাদের ঋণ করিবার প্রবৃত্তি বড় প্রবলা এবং (৩) তোমরা সরকারি চাকরি পাইবার জন্য লালায়িত, এই তিন কারণেই তোমাদের দারিদ্র্য বাড়িতেছে। (৪) তোমরা অলঙ্কার-পত্রে টাকা আটকাইয়া রাখ, আর (৫) অবিচারে যাহাকে তাহাকে ভিক্ষা দিয়া থাক, (৬) মদ, গাঞ্জা, আফিম খাইয়াও অনেক টাকা উড়াইয়া ফেল। তোমাদের দানের দোষে ভারতবর্ষ এক দিকে যেমন Land of charity (দানশীলতার দেশ), অন্য দিকে তেমনিই Land of beggars (ভিক্ষুকের দেশ) হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র-ভারতে ৪১ লক্ষ লোক কেবল ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করে, ইহা কি সামান্য লজ্জার বিষয়? কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের কু-শিক্ষায় তোমাদের দেশের লোকের এই লজ্জাবোধ পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ধারণা আছে যে, সাহেবেরা দেশের সব বড় বড় চাকরি পায় বলিয়াই তোমাদের ধন-বৃদ্ধির একটা বড় পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেটা তোমাদের বিষম ভ্রান্তি। ভারতে ইংরাজ সিবিলিয়ানেরা যে বেতন পান, তাহার হিসাব করিলে দেখিতে পাইবে যে, ঐ বেতনের জন্য তোমাদের গড়ে জনপ্রতি বার্ষিক দুই পয়সার অধিক দিতে হয় না। ঐ সকল পদে অর্ধ বেতনে দেশীয়

লোকের নিয়োগ করিলে তোমাদিগের গড়ে বড় জোর এক পয়সা করিয়া ব্যয় লাঘব হইতে পারে। বৎসরে এক পয়সা বেশী বা কম খরচে কিছু যায় আসে না। ফল কথা, বৃটিশ আমলে তোমাদের প্রকৃতপক্ষে ধনবৃদ্ধি হইলেও উল্লিখিত "ষট্‌চক্রে" পড়িয়া তোমরা ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছ।" এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ আমাদিগের "মরালিটি" বা ধর্মভীরুতার অভাব ও একান্নবর্তী পরিবার প্রথাকে দারিদ্র্য-বৃদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দেশ দিয়া থাকেন। যীশুখৃষ্টকে না ভজিলে ও সাপে মানুষে কথা কয়, ইত্যাকার বাইবেলীয় উপকথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিলে, ভারতবাসীর মঙ্গল হইবে না, এইরূপ উপদেশদানেও ইঁহারা বিরত নহেন। হোমচার্জ প্রভৃতির ব্যপদেশে দেশের অর্থ শোষিত হওয়ায় ও রাজানুগ্রহ-পুষ্ট বিলাতী বাণিজ্যের সংঘর্ষে যে, ভারতবাসীর দিন দিন ধনক্ষয় হইতেছে, তাহার উল্লেখ এই সকল ভারতপ্রবাসী মিশনরির মুখে প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না।

যাঁহারা পূর্বোল্লিখিত কারণাবলীর নির্দেশ-পূর্বক ভারতীয় দারিদ্র্য-সমস্যার মূল তত্ত্ব-সমূহ সংগোপন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি কর্মে অর্থ ব্যয় কি এদেশের চিরন্তন প্রথা নহে? বর্তমান কালেই কি আমাদিগের পল্লীসমূহে এ সকল বিষয়ে অকস্মাৎ ব্যয়-বাহুল্যের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে? বরং পল্লীসমাজে কি অধুনা পূর্বের তুলনায় এ সকল কার্যে সমারোহের মাত্রা হ্রাস পায় নাই? যদি তাহা না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কি এই সকল কার্য দেশের দরিদ্রতাবৃদ্ধির সহায়ক? এতদুপলক্ষে ব্যয়িত অর্থ কি সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বণ্টিত (distributed) হয় না? এরূপ সামাজিক আদান-প্রদানে কি দেশ ধনহীন হয়? না, যে টাকা একবার দেশত্যাগপূর্বক সমুদ্রপারে গমন করে ও আর তাহার স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার কোনও উপায় থাকে না, তাহাতেই দেশের দারিদ্র্য-বৃদ্ধি হইয়া থাকে?

তাহার পর মহাজনের ও ঋণ-প্রবৃত্তির কথা। পূর্বকালে কি এদেশে মহাজন ছিল না? অধুনা সুদের হার যদি বর্ধিত হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ কি? দেশে টাকা বেশী থাকিলে সুদের হার কমে, না অর্থাভাব ঘটিলে সুদের হার বাড়ে? লোকের অর্থাভাবই কি ঋণ-প্রবৃত্তির কারণ নহে? অর্থের অভাব অনুভূত না হইলে কেহ ঋণ করিতে অগ্রসর হয় কি? ঋণের কারণ অভাব, না অভাবের কারণ ঋণ? পূর্বে মহাজনেরা দেশবাসীর অনুগত ভৃত্যবৎ ছিল, একালে তাহারা গ্রামবাসীর প্রভুর আসন গ্রহণ করিল কিরূপে। এ বিষয়ে মিঃ থরবরন যাহা (৭০ পৃষ্ঠা দেখুন) বলিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ কেহ করিতে পারেন কি?

রাজার প্রতিকূলতায় দেশের লোকের শিল্প-বাণিজ্য বিনষ্ট হইলে ও বৈদেশিক

শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় প্রজাকুলে রাজার আনুকূল্য-লাভে বঞ্চিত হইলে, বিদ্যালয়াদিতে স্বাধীন জীবিকার অবলম্বনোপযোগিনী শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে, লোকে চাকরি ভিন্ন আর কোন্ পথে ধাবিত হইতে পারে? রাজশক্তি যেখানে মাদক সেবনে উৎসাহদায়িনী, সেখানে প্রজার মাদক-দ্রব্যে অনুরক্তি নিবারণ কি নিতান্তই কষ্টসাধ্য নহে? প্রাচ্য জাপান খৃষ্ট-ভক্ত না হইয়াও চণ্ডু-সেবীর মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করে, আর চীনদেশবাসী অহিফেন সেবনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সুসভ্য পাশ্চাত্য কুলশ্রেষ্ঠ ইংরাজ বন্দুকের গুলিতে ও সঙ্গীনের প্রহারে তাহাদিগের জর্জরিত করিয়া অহিফেন সেবনে বাধ্য করেন, ইহার কারণ কি?

দান-কালে পাত্রাপাত্র-বিচারে আমাদিগের আগ্রহ প্রকাশ পায় না, পাছে প্রকৃত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সাহায্য না পায়, পাছে সাধু-সজ্জনের সেবায় ব্যাঘাত ঘটিয়া ধর্মহানি হয়, এই ভয়ে আমরা যাচক-মাত্রকে দান করিতে অগ্রসর হই, (ইদানীং সে প্রবৃত্তিও লোপ পাইতেছে) ইহা আমাদিগের দোষ হইতে পারে; কিন্তু যে দেশে ত্রিশ কোটি লোকের বাস, যে দেশের প্রায় অর্দ্ধেক লোক চিরকাল একবেলা খাইয়া কাল-যাপনে বাধ্য হয়, সে দেশে যদি ৪১ লক্ষ লোক ভিক্ষাজীবী থাকে, প্রতি সত্তর জনের মধ্যে একজন ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাহা হইলে কি ঐ দেশকে Land of beggars বা ভিক্ষুকের দেশ বলিয়া উপহাস করা শোভা পায়? এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণের কু-শিক্ষায় দেশবাসীর লজ্জাবোধ পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া নিন্দা করা কি যুক্তিসংগত? অলঙ্কার-পত্রে আমাদের কিছু টাকা আটকাইয়া থাকে সত্য, কিন্তু অলঙ্কারপত্রের সংখ্যাও কি দিন দিন কমিয়া আসিতেছে না? পূর্বে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ও কৃষকদিগের গৃহে যে পরিমাণে "সোনা-দানা" দৃষ্ট হইত, এখন কি তদপেক্ষা অল্প দৃষ্ট হয় না? বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য, ভূমির উর্বরতার জন্য ও পাটের চাষেব জন্য কৃষকসমাজের অবস্থা সকল স্থানে অধিক শোচনীয় না হইতে পারে, কিন্তু ভারতের অন্য সর্বত্র কি তাহাদিগের দুরবস্থার একশেষ হইতেছে না? মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পূর্বে যত অলঙ্কার-পত্র ছিল, অনেক স্থলেই এখন আর তাহার অর্দ্ধাংশও দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্বের অপেক্ষা এখন অল্প টাকা অলঙ্কারাদিতে আবদ্ধ থাকিতেছে; কিন্তু তদনুপাতে আমাদের সমাজ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে কি? চারিদিকে "হা অন্ন হা অন্ন" রব কেন উঠিয়াছে?

শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ান ও কর্মচারীদিগের মোটা বেতন যোগাইতে গিয়া আমাদিগের মুখে রক্ত উঠিতেছে বলিয়া যাঁহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তি প্রদর্শন-কল্পে যে অপূর্ব যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতুককর। রাজকার্যে দেশীয়ের সংখ্যাধিক্য হইলে ভারতীয় প্রজার ব্যয়ভার

বৎসরে প্রতি জনে গড়ে এক পয়সা মাত্র লাঘব হইতে পারে, কিন্তু সেই এক পয়সার মূল্য কত? ত্রিশ কোটি প্রজার প্রদত্ত ত্রিশ কোটি পয়সায় বৎসরে অন্যূন ৪৭ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ৪৭ লক্ষ টাকা দেশীয় কর্মচারীদিগের হস্তগত হয়। কিন্তু বড়লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্য সদাশয় সিবিলিয়ান মিঃ ডোনাল্ড স্মীটন বাহাদুর দেখাইয়াছেন যে, শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদিগের সংখ্যা হ্রাস করিলে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে। এই ১৪ কোটি মুদ্রা প্রজার মঙ্গলের জন্য কত প্রকারে ব্যয়িত হইতে পারে, তাহা এই শ্রেণীর উপদেষ্টারা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর চতুর্দশ কোটি মুদ্রা কূপ, তড়াগ, পুষ্করিণী প্রভৃতির খনন ও পঙ্কোদ্ধার কার্যে ব্যয় করিলে কি প্রকৃতি-পুঞ্জ সামান্য উপকার লাভ করিবে? গ্রাম্য পথ-ঘাটের সংস্কার, দেশের পরিচ্ছন্নতা-বর্ধন ও চিকিৎসালয়াদির প্রতিষ্ঠা, শাসন ও বিচার বিভাগের পার্থক্য-বিধান, উচ্চ শ্রেণীর শিল্প-বিদ্যালয়াদির স্থাপন প্রভৃতি বহু প্রকার অভাব এদেশে বিদ্যমান। চতুর্দশ কোটি মুদ্রায় কি এ সকল অভাব ক্রমশঃ আংশিক ভাবেও মোচিত হইতে পারে না? তাহাতে কি দেশবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্ধিত হইতে পারে না? আর এই চতুর্দশ কোটির সহিত যদি হোমচার্জের অর্ধাংশ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি দেশের সামান্য উপকার হয়? যে দেশে ২২ কোটি লোকের বাস, সে দেশে অন্ততঃ ২২টি শিল্প-কলা-শিক্ষার কলেজ থাকা কি নিতান্ত আবশ্যক নহে? এখন দেশশুদ্ধ লোক "দেশীয় শিল্প চাই" "দেশীয় শিল্প চাই" করিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অর্থাভাবে অন্ততঃ ২।৪টাও বড় বড় শিল্পশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিতেও সমর্থ হইতেছেন না। ইহা কি সামান্য লজ্জার বিষয়? এ সকল কথা চিন্তা করিলে গড়ে দুই এক পয়সা ব্যয়-লাঘবের মূল্য কত, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রবীণ সিবিলিয়ান মিঃ ডোনাল্ড স্মীটন, সি. আই. ই. বাহাদুর বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে এডিনবরা নগরে ভারতবর্ষীয় বর্তমান শাসন পদ্ধতির সংস্কার বিষয়ে যে সারগর্ভ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রভূতবেতনভোগী সিবিলিয়ান পোষণের অনিষ্টকারিতা অতি যুক্তিযুক্ত ভাষায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতার একাংশের মর্ম এইরূপ,—

"বর্তমান শাসন-প্রণালীর দোষে সমগ্র দেশ দরিদ্র হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৪ কোটি পরিবার দৈনিক তিন আনা মাত্র আয়ে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইতেছে। অথচ তাহাদিগের নিকট হইতে জনপ্রতি গড়ে বার্ষিক তিন টাকা হিসাবে কর আদায় করা হইয়া থাকে। পাঁচজন লইয়া যে পরিবার গঠিত, সে পরিবারকে ১৫

টাকা রাজকরই দিতে হয়। এইরূপে ভারতবাসীর নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১১০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করিতেছেন। প্রজার এই কষ্ট-দত্ত অর্থ বৈদেশিক সিবিলিয়ানদিগের বিলাস-বিভ্রমপূর্ণ জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্য ও সামরিক কর্মচারী-দিগের সমর-কণ্ডুতি নিবৃত্তির আয়োজনে যদৃচ্ছা ব্যয়িত হইতেছে। এই সকল অপব্যয়ের গুরুভার ভারতবাসীর পক্ষে এক্ষণে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুসভ্য ইংরাজের ইহা ঘোর কলঙ্কের বিষয়, সন্দেহ নাই।

"যে সকল কারণে ভারতবাসীর দারিদ্র্য-বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই সকল কারণের মূলোচ্ছেদ করিলেই আমার বিবেচনায় ভারতবাসী ধনশালী হইতে পারিবে। ভারতীয় রাজকোষ হইতে প্রতি বৎসর ২৫ কোটি টাকা সামরিক বিভাগে, ১৫।১৬ কোটি টাকা সিবিল ব্যবস্থার জন্য, চারি পাঁচ কোটি টাকা শ্বেতাঙ্গদিগের পেন্সন বা বৃত্তিদানে, ৬ কোটি টাকা পূর্তবিভাগে ও ৬।৭ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ কার্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। আমার বিশ্বাস, এই ৬০ কোটি টাকার বিনিময়ে ভারতবাসী কোনও উপকারই লাভ করিতে পারে না বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। ভারতের অর্থ-পুষ্ট সামরিক বিভাগের দ্বারা ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডেরই সমধিক উপকার হয়। উপকারের তুলনায় ব্যয় বিভাগ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ভারতীয় সামরিক ব্যয়ের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ বা ৮ কোটি টাকা ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে প্রদান করা কর্তব্য। দেওয়ানি বিভাগে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর আবশ্যকতা আদৌ নাই বলিলে দোষ হয় না। মহীশূর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে অল্প বেতনের দেশীয় কর্মচারীরা সুচারুরূপে সমস্ত রাজকার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বৃটিশ ভারতেও সেরূপ ব্যবস্থার দ্বারা ব্যয় লাঘব করিতে যত্ন-প্রকাশ কর্তব্য। আমার প্রস্তাব মত কার্য হইলে এই বিভাগে অন্ততঃ অর্ধাংশ অর্থাৎ ৮ কোটি টাকা ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে, পেন্সনের ব্যয়ও ২ কোটি টাকা কমিয়া যাইবে। রাজস্ব আদায় বিভাগে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদিগের সংখ্যা হ্রাস করিয়া বার্ষিক তিন কোটি টাকা ও পূর্তবিভাগে প্রায় তিন কোটি টাকা খরচ কমান যাইতে পারে।

"এইরূপে ব্যয় লাঘব করিলে পূর্বোক্ত চারি বিভাগ হইতেই রাজকোষে বার্ষিক ২২।২৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। বৎসরে ২৩ কোটি টাকার খরচ কমিলে গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগকে অর্ধেক ভূমিকর ছাড়িয়া দিতে পারিবেন, লবণের শুল্ক অর্ধেকেরও অধিক কমাইতে পারিবেন এবং বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকার অনধিক আয়ে আয়করও ছাড়িয়া দিতে সমর্থ হইবেন। ধনবানদিগের চক্ষে এই সকল সুবিধা তাদৃশ গণনীয় বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে, কিন্তু যাহারা তিন আনা দৈনিক আয়ে পরিবার প্রতিপালন করিতে বাধ্য হয়, এই প্রকার ব্যয়-সংক্ষেপে

তাহাদিগের উপকার যথেষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।···কিন্তু যতদিন ভারত-সচিব ও বড়লাটদিগের হস্তে অসীম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, ততদিন এ সকল সংস্কার ঘটিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কারণ, তাঁহারা জনসাধারণের মতামতের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া যথেচ্ছাচার করিয়া থাকেন। ভারতবাসীরাও এক্ষণে একথা বুঝিতে পারিয়াছে।

"ভারত শাসনের বর্ত্তমান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ভিন্ন কোনও পক্ষেরই মঙ্গল নাই। কেবল পার্লামেণ্টে ভারতীয় সদস্যদিগকে প্রবেশের অধিকার দান করিলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাইবে না। প্রথমে ভারত-সচিব ও বড়লাটের ক্ষমতার হ্রাস করিতে হইবে। বস্তা বস্তা টাকা বেতন না দিলে যাঁহাদিগকে পাওয়া যায় না, এরূপ কর্মচারীর সংখ্যা ও প্রভাব প্রতিপত্তি কমাইতে হইবে। অবশ্য বর্তমান কালের অবৈধ ক্ষমতাপ্রিয় রাজপুরুষেরা এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইবেন না। কিন্তু যদি ইংলণ্ড ও ভারতের স্থায়ী মঙ্গল প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে এই উপদেশ অনুসারে কার্য করাই নিতান্ত আবশ্যক।"

ইংরাজের সহিত বাণিজ্য-সংগ্রামে পরাভব, ভূমিরাজস্বের কঠোরতা, হোমচার্জ ব্যপদেশে ভারতের রুধির-শোষণ ও প্রায় সমুদায় অধিক বেতনের পদে বিদেশীয়-গণের একাধিপত্য প্রভৃতি কারণে দেশবাসীর কিরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পশ্চাদ্বর্ণিত মন্তব্যে তাহা অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে,—

"আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এক সময় ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কাপড় যোগাইয়াছে, আজ সে পরের কাপড় পরিয়া লজ্জা বাড়াইতেছে—এক সময়ে ভারতভূমি অন্নপূর্ণা ছিল, "হ্যাদে লক্ষ্মী হইল লক্ষ্মীছাড়া"—এক সময়ে ভারতে পৌরুষরক্ষা করিবার অস্ত্র ছিল, আজ কেবল কেরাণীগিরির কলম কাটিবার ছুরিটুকু আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজত্ব পাইয়া অবধি ইচ্ছাপূর্বক ছলে বলে কৌশলে ভারতের শিল্পকে পঙ্গু করিয়া সমস্ত দেশকে কৃষিকার্যে দীক্ষিত করিয়াছে। আজ আবার সেই কৃষকের খাজনা বাড়িতে সেই হতভাগ্য ঋণসমুদ্রের মধ্যে চিরদিনের মত নিমগ্ন হইয়াছে। এই ত গেল বাণিজ্য এবং কৃষি।—তাহার পর বীর্য এবং অস্ত্র; সে কথার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।···এদিকে দেশ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় পাঁচ শত কোটি টাকা খাজনার এবং মহাজনের লাভে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। ব্যবসায়ের জন্য মূলধন থাকে কোথায়? এই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছি।···রোমের শাসনে, স্পেনের শাসনে, মোগলের শাসনে, এত বড় একটা বৃহৎ দেশ কি এমন নিঃশেষে উপায়-বিহীন হইয়াছে?"—[বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) ১৩১০ সাল, কার্তিক সংখ্যায় "অত্যুক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ।]

এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে ভারতবাসী অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। জাতীয় মহাসমিতি এই সংস্কার-সাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্বোল্লিখিত দুরবস্থার সংস্কার-বিষয়ে রাজা ও প্রজাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। বিবিধ বৈষম্যের লীলাস্থল ভারতবর্ষে এই শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে অপূর্ব একতার সঞ্চার হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ফিরিঙ্গী, বাঙালী, মান্দ্রাজী, পঞ্জাবী পার্শী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, উড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ একসূত্রে বদ্ধ ও একই মহান্ উদ্দেশ্য পথে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহাদিগের চেষ্টায় জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনে অদ্যাপি বিশেষ সুফল প্রসূত হয় নাই। সে জন্য অনেকে মহাসমিতির প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন। অনেক লঘুচিত্ত ব্যক্তি এই জাতীয় শুভানুষ্ঠানের প্রতি বিদ্রূপ-প্রকাশেও পশ্চাৎপদ নহেন।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ভারতীয় কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি বৃটিশ শাসনের—ইংরাজের প্রদত্ত পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রধানতম সুফল। এরূপ অনুষ্ঠান এদেশে পূর্বে ছিল না। সুতরাং, ইহা যে দেশের সামগ্রী, সেই দেশের রীতির অনুকরণে ইহাকে পরিচালিত করিতে না পারিলে, সুফললাভের সম্ভাবনা সুদুর-পরাহত হইবে। পাশ্চাত্য দেশে প্রজার রাজনীতিক আন্দোলনে যে আশু সুফল-লাভ হয়, তাহার কারণ এই যে, তত্রত্য প্রজা-সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত এই সকল আন্দোলনে অন্তরের সহিত যোগদান করে। আমাদের দেশে অজ্ঞতার জন্য অনেকেই এই সকল আন্দোলনের সংবাদ পর্যন্ত রাখেন না, সমাজের সকলে জাতীয় মহা-সমিতির কার্যে সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কাজেই ক্ষমতাপ্রিয় যথেচ্ছাচার রাজপুরুষেরা আন্দোলনকারীদিগের মুষ্টিমেয়তা বা সংখ্যার অল্পতা অনুভব করিয়া প্রতিকারে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে জাতীয় মহাসমিতির অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন হয় না, আমাদিগের অকর্মণ্যতা ও অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।

যদি জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি প্রকাশ পায়, এতদুপলক্ষে যদি সমগ্র সমাজ আমূল আলোড়িত হয়, রাজপুরুষেরা যদি বুঝতে পারেন যে, মহাসমিতির প্রার্থনাসমূহ সমগ্র দেশবাসীর অনুমোদিত, সে প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে ভারতীয় সমাজের অন্তস্তল পর্যন্ত মর্মবেদনায় বিক্ষোভিত হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে তাঁহারা কংগ্রেসের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতে অবশ্যই আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। এই কারণে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া, দেশের বর্ধনশীল দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা, আমাদের শোচনীয় অধোগতির কথা, তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া, কংগ্রেসের প্রতি সকলের অনুরাগ-বর্ধন-পূর্বক এই শুভানুষ্ঠানের শক্তিবৃদ্ধি করা প্রত্যেক দেশ-

হিতৈষীর অবশ্য কর্তব্য। দেশের প্রত্যেক সুসন্তানের এই কর্তব্যভার স্কন্ধে গ্রহণ করা উচিত। ১৮৩৩ সালের পার্লামেন্টের প্রণীত বিধানে ও ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণাপত্রে আমরা যে সকল অধিকার পাইয়াছি, যে সুশাসনের আশ্বাস পাইয়াছি, তাহা দেশের অনেকেই সম্যক্ অবগত নহেন। তাই আমরা সেই সকল অধিকারে বঞ্চিত হইয়া অবনতির খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি। বৃটিশ ভারতের সকল প্রজা, অতি নিম্নশ্রেণীর প্রজা পর্যন্ত, যাহাতে আমাদের রাজদত্ত প্রকৃত অধিকারের বিষয় সম্যক্রূপে অবগত হইতে পারে, সে অধিকারের পূর্ণ ফললাভের জন্য যাহাতে সকলে ব্যকুল হইয়া উঠে, দেশের প্রত্যেক সুসন্তানকে সে চেষ্টা করিতে হইবে। অজ্ঞতার জন্যই এতদিন আমাদিগের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু বহুদিন পূর্বে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না, সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।...বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাট লক্ষ (এখন প্রায় ৮ কোটি) লোকের দ্বারা যে কোনও কার্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালার লোক-শিক্ষা নাই।" [বঙ্গদর্শন, ১২৮৫ সাল, অগ্রহায়ণ সংখ্যা—"লোক-শিক্ষা" প্রবন্ধ]

এক্ষণে যাহাতে সে অজ্ঞতার নিরাকরণ হয়, দেশের আপামর জনসাধরণে আপনাদিগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে, জাতীয় মহাসমিতির সহিত প্রতিকার-প্রার্থনায় সকলে সাগ্রহে যোগদান করিতে পারে, রাজপুরুষেরা যাহাতে মুষ্টিমেয় আন্দোলনকারী বলিয়া আমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতে না পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। এই সুমহান্ পবিত্র কর্তব্য-সাধনে উৎসাহ-প্রকাশ না করিয়া যাঁহারা মহাসমিতির প্রতি উপহাস বা উপেক্ষা-প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা দেশের শত্রু বলিয়া চিরকাল সুধী-সমাজের ঘৃণার ভাজন হইবেন।

বৃদ্ধ ভারত-হিতৈষী হিউম সাহেব জাতীয় মহাসমিতির বিগত অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে ভারতবাসীকে যে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকের স্মরণ রাখা কর্তব্য। তিনি বলিয়াছেন,—

"তোমরা কি মুহূর্তের জন্যও মনে কল্পনা কর যে, কোন রাজশক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাদিগকে রাজনীতিক অধিকার প্রদান করিবেন? যে সকল অধিকার তোমাদিগকে প্রদান করিলে শক্তিপ্রিয় শাসকদিগের শক্তির হ্রাস ঘটে, ন্যায়ের হিসাবে তোমাদিগের সহস্র দাবী থাকিলেও গবর্ণমেণ্ট কি সে সমুদায় সহজে ছাড়িবেন? যে ক্ষমতা ত্যাগ করিলে রাজার স্বদেশবাসিগণ উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত

হইবেন, রাজা কি তাহা বিনা বাক্য-ব্যয়ে ত্যাগ করিবেন? তোমরা কি স্বপ্নেও ভাব যে, ঔদারনৈতিক অথবা যে কোন গবর্ণমেণ্টই হউক, শুদ্ধ ন্যায়ের অনুরোধে তোমাদিগের দুঃখ-বিমোচনে অগ্রসর হইবেন? এরূপ অলীক চিন্তায় কদাপি আত্ম-বঞ্চনা করিও না। ভারতে এবং বিলাতে অবিশ্রান্তভাবে, অদম্য অধ্যবসায় ও উৎসাহ সহকারে আন্দোলন করিতে হইবে, বিলাতেই আন্দোলনের মাত্রা অধিক হওয়া আবশ্যক। এইরূপে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গবর্ণমেণ্টকে যদি ক্রমাগত উত্ত্যক্ত ও জ্বালাতন করিতে পার, তবেই তোমাদিগের ইষ্টসিদ্ধির পথ প্রসারিত হইবে। রাজনীতিক আন্দোলনের সুফলে আমার অবিশ্বাস নাই, কিন্তু তোমরা যেরূপে ঔদাসীন্য সহকারে আন্দোলন কর, তাহাতে কিছুই হইবে না। আন্দোলনে একাগ্রতা অবলম্বন কর, তোমাদিগের অর্থ, সামর্থ্য সমস্তই জাতীয় উন্নতিকল্পে উৎসর্গ কর, ভারতে সংবৎসরব্যাপী মহাসমিতির আন্দোলন প্রদীপ্ত রাখ, বিলাতের প্রত্যেক নগর ও গ্রাম তোমাদিগের প্রার্থনার ধ্বনিতে মুখরিত কর, কর্তৃপক্ষের ভ্রূভঙ্গীতে ভীত হইও না, প্রাণপণে ইংরাজ জাতির হৃদয়ে এই ধারণা অঙ্কিত কর যে, তোমরা যাহা ধরিয়াছ, তাহা কিছুতেই ছাড়িবে না, তোমাদিগের প্রার্থনার পূরণ না হইলে, ইংরাজ জাতিকে এক দিনের জন্যও বিশ্রাম দিবে না, জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন কর যে, তোমরা সময়, অর্থ, এমন কি জীবন পর্যন্ত পাত করিয়া সংকল্প-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কার্য দ্বারা আপনাদিগের যোগ্যতা প্রতিপাদন কর। দেখিবে, গ্রীষ্মাগমে তুষারের ন্যায় তোমাদিগের উন্নতি-পথের কণ্টক তিরোহিত হইয়াছে।

"ভারতের সংবাদ-পত্রসমূহকে প্রায়ই গবর্ণমেণ্টের দোষ কীর্তন করিতে দেখি। গবর্ণমেণ্টের অনেক দোষ আছে সত্য, কিন্তু তোমাদিগের নিজের দোষই সর্বাপেক্ষা অধিক। তোমরা নিজে কর্তব্য পালন করিবে না, স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর উন্নতিকল্পে সর্বস্ব-পণে আত্ম-বিসর্জন করিবে না, শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের দোষ দিলে চলিবে কেন? তোমাদিগের উন্নতি তোমাদিগেরই উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা সমস্ত সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত মতভেদ বিস্মৃত হও, পরস্পরকে বিশ্বাস কর, ভণ্ডামি ও কপটতা পরিত্যক্ত হউক, সকলে এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, রাত্রিদিন ভুলিয়া এক মনে, এক ধ্যানে উদ্দেশ্য-সংসাধন-পথে অগ্রসর হও, অবিচলিত, অক্ষুব্ধ ও অসন্দিগ্ধ-চিত্তে কার্যে ব্যাপৃত হও, দেখিবে, আশু তোমাদিগের কামনা পূর্ণ হইবে। নচেৎ এক্ষণে তোমাদিগের আন্দোলনে যেরূপ একাগ্রতা ও আন্তরিকতার অভাব প্রবল রহিয়াছে, তাহা থাকিলে কিছুই লাভ হইবে না।

"আবার বলি, গবর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিলে, তোমাদের নিজের দোষ চাপা

পড়িবে না; অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্টের ন্যায় তোমাদের গবর্ণমেণ্টও আপনাকে সর্ববিষয়ে সমধিক জ্ঞানবান্ ও শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা ইচ্ছা করিয়া কখনই তোমাদিগকে এক তিলার্ধ অধিকার প্রদান করিবেন না, বরং উত্তরোত্তর প্রদত্ত অধিকারের সংকোচে প্রয়াস পাইবেন। যে দেশে প্রজাশক্তি হীনবল, সে দেশে রাজশক্তির এইরূপই ব্যবহার ঘটিয়া থাকে। রাজশক্তির এরূপ অত্যাচার-নিবারণে প্রজা-সাধারণের সর্বদা চেষ্টা করা সর্বতোভাবে বিধেয়। প্রজারা যদি রাজার অবিচার বন্ধ করিতে না পারে, তবে সে দোষ প্রজাদিগের—রাজার নহে, এ কথা স্মরণ রাখিও।"

ফলতঃ আমরা অবনতির চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মিঃ ডিগ্‌বী মহোদয় গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীর দৈনিক আয় গড়ে জন প্রতি দুই আনা ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উহা ছয় পয়সায় পরিণত হয়। অধুনা উহা দৈনিক তিন পয়সায় দাঁড়াইয়াছে। অন্নপূর্ণার সন্তানদিগের আর কি দুরবস্থা হইতে পারে! অতএব আর ঔদাস্য প্রকাশের সময় নাই। ক্ষমতাপ্রিয় রাজপুরুষদিগের কুটিলতায় আমরা যে বৈধ অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য সময় থাকিতে বদ্ধপরিকরভাবে চেষ্টা না করিলে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে। মিঃ ডিগ্‌বী বলিয়াছেন,—

"India is not far from collapse."

সম্মোহন—বিত্ত-বিজয়

History records in its annals no greater marvel of one race over-mastering another in all matters alike of mind and body. *Prosperous British India*

ইংরাজ "শারীর যুদ্ধে" ভারতবাসীর বাহুবল ও বাণিজ্য-সংগ্রামে তাহাদিগের ধনবল হরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন। ভারতীয় সমাজের ধন-বল ও বাহু-বলই বৈদেশিক রাজার নিকট একমাত্র আশঙ্কার কারণ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। বুদ্ধি-বলেও মানুষ অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারে। নীতিজ্ঞদিগের মতে "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।" সুতরাং বুদ্ধি-বল উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ ভারতীয় আর্যজাতির বুদ্ধি কখনই উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না। কাজেই বুদ্ধিমান ইংরাজকে ভারতবাসীর বুদ্ধিবিপ্লব ঘটাইয়া তাহাদিগের চিত্ত-বৃত্তি-নিচয়কে সম্মোহিত করিয়া রাখিবার জন্যও সংগ্রামের আয়োজন করিতে হইয়াছে। এদেশে অভিনব শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তন দ্বারা দেশবাসীর চিন্তা-স্রোতকে নূতন পথে পরিচালিত করা, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব-পরিচয়ে দেশবাসীর বুদ্ধি-বৃত্তিকে মোহাভিভূত করিয়া

তাঁহাদিগের আত্মাভিমান ও আত্ম-শক্তির প্রতি বিশ্বাস নষ্ট করা এই সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য।

এই সংগ্রামে পরাধীন জাতির চিত্ত-ক্ষেত্র বিজেতৃজাতির সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতির বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইবার ও চিত্তের দৃঢ়তা হ্রাস করিবার পক্ষে এই প্রকার সংগ্রামই অমোঘ উপায় বলিয়া পাশ্চাত্য রাজনীতি-বিশারদেরা নির্ধারণ করিয়াছেন। মিশরের অন্তর্গত খার্টুম নগরে "গর্ডন কলেজ" ও পিকিনে "হ্যানলিং" ও "টং-ওয়েং কলেজ" প্রভৃতি এইরূপ উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে মিশনরিগণ এই বুদ্ধিভ্রংশকর সংগ্রামে প্রধান অস্ত্ররূপে কার্য করিয়া থাকেন। ইহাদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষে এই চিত্ত-বিজয় ব্যাপারে ইংরাজ সামান্য সফলতা লাভ করেন নাই।

ভারতে এই অভিনব সংগ্রাম আরব্ধ হওয়ায় দেশবাসীর চিন্তাস্রোত ইংরাজের প্রদর্শিত নূতন পথে ধাবিত হইল, স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বকীয় পূর্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস এবং বৈদেশিক সকল বিষয়েরই প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় যাঁহারা স্বভাবতঃ পর-দুঃখ-কাতর, তাঁহাদের অনেকে বুদ্ধিমার্গে বিভ্রান্ত হইয়া সমাজের আমূল সংস্কার ও পাশ্চাত্য আদর্শে উহার গঠনকেই জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। এইরূপে সংস্কারক সমাজের প্রাদুর্ভাবে হিন্দুসমাজ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নূতন শিক্ষার গুণে ও মিশনরীদের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, সমাজে একতার বন্ধন শিথিল হইয়াছে। তদবধি নূতন হিংসা-বিদ্বেষ ও নূতন দলাদলির স্রোত অব্যাহত-ভাবে আমাদের সমাজে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

সাধারণ দলাদলি ও গৃহকলহ পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান; এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে, পূর্বেও ছিল। কোন্ সংসার গার্হস্থ্য-কলহ-পরিশূন্য? কোন্ সমাজে দলাদলি নাই? কোন্ সভায় স্বাধীন মতাবলম্বী সদস্যেরা নির্বিরোধ? এমন যে সুসংযত ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট, তাহাতেও সদস্যদিগের মধ্যে অসম্প্রীতির নিদর্শন দৃষ্ট হয়। এমনকি সুশিক্ষিত নেতৃবৃন্দের মধ্যেও সময়ে সময়ে বাক্যালাপ বন্ধ হয়। কিন্তু এদেশে যে দলাদলির বাহুল্য দৃষ্ট হয় ও তাহার ফলে আরব্ধ কার্য পণ্ড হয়, তাহার কারণ ভারতবাসীর পরাধীনতা। পরাধীনতায় চিত্তবৃত্তি সমূহের বিশেষ অবনতি ঘটে, হিংসা-দ্বেষ বৃদ্ধি পায়, সমবেতভাবে কার্য করিবার শক্তি বিনষ্ট হয়। স্বাধীন জাতি দেশের জন্য সকল বিভিন্নতা ভুলিতে পারে। তজ্জন্য তাহাদের সাধনক্ষেত্র আছে বলিয়া সেই শিক্ষাটুকু তাহাদের হইয়াছে। আমাদের সেই সাধন-ক্ষেত্রের অভাবে সামান্য দলাদলিগুলি এরূপ সর্বগ্রাসী হইয়া উঠে।

ক্রমশঃ জাতীয় জীবনে লক্ষ্য যেমন উচ্চ ও মহান্ হইয়া উঠিবে, তেমনি আমরাও অল্পে অল্পে এই স্বার্থ-প্রণোদিত তুচ্ছ কলহ বিস্মৃত হইতে শিখিব। স্বাধীন জাতির আত্মবিশ্বাস অটল থাকে, শত বিরোধ বিদ্যমান সত্ত্বেও, আমাদের ন্যায় তাহারা তাহাতে জাতীয় জীবনের অবসানের কল্পনা করিয়া নিশ্চেষ্ট হয় না। সে যাহা হউক, মিশনরীদিগের শিক্ষায় এ দেশে যে দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূল ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ ও সমাজ-বিদ্বেষ। এই কারণে ইহাকে "নূতন" আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

'নূতন' শিক্ষার "হিড়িকে" পড়ায় দেশের অনেক পুরাতন উৎকৃষ্ট প্রথাও বর্বরোচিত বলিয়া এক্ষণে আমাদিগের নিকট বোধ হইতেছে, পূর্বপুরুষগণ অসভ্য বা অর্ধ সভ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন। পুরাতনের প্রতি বিরাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্বগৌরবের পুনরুদ্ধারে আমাদিগের আগ্রহও হ্রাস পাইতেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় সকলেই স্ব-প্রধান হইয়া উঠিতেছেন, পরাধীনতা-বশতঃ সমাজের জন্য স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি লোপ পাইতেছে। সমাজে যথেচ্ছাচার বাড়িতেছে। স্বাধীন জাতি জানে, দেশ রক্ষার ও সমাজ রক্ষার ভার তাহার নিজের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। সেই দায়িত্ব-জ্ঞানের বশবর্তী হইয়া সে প্রয়োজনকালে স্বার্থ-বিসর্জনে অগ্রসর হয়। পরাধীন জাতির দেশরক্ষার ভার পরের হস্তে থাকায়, সে বিষয়ের দায়িত্ব হইতে সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকে। দায়িত্বের অভাবে স্বার্থ-ত্যাগ-প্রবৃত্তির ক্রমশঃ লোপ ঘটে। আমাদিগের তাহাই হইয়াছে।* পরন্তু এদেশের পল্লী-সমাজগুলিকে বিনষ্ট করিয়া ইংরাজ আমাদিগের আত্মনির্ভর শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। ইহার উপর, ইংরাজের প্রবর্তিত একদেশীয়, অসম্পূর্ণ ও বিকৃত শিক্ষার ফলে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া আমরা কেবল পরসেবার যোগ্যতা লাভ করিতেছি। এইরূপ বুদ্ধি-বিপ্লবের ফলে আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড পর্যন্ত বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইংরাজের আরব্ধ তৃতীয় প্রকার সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া, আমরা প্রাচীন গৌরবে আস্থাহীন ও ভবিষ্যৎ উন্নতি-বিষয়ে আশা-হীন জীব বিশেষে পরিণত হইতেছি।

* In the earlier days, ……each member of the commune was bound by his own self-interest to subordinate his personal desires to the general interest of the community. In the new days (*i e.* under foreign rule) he began to assert his own private desires and interests *because he has nothing to gain by suppressing them.* The joint and united action of the community was no longer necessary for his protection from outside enemies, and he no longer felt himself dependent on the goodwill and sympathy of his neighbour, so he was less and less inclined to give in to them individually or as a body in any matter on which his private interests were opposed to theirs.—Mr. G. Adams c.s. in the *East and West.*

ইংরাজ বলিতেছেন, "আমরা তোমাদিগকে সুসভ্য করিতেছি।" আমরাও ভাবিয়াছি, আমরা ইংরাজের সাহচর্যে সভ্য হইতেছি। এই প্রহেলিকার মীমাংসা প্রসঙ্গে স্যার টমাস মনরো বলিয়াছেন,—

I do not exactly know what is meant by civilising the people of India. In the theory and practice of good government they may be deficient; but if a good system of agriculture, if unrivalled manufactures, if a capacity to produce what convenience and luxury demand, if the establishment of schools, in every village for reading and writing, if the general practice of kindness and hospitality, and above all, if a scrupulous respect and delicacy towards the female sex are amongst the points that denote a civilized people, then the Hindus are not inferior in civilization to the people of Europe.

ফলতঃ আমাদের সাহচর্যে ইংরাজ কোন্ বিষয়ে কতদূর সভ্য হইয়াছেন ও আমরা ইংরাজের সহবাসে কোন্ বিষয়ে কতদূর সভ্য হইয়াছি, তাহা মনরো মহোদয়ের বর্ণিত এই মানদণ্ডের সাহায্যে ধীরভাবে গণনা করিয়া দেখিলেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। মিঃ ব্রুক্স এডামসের যে উক্তি ১২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে অনুধাবন করিবার যোগ্য। স্বর্গীয় ভূদেববাবু যথার্থই বলিয়াছেন, "যদি ভারতবর্ষ আজি রাজনীতি সম্বন্ধে ইংরাজের দ্বারা পরিচালিত না হইত, তবে কি ভারতেরও সুশিক্ষিত সৈন্য, সুদৃঢ় পোত-বাহিনী এবং ইউরোপীয় বিষয়-বিদ্যায় সুবিদ্বান লোক সকলের অভাব থাকিত? কিছুরই অভাব থাকিত বলিয়া বোধ হয় না। কাজ অপরে করিয়া দিলে, কাজ করিবার সম্বল অপহরণ করিলে, কাজ করিতে পারি না বলিয়া অনুক্ষণ ভৎর্সনা ও অবজ্ঞা করিলে, কাজ করিবার উপক্রম করিবামাত্র মাথার উপর বসিয়া টিক্ টিক্ করিলে, কেহই কোনও কাজ করিতে পারে না। আজ হিন্দুরা সেই জন্যই শান্তশীল হইয়া আছেন; সাধনশীল হইয়া উঠিতেছেন না। হিন্দুর অপেক্ষা জাপানীদের কোনও গুণই অধিক নাই। তাহারা যেরূপ অবলীলাক্রমে ইউরোপীয়দের সমকক্ষতা করিতেছে, পরাধীন না থাকিলে হিন্দুরাও সেরূপ সমকক্ষতায় সমর্থ হইত, সন্দেহ নাই।" দুঃখের বিষয়, এই তত্ত্ব ইংরাজী শিক্ষার মোহে আমরা সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আপনাদিগকে পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষা স্বভাবতঃ হীন বলিয়া মনে করি।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের চর্চা পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বর্তমান উন্নতির মূল। তাই আমরা বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছি। কিন্তু আমরা এমনই মোহান্ধ যে,

ইংরাজী পুস্তকে বিজ্ঞান-বিস্তার আভাস পাইয়াই আত্মহারা হইয়াছি। তাই সকল বিষয়েই বৈজ্ঞানিকতা প্রকাশে আমাদের আগ্রহ বাড়িতেছে। আমাদের প্রাচীন সংস্কার-সমূহকে বিজ্ঞান-বিরোধী ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতেও আমরা অগ্রসর হইয়াছি। কিন্তু বিজ্ঞান-বিস্তার সহিত প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের অদ্যাপি যে আদৌ পরিচয় হয় নাই; তাহা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছি না। এ দেশে বিজ্ঞানবিদ্যা এখনও পুস্তকগতা রহিয়াছে, "উহার দ্বারা আমাদিগের বুদ্ধি বা চিত্তের কোনও সংস্কারই হয় নাই; দেশের উপভোগ্য শিল্পজাতও সংবর্ধিত বা স্বল্প-মূল্য হইয়া উঠে নাই।" অধিক কি, আমাদের ছাত্রেরা অদ্যাপি জাপানীদিগের ন্যায় শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকদিগকে বলিতে শিখে নাই—Please, Sir, we don't want to read American or European history any more. We want to read how balloons are made. দেড়শত বৎসরের ইংরাজ-সংসর্গ ও ইংরাজী শিক্ষার পরও আমাদের মধ্যে যে বিজ্ঞান-প্রীতির সঞ্চার হয় নাই, জাপানীদিগের মধ্যে ত্রিশ বৎসরে সেই বিজ্ঞান-প্রীতি অভূতপূর্ব বিকাশলাভ করিয়াছে। তাই জাপানী শিল্প-পণ্যে ভারতীয় বিপণী শ্রেণী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এদেশে ইংরাজের প্রবর্তিত শিক্ষা কিরূপ অন্তঃসারশূন্য, তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অথচ এই শূন্যগর্ভ শিক্ষার মোহে আমরা অভিভূত হইয়াই আত্মদৃষ্টি হারাইতেছি!

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মহোপকারক অংশ যাহাতে এদেশে প্রচারিত না হয় সে বিষয়ে রাজপুরুষদিগের যত্ন ও সতর্কতার ত্রুটি নাই। শ্রীযুক্ত টাটা মহাশয়ের অসীম-বদান্যতা-প্রসূত "রিসার্চ ইনষ্টিটিউট" নামক বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলতায় অদ্যাপি কার্যে পরিণত হইতেছে না। টাটা মহোদয় ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এদেশে প্রকৃত বিজ্ঞান-চর্চার সূত্রপাত করিতে চাহিতেছেন, মহীশূরের মহারাজ তাহাতে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই শুভানুষ্ঠানের সূচনা দর্শনে প্রীত নহেন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যে অংশে এদেশীয় সমাজে অকারণ বিপ্লবের সঞ্চার হইতে পারে, সেই অংশের প্রচার এদেশে বহুদিন হইতে করা হইয়াছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের মোহকর বিরোধ-প্রবণতা আমরা আয়ত্ত করিয়া বিবিধ সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছি। এই বিপ্লবের আবর্তনে পড়িয়া আমাদিগের কর্মশক্তি বহু পরিমাণে জড়ীভূত হইয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিশ্লেষণ-কার্যে বিশেষ পটু। জগতে ঐক্যের মধ্যে কোথায় অনৈক্য আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একটা প্রধান অঙ্গ।

পক্ষান্তরে অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান—এই বৈচিত্র্যময় জগতে, চর্ম চক্ষে প্রতীয়মান পার্থক্যের বিনাশ-পুরঃসর বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা না করিয়া, তাহার মধ্যস্থিত নিগূঢ় ঐক্য-সূত্র অধিকার-পূর্বক, ঋজুকুটিল নানা পথে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন হওয়াই প্রাচ্য প্রতিভার প্রকৃতি। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়ে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

"আমাদের দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে বহুকাল হইতেই নানা বিভিন্ন মত পরিপুষ্ট হইয়া মনটিকে এমনই করিয়া তুলিয়াছে যে, সকল বিরোধের মধ্যেই সেখানে নির্বিবাদে কেমন একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়া আসে। কর্মফলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াও আমাদের দেবভক্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। বিশ্ব সংসারকে মায়া এবং মোহ বলিয়া উড়াইয়া দিই, আবার সমস্ত বিশ্বে দেবতার আবির্ভাব দেখিয়া, তরুলতাগুল্ম হইতে সর্বলোকে মায়াতীত বিশ্বেশ্বরের মহতী মঙ্গল ইচ্ছার বিকাশ অনুভব করিয়া প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়ি; দেবতা এক এবং অদ্বিতীয় জানিয়া ইতর বস্তুর পূজা নিষ্ফল বলিয়া বুঝি, আবার প্রতি ক্ষুদ্র পাষাণখণ্ডের চরণে নৈবদ্য নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারি না; দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদকে সমানভাবে অন্তরে স্থান দিয়া থাকি; ব্রহ্মকে নির্গুণও বলি সগুণ জানিয়াও পূজা করি; যেখানে বিভিন্ন মতের মধ্যে স্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়, সেখানেও আমরা উভয়কেই অকাতরে আত্মসাৎ করিয়া লই। নানা মতের সংঘর্ষে আমাদের মনের, বোধ করি, নানা বিভিন্ন দিক হইতে দেখিবার শক্তি একটু বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখি বলিয়াই আমাদের মনে বিরোধ সহজেই ভঞ্জন হইয়া আসে।

"যে সমস্ত বড় বড় ধর্মতত্ত্ব ইংরাজ সংস্কারকেরা হালে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছেন—যেমন, জাতি উচ্ছেদ, মানবে মানবে সাম্য, ঈশ্বরের একমাত্রতা, এবং প্রতিমার অকিঞ্চিৎকরতা,—সে সকলই আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও নূতন কথা নহে। সামান্য কুটিরবাসী কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেও সেও বলিবে, ধর্মের নিকট জাতি নাই, সকলেই সেই একমাত্র প্রত্যক্ষের অগোচর পরমেশ্বরের সৃষ্টি, এবং সেই মহান্ পরমেশ্বর সর্বভূতে ও সর্বঘটে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তবে শিলাখণ্ডকে পূজা করিয়া ফল কি? পিতৃপিতামহাগত লোকাচারের উল্লেখ করিয়া সেও বলিবে, ইহার মধ্যেও ত পরমেশ্বর আছেন, এবং সেই সঙ্গে নিরাকারকে ধারণ করিবার সামর্থ্য অস্বীকার করিয়া বিনীতভাবে সর্বসমক্ষে আপনার অজ্ঞতা নিবেদন করিবে। কিন্তু নিজে শিলাখণ্ডের পূজা করে বলিয়া অপ্রতিম ব্রহ্মোপাসনার মহত্ত্ব অস্বীকার করিবে না।

"ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখিবার অভ্যাসে মনের এইরূপ প্রসার বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই এবং সৃষ্টির সর্বত্র নানা বিরোধের মধ্যে এক চিরন্তন নিগূঢ় অবিরোধ আবিষ্কার করিয়া চিত্র সমগ্র বহির্জগৎকে অন্তরে আয়ত্ত করিতে শিখে"—"সাধনা" পত্রিকায় ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "খণ্ডগিরি" শীর্ষক প্রবন্ধ।

বলেন্দ্রবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, "এই বিরোধ-গ্রাসিতাই হিন্দুধর্মের জীবন এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে এইটুকু ছিল বলিয়াই, বৌদ্ধধর্ম এখানে স্থায়ী হইতে পারিল না।* ব্রাহ্মণেরা আবার বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং বৌদ্ধ মূর্তি লইয়া যদি বা কোনও কালে গোলযোগ উঠিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাও মিটান হইয়াছে।"

মুসলমানদিগের সম্বন্ধেও এই কথা। হিন্দুধর্মের এই "বিরোধ-গ্রাসিতা" বা সামঞ্জস্য-সাধনী শক্তির জন্য ইস্‌লাম-ভক্ত মুসলমানও হিন্দুর চির-বিদ্বেষের পাত্র হন নাই।

"ছাপরা নগরবাসী কয়েকটি ব্রাহ্মণ তত্রত্য একটি সুপ্রসিদ্ধ মৌলবীর সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছেন,—মহাশয়, মৌলবী সাহেব মুসলমান হইলে কি হয়, উনি এমনি পবিত্রাচার ও পবিত্রমনা ব্যক্তি যে, আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি উঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করি, তাহাতে আমরা অপবিত্র হইলাম, এমন মনে করিতে পারি না।" বাস্তবিক মুসলমানদিগের মধ্যে এমনি উদারচেতা, পবিত্রকর্মা মহাশয় সকল আছেন বটে। আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে, প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা অত্যুন্নত আর্যমতবাদই গ্রহণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগেরই মধ্যে একজনের সহিত কথোপকথন কালে যখন শুনিলাম, "উওঃ ইয়ে হ্যায়," আমার বোধ হইল, যেন "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহাবাক্যটি কোনও প্রাচীন ঋষির মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

"যে জাতির মধ্যে আজিও এমন সকল লোক বিদ্যমান আছেন, সেই জাতি যে আপনার অভ্যুদয়-কালে নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারকারীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাহা

* নানা বিরোধের মধ্যে এক চিরন্তন ঐক্যের আবিষ্কারই অদ্বৈতবাদের প্রধান শিক্ষা। এ শিক্ষা ভক্তির প্রতিকূল নহে। এই উদার শিক্ষা ভারতে যত প্রচারিত হইবে, ততই আমাদের তুচ্ছ বিরোধে উপেক্ষা ও জাতীয় ভাবের পরিপুষ্টি ঘটিবে। খৃষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে একনাথ, রামদাস ও তুকারাম প্রভৃতির চেষ্টায় মহারাষ্ট্রদেশে অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হওয়ায় বর্ণভেদময় মহারাষ্ট্র সমাজে অসাধারণ একতা ও একাগ্রতার সঞ্চার হইয়া স্বাধীন মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই অদ্বৈতবাদের বলেই শক-যবন-হূণ-পহ্লবাদি বহিঃশত্রুর ও বৌদ্ধ চার্বাক নানক, কবীরপন্থী প্রভৃতি আন্তঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষে হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ইংরাজী শিক্ষার ফলে অদ্বৈতবাদের উদারতা আমরা এখন উপলব্ধি করিতো পারি না; খৃষ্টীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতির বিরোধ-প্রবণতা ক্রমে আমাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

কদাপি বিশ্বসনীয় নহে। মুসলমানদিগের ভারত রাজ্য-শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই ভারতবর্ষ একটি সর্ব-প্রদেশ-সাধারণ-প্রায় হিন্দী ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে, হর্ম্যশিল্প একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সুসংযত হইয়াছে এবং সৌজন্য-রীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থই মহা-ঋণগ্রস্ত। কোন কোন মুসলমান শাসনকর্তা প্রজাপীড়ন করিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু অনেকেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। আর যাঁহারা অন্যায়চারী ছিলেন, তাঁহাদিগেরও অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হয় নাই, দুই চারিটি ধনশালী ও পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল"—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত সামাজিক প্রবন্ধ।

"মুসলমান শাসন-প্রণালী কষ্টকর ছিল, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। যখন অল্প আয়ে এত অভাব হইত না, দেশের লোকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে রাজ সরকারে সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত প্রাপ্ত হইত, দেশের টাকা দেশেই থাকিত, একখানা বড় ছোরা রাখিতে হইলে 'পাশ' লইতে হইত না, এত লোক অনাহারে কষ্ট পাইত না, তখনকার অবস্থা যে বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় ছিল, এ কথা কেমন করিয়া বলিব ? হিন্দুরাজ্যে মুসলমান গুণীর আদর ছিল, মুসলমান রাজ্যে-হিন্দু গুণবানের উন্নতি হইত। এ সকল কথা আমরা ইংরাজের কল্পিত কথায় ভুলিতে পারি না।* ফলতঃ সত্য কথা বলিতে হইলে, বলিতে হয় পাশ্চাত্য সভ্যতা-দর্শনে আমরা ইউরোপের প্রতি বিশেষ ভক্তি-সম্পন্ন হইতে পারি নাই।"—হিতবাদী।

সুবিজ্ঞ ভূদেববাবুর ও হিতবাদী-সম্পাদকের এ সকল উক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভেদনীতির বলে যাঁহারা ভারত-শাসন করিতে চাহেন, তাঁহারা হিন্দু মুসলমানে বিরোধ-বর্ধনের জন্য মুসলমানদিগকে অত্যাচার-পরায়ণ ও অসভ্যরূপে ভারতীয় কোমল-হৃদয় ছাত্রদিগের সমক্ষে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই আমরা বাল্যকাল হইতে শিখিয়াছি, মুসলমানেরা এক হস্তে তীক্ষ্ণ কৃপাণ ও অপর হস্তে কোরাণ লইয়া কৃতান্তের বেশে নানা দেশ উৎসাদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক টমাস আরনল্ড সাহেব 'Preaching of Islam' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সমগ্র সভ্য জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম-বিষয়ে বক্তৃতার দ্বারা কেবল মুসলমান বণিকেরাই সমস্ত পৃথিবীতে ধর্মের প্রচার করিয়াছেন। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে কিরূপে শান্তভাবে

* ভারতের অনেক দেশীয় হিন্দুরাজ্যে মুসলমান মন্ত্রী ও মুসলমান রাজ্যে হিন্দু মন্ত্রীর অদ্যাপি নিয়োগ হইয়া থাকে। বিশাল নিজাম রাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একজন হিন্দু।

'ইসলাম' প্রচারিত হইয়াছে, প্রত্যেক প্রচারকের নাম ধাম লিখিয়া তিনি তাহা অতি বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। চীন সাম্রাজ্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক যে ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী হইয়াছেন, তাহা কি তরবারির বলে? চীনে কোনও সময়ে মুসলমানগণ দিগ্বিজয়িরূপে প্রবেশ করেন নাই, বা রাজত্ব করেন নাই। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্নিও এবং আফ্রিকায় আরব বণিকদিগের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের দ্বারাই ইস্‌লাম প্রচারিত হইয়াছে। খৃষ্টানদিগের মধ্যে ধর্ম-প্রচার একদল লোকের ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানগণ প্রত্যেকেই তাঁহাদিগের স্ব-ধর্মের প্রচারক; তাঁহাদের ধর্মে পুরোহিত প্রথা না থাকাতে সকল লোকেই বিশেষতঃ আরব বণিকগণ অবসরমত ধর্ম-বিষয়ে বক্তৃতার দ্বারা এবং সুদৃষ্টান্তের দ্বারা বহু দেশে ইসলাম ধর্ম বিস্তার করিয়াছেন।

আরনল্ড সাহেব বলেন, "যদিও মুসলমানেরা সময়ে সময়ে অত্যাচার করিয়াছেন, তথাপি সমস্ত মুসলমান জাতির ইতিহাস পাঠে সহজে অনুমিত হয় যে, মুসলমান রাজত্ব সময়ে ভিন্ন-ধর্মাবলম্বিগণ ধর্ম-বিষয়ে যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন, বর্তমানকালের ভারতবর্ষ ব্যতীত খৃষ্টান জগতে তাঁহারা কোন সময়ে কখনও সেরূপ ধর্ম বিষয়ক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারেন নাই।" কোরাণের ইংরাজী অনুবাদক ঘোর ইসলাম-বিদ্বেষী খৃষ্টান জজ সেল সাহেব কোরাণের উপক্রমণিকার ১১১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, They (Christians) have shewn a more violent spirit of intolerence than either of the former (the Jews and the Mahommedans)—অর্থাৎ খৃষ্টানগণ য়িহুদী কিংবা মুসলমানগণ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ধর্ম-বিষয়ে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছে। মহম্মদের এক হস্তে কোরাণ ও অন্য হস্তে কৃপাণ ধারণ-পূর্বক ধর্মপ্রচারের আদেশ-দানের কথা সম্পূর্ণ অলীক। ভেদনীতি-কুশল ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণের কল্যাণেই এইরূপ শোনা নানা অনৈতিহাসিক অমূলক সংস্কার দেশের লোকের, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষিত লোকের মনে স্থান পাইয়াছে।

ফলতঃ হিন্দু মুসলমানের প্রীতিবন্ধনে ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা বর্তমান সময়ে প্রধান অন্তরায়। নচেৎ ভারতবর্ষের সামাজিক প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে এখানে ধর্মের বা আচারের বিভিন্নতার জন্য তীব্র বিদ্বেষ অধিক দিন স্থায়ী হয় না। আহার-ব্যবহারে ঐক্য না থাকিয়াও লোকের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি রক্ষিত হওয়া এই দেশে চিরাভ্যস্ত ঘটনা। একটু অনুধাবন করিলে দৃষ্ট হইবে যে, দেশের প্রকৃতি-গুণে এখানকার মুসলমানদিগের মধ্যেও এই সামঞ্জস্য-সাধনী শক্তির পরিপুষ্টি ঘটিয়াছে। হিন্দু রমণীর পাণিগ্রহণ, হিন্দু জননীর স্তন্যপান ও হিন্দুদিগকে স্ব-সমাজে

আশ্রয়-দান করায় তাঁহাদিগের মধ্যেও হিন্দুর বিরোধ-গ্রাসিতা বিশেষভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে। এখন ভারতে—

"এমন প্রদেশ নাই, যেখানকার অধিকাংশ মুসলমান (হিন্দু) জ্যোতির্বিদ ও অপরাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কিছু সম্মান বা সমাদর না করেন—যেখানে গো-বধ করিতে এবং গোমাংস ভক্ষণ করিতে কিছু না কিছু সঙ্কুচিত না হন—যেখানে হিন্দুদিগের পর্বোৎসবে আমোদ-প্রমোদ না করেন—যেখানে আপনাদিগের বিবাহ কার্যে প্রতিবেশী হিন্দুদিগকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ না করেন। বাঙ্গালার ও দাক্ষিণাত্যের ত কথাই নাই। কারণ ঐ ঐ প্রদেশবাসী অতি উচ্চ-বংশীয় মুসলমানের মধ্যেও কেহ কেহ গোপনে প্রতিনিধি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা আপনাদিগের নামে সংকল্প করাইয়া দুর্গোৎসব এবং রথযাত্রার মহোৎসব করাইয়া থাকেন। অপর অনেকে অনুগত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা অর্থব্যয়ে ব্রাহ্মণ-সজনের অতিথি-সৎকার করেন।"—৺ভূদেব বাবুর "সামাজিক প্রবন্ধ।"

পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পুরাণ-পাঠ ও কথকতা শ্রবণ করিতে অনেক মুসলমান ভক্তি-পূত চিত্তে উপস্থিত হইয়া থাকেন, এ কথাও অনেকের বিদিত থাকিতে পারে। গত চৈত্র মাসেই দিনাজপুরে কোনও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের কথকতা শ্রবণ করিবার জন্য স্থানীয় বহু সংখ্যক মুসলমান যথানিয়মে প্রত্যহ সমাগত হইতেন, এ সংবাদ "হিতবাদী" পত্রের সাহায্যে অনেকের গোচর হইয়াছে। বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ দরাফ খাঁর গঙ্গাভক্তি-বিষয়ক আখ্যায়িকা বোধ হয় অনেকেই জানেন। পৈতৃকসম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধেও মুসলমানেরা বহু স্থলেই হিন্দু-ব্যবস্থারই অনুসরণ করিয়া থাকেন—তাঁহাদিগের কন্যাগণ ইসলাম শাস্ত্রের বিধানানুসারে পিতৃধনের অংশভাগিনী হইলে ভারতে সে বিধান প্রায়ই পালিত হয় না। হিন্দুগণ যে মুসলমানদিগের ধর্মোৎসবে অন্তরের সহিত যোগদান করিয়া থাকেন, মুসলমান দেবতার নিকট মানসিক করিয়া পূজা দিয়া থাকেন, ইহাও কাহারও অবিদিত নাই।

মুসলমানেরা ভারতীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন বিষয়েও যত্নের ত্রুটি করেন নাই। হিন্দী সাহিত্য কবীরের রচনায় কতদূর প্রভাবান্বিত, তাহা অনেকের বিদিত থাকিতে পারে। দক্ষিণাপথের মুসলমান কবি ও সিদ্ধ পুরুষেরা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় "যোগ-সংগ্রাম" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া মহারাষ্ট্র সাহিত্যের পরিপুষ্টি বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। গদ্য ইতিহাস রচনার আদর্শ, মহারাষ্ট্রীয়গণ মুসলমানের নিকট হইতে পাইয়াছেন। বঙ্গে আলওয়াল কবি, পরাগল খাঁ, হুসেন শাহ ও ছুটি খাঁ প্রভৃতি মনীষী মুসলমান গ্রন্থকারের নাম বাবু দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থের সাহায্যে অনেকের গোচর হইয়াছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামের

মুন্সী আবদুল করিম মহোদয় ঐ অঞ্চলের মুসলমান কবিদিগের যে তালিকা অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহাতে ৮৮ জন গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। এই প্রায় শত-সংখ্যক মুসলমান কবি বিবিধ কাব্য রচনা করিয়া এককালে বঙ্গীয় সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিশ জন কবি ষটচক্র-ভেদ, রাধাকৃষ্ণলীলা ও শ্যামাবিষয়ক কাব্য ও কবিতাদি রচনা করিয়াছেন। এক চট্টগ্রামেই যখন শত-সংখ্যক মুসলমান কবির দর্শন পাইলাম, তখন সমগ্র বঙ্গে কত শত মুসলমান বঙ্গ-বাণীর সেবায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম মহোদয়ের ন্যায় অনুসন্ধিৎসু সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা-বৃদ্ধি বিশেষভাবে প্রার্থনীয়।

ফল কথা, ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ অপেক্ষা মৈত্রীই সমধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হিন্দু-শিক্ষা এই মৈত্রীর বিশেষ অনুকূল। দুঃখের বিষয়, ইদানীং এদেশে কথকতাদির বিলোপের সহিত হিন্দু ধর্মের এই উদার শিক্ষার প্রচার হ্রাস পাইতেছে, পরন্তু ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা হিন্দু ছাত্রদিগের হৃদয়ে মুসলমান-বিদ্বেষ প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য যথোচিত যত্নপ্রকাশ করিতেছেন। দুঃখের বিষয়; কোনও কোনও অদূরদর্শী হিন্দু লেখক কাব্য-নাটকাদিতে অনর্থক মুসলমান ভ্রাতাদিগের নিন্দাবাদ করিয়া ইংরাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন। রাজপুরুষেরা কখন হিন্দুর প্রতি, কখনও বা মুসলমানের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া পরস্পরের চিত্তে বিদ্বেষ উৎপাদনে যত্নশীল রহিয়াছেন। যেখানে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ রাজপুরুষগণের প্রভাব অল্প সেখানে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি অদ্যাপি বিনষ্ট হয় নাই। তবে দুষ্ট লোকের উত্তেজনায় ইতর শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানে সময়ে সময়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া থাকে; কিন্তু এরূপ ঘটনা বিলাতেও প্রোটেস্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে বিরল নহে। তাহাতে যদি তাহাদের জাতীয় ভাবের ব্যাঘাত না ঘটে, আমাদেরই বা ঘটিবে কেন?

ইংরাজের সম্মোহন-কৌশলে যে কেবল হিন্দু মুসলমানে ভ্রাতৃভাব লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে তাহা নহে, তাঁহাদিগের স্বদেশের ও স্ব-সমাজের প্রতি সদ্ভাব ও অনুরাগও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। কূটনীতি-বিশারদ ইংরাজের সৃষ্ট কুহেলিকায় আমাদের—

"দেশের ইতিহাসেই আমাদিগের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ কাল হইতে লর্ড কর্জনের সাম্রাজ্য-গর্বোদ্গারকাল পর্যন্ত যে কিছু ইতিহাস-কথা, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা—তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। 'তাহা এমন স্থানে

কৃত্রিম আলোক ফেলে, যাহাতে আমাদের দেশের দিনটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়।"—বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) "ভারতবর্ষের ইতিহাস"-শীর্ষক প্রবন্ধ।

অপিচ, রবীন্দ্রবাবু উক্ত প্রবন্ধে আরও বলিয়াছেন,—

"ছেলেবেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে যে শিক্ষা পাই, তাহাতে প্রতিদিন দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া ক্রমে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ ভাব জন্মে। বাল্যকাল হইতে আমাদের জ্ঞান-প্রেম-কল্পনার দ্বারে গোরা সৈন্যের পাহারা বসে—আমাদের প্রকৃতির অন্তঃপুরের মধ্যে স্বদেশলক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পান না—বিদেশ হইতে আনীত যুক্তি, সংশয় প্রভৃতি কতকগুলো কিঙ্কর-কিঙ্করী সেখানে ভিড় করিয়া বেড়ায়; কিন্তু যিনি তাহাদের কর্ত্রী হইয়া তাহাদিগকে আপন কল্যাণের কাজে, ঐক্যের মহোৎসবে খাটাইতে পারিতেন, তিনি নাই। তাই আমাদের এমন লক্ষ্মীছাড়া দশা, তাই এই ভিক্ষাবৃত্তি, এই উচ্ছৃঙ্খলতা। তাই এমন বারংবার আড়ম্বরপূর্ণ অকৃতকার্যতা, বাক্যে ও কর্মে, শিক্ষায় ও ব্যবহারে তাই পদে পদে অসামঞ্জস্য। সেই মহালক্ষ্মী যিনি পিতার সহিত পুত্রকে, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতাকে, নিকটের সহিত দূরকে, অনাগতের সহিত অতীতকে, ভিতরের সহিত বাহিরকে অদৃশ্য ঐক্য-বন্ধনে চিরকাল গ্রথিত করিতেছেন, তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দাও। তিনি সমস্ত জ্যামিতি, বীজগণিত, ব্যাকরণ, ভূগোল ও অর্থ-পুস্তকের পর্বত-স্তূপ বিদীর্ণ করিয়া আমাদের হৃদয়ের অন্তঃপুরে তাহার চিরন্তন সিংহাসনে আসিয়া বসুন—সমস্ত শূন্য পূর্ণ হইবে, সমস্ত সংশয় দূর হইবে।

"কিন্তু আমাদের প্রকৃতির দ্বারের কাছে এই যে সকল জঞ্জাল জমিয়া আছে, যাহাতে বাহিরের আলো আমাদের বাহিরেই পড়িয়া থাকে এবং অন্তরের ধন আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহার মধ্য দিয়া পথ করিবে কে? প্রতিদিন প্রহসন ও পরিণামের বিভীষিকা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে কে।

"ভারতবর্ষের একখানি প্রকৃত ইতিহাস, এই হাস্যকর—এই শোকাবহ বিড়ম্বনা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার একমাত্র উপায়।"

এই ইতিহাস যেরূপে লিখিত হইবে, তৎসম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবু বলেন,—"বিদেশীয় বিচারের আদর্শ দূরে পরিহার করিয়া শ্রদ্ধার সাহায্যে পিতামহগণের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। এই শ্রদ্ধা না থাকিলে আমরা ভুল করিব। কারণ, যে সকল আধুনিক বিদেশী সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাদিগকে সংযত করিয়া না রাখিলে, তাহারা অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যাইতে পারে, জাতিভেদ। এই জাতিভেদের উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা থাকিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিকভাবে লেখা একেবারেই অসম্ভব হয়। * * * তাহা

ছাড়া ইউরোপের আদর্শকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ আদর্শ কল্পনা করিয়া, তাহারই দিকে দাঁড়াইয়া বিপর্যস্ত দূরবীক্ষণ দিয়া ভারতবর্ষকে অতি ক্ষুদ্র করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষকে দেখা হইবে না। * * * কেবল বিদেশী বাঁধি বুলির দ্বারা কখনও স্বদেশকে বুঝা যায় না * * *" ইত্যাদি।

ইংরাজের সম্মোহন-মূলক শিক্ষায় নানা বিষয়েই আমাদিগের বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম. এ. মহাশয় তাঁহার "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে লিখিয়াছিলেন,—

"আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়া স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পাইয়াছি বলিয়া ঘটা করিয়া বক্তৃতা করি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের সেই চিন্তা কি আমাদেরই চিন্তা? আমি রাজনীতির সম্পর্ক একেবারে বর্জন করিয়া নিতান্ত একাডেমিক অর্থে জিজ্ঞাসা করিতেছি—প্রবলের সাহায্যে যে দুর্বল মুগ্ধ, তাহার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? * * * আমরা বর্তমানকালে যে সর্বাঙ্গীণ শান্তি ও আরাম উপভোগ করিতেছি, সেই অবস্থা কি মনুষ্য সমাজের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পারে? * * * আমাদের বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের উদ্যমের নিষ্ফলতাই স্বাভাবিক। * * * বর্তমান কালকে যাঁহারা জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়কাল বলিয়া নির্দেশ করেন, আমি কখনই তাঁহাদের মতের অনুমোদন করিতে পারি নাই, শত শত বৎসরের অন্ধকারের পর যাঁহারা নূতন জ্যোতির আবির্ভাব দেখেন, তাঁহাদের নেত্রদ্বয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।"

ইংরাজ শিক্ষকেরা আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন, প্রাচ্যদেশের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান নরপতিগণ চিরকালই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, তাঁহাদিগের খেয়ালের জন্য প্রজাদিগকে নিরন্তর উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত। রাজার নিকট প্রজার মতামতের কোনও মূল্য ছিল না। প্রজার "স্বত্ব বা অধিকার" বলিয়া কোনও পদার্থ সেকালে ছিল না। পাশ্চাত্য রাজ্য-তন্ত্রে এসকল অসভ্যতা ছিল না।—অন্ততঃ ইদানীং নাই। সেখানে প্রজার মতামত ভিন্ন কোনও কার্য হয় না। আমরাও ইহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। সে কালের ইউরোপীয় রাজারা যে প্রজার পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক সমস্ত কার্যেই অন্যায়রূপে হস্তক্ষেপ করিতেন, বজ্রবন্ধনে তাঁহাদিগের দেহ ও মনকে বাঁধিতে চাহিতেন, ধর্মের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা রাজাই করিতেন, নীতির ও মুক্তির পন্থা দেখাইবার অধিকারও স্বহস্তে রাখিতেন, কোনও প্রজা এ সকলের বিরুদ্ধে উচ্চবাক্য করিলে তাহাকে তুষানলে দগ্ধ হইতে হইত, ডাকিনী বলিয়া সন্দেহ হইলে রাজাদেশে লক্ষ লক্ষ রমণীকে জল-সমাধি দান করা হইত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন কথা কোন মনীষী প্রচার

করিলে, তিনি রাজার আদেশে চিতানলে ভস্মীভূত হইতেন, রাজা লোকের স্বাধীন চিন্তায় বাধা দান করিতেন—এ সকল কথা ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠে পাঠ করিয়াও আমাদিগের ভ্রান্তি ঘুচিতেছে না। ইউরোপে রাজা প্রজার সনাতন দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তজ্জন্য মুহুর্মুহুঃ রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিয়াছে। "পুত্রবৎ পালয়েৎ প্রজাঃ" এ নীতিবাক্য পাশ্চাত্য দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল, এখনও রহিয়াছে। তাই রাজা-প্রজার বিবাদ সে দেশে অদ্যাপি থামে নাই, রাজ-শক্তিকে খর্ব করিবার জন্য প্রজা এখনও যত্নশীল। রাজা অত্যাচারী (Despotic) না হইলে এরূপ ঘটে না, নিহিলস্ট, সোশ্যালিস্ট, এনার্কিস্ট, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় না, একথা আমরা সহজে বুঝিতে চাহি না। ইংরাজী শিক্ষার মোহ এমনই প্রবল। প্রাচ্য ভূপতিরা এ সকল বর্বরতার অনুষ্ঠান কখনও করেন নাই, সকল বিষয়ে প্রজার এরূপ নিগ্রহ করিবার বাসনাও কখনও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। হিন্দু-মুসলমান শাসনে ভারতবাসী একালের ইউরোপীয় প্রজার অপেক্ষা অধিকতর স্বাতন্ত্র্য-সম্ভোগ করিয়াছে।* বঙ্কিমবাবু বলেন,—

"যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধি সঞ্চালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণবৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। (ইংরাজের আমলে আমাদের) জাতীয় গুণের স্ফূর্তি হইতেছে না।" বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ "স্বাধীনতা ও পরাধীনতা" প্রবন্ধ।

মুসলমান আমলেও এ "গুরুতর অত্যাচার" এদেশে ছিল না। তথাপি আমরা সেকালের হিন্দু মুসলমান নরপতিগণকে (despotic) বলিতে শিখিয়াছি। শব্দ শাস্ত্রের এরূপ অপব্যবহার অন্য কোনও দেশে দৃষ্ট হয় না।

ভারতবাসীর শাস্ত্রানুসারে রাজকর প্রজারক্ষণের বেতন ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু বৃটিশ ভারতে প্রজার প্রদত্ত ভূমিকরকে ইংরাজ ভূস্বামিত্ব সম্বন্ধে আপনার প্রাপ্য বলিয়া মনে করেন। ইংলণ্ডে যেমন প্রজার "খোরাকী মাত্র বাদে" ভূমির সমস্ত উৎপন্নই জমিদারের প্রাপ্য বলিয়া ধরা হয়, এখানেও ইংরাজ যেন কতকটা সেইরূপ করেন।

"স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগং"

এই ভারতীয় নীতি তাঁহারা বুঝেন না, যে বন কাটিয়া আবাদ করে, ভূমির স্বামিত্ব তাহারই—রাজা উহার রক্ষা করিবার জন্য বেতনস্বরূপ কর গ্রহণ করিবেন,

* এই কথাগুলি ১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "সাহিত্য" পত্রে 'পরাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। ঐ প্রবন্ধটি প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের পাঠ করা উচিত। সেই সঙ্গে ভূদেববাবুর "সামাজিক প্রবন্ধ" সকলের অবশ্য পঠনীয়।

এ তত্ত্ব ইংরাজ স্বীকার করেন না। কাজেই প্রজার জন্য তাঁহারা যাহা কিছু করেন, তাহারই জন্য নূতন নূতন কর আদায় করা হইয়া থাকে। এমন কি, রাজার অবশ্য-করণীয় ধর্মাধিকরণের—ন্যায় অন্যায় বিচারের কার্যেও স্বতন্ত্র কর স্থাপন করা হইয়াছে। যাঁহারা এইরূপ ভূমিতে প্রজার চিরন্তন স্বত্বলোপ ও বিবিধ করভারে প্রজাকে নিষ্পেষিত করেন, তাঁহারা সুসভ্য ও প্রজাবৎসল, আর যাঁহারা এরূপ করেন নাই, তাঁহারা অসভ্য ও despotic? শব্দশাস্ত্রের অপপ্রয়োগ আর কাহাকে বলে? ফলতঃ মধ্যযুগের পাশ্চাত্য নরপতিদিগের স্বাভাবিক বর্বরতা ও স্বৈরাচার ইংরাজেরা সুসভ্য হইয়া অদ্যাপি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ইংরাজের ভ্রান্ত শিক্ষায় আমরা ভারতীয় সমাজের জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, অবরোধ-প্রথার কঠোরতা ও ব্রাহ্মণাদি ২।১টি উচ্চ বর্ণের বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ নিষেধ প্রভৃতি প্রথা দেখিয়া এদেশবাসীর ভবিষ্যৎ উন্নতি বিষয়ে আশাহীন হইয়াছি, কিন্তু মাননীয় বিচারপতি চন্দাবরকর মহোদয় গত সামাজিক সমিতির অধিবেশনে বলিয়াছিলেন,—

It is a superficial view to take of the cause of the degeneracy of a community of people to say that it has gone down solely because it is divided into innumerable castes, it enforces infant marriage, it prohibits widow marriage and keeps women in seclusion.

উল্লিখিত বাক্যে যে সকল দোষের কথা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মদেশীয় সমাজে তাহার একটিও বিদ্যমান নাই। তথাপি ব্রহ্মবাসীর জাতীয় জীবন আমাদিগেরই ন্যায় নিষ্প্রভ। ভারতীয় মুসলমান সমাজে পরস্পরের অন্নগ্রহণ এবং বিধবার বিবাহাদি বিষয়ে কোনও বিধি নিষেধ না থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদিগের জাতীয় জীবনের অধঃপতন ঘটিয়াছে। ফলতঃ জ্ঞানচর্চায় অমনোযোগ, ভোগবিলাসে অতিরিক্ত আসক্তি ও রাজনীতিক সতর্কতার অভাব প্রভৃতি দোষে সকল সমাজেই জাতীয় জীবন হীনপ্রভ হইয়া থাকে, ভারতবর্ষেও প্রধানতঃ সেই সকল কারণেই জাতীয় জীবনের শক্তি-ক্ষয় ঘটিয়াছে। তাহার উপর সামাজিক কুসংস্কার সমূহ জাতীয় জীবনের শক্তিক্ষয়ে আংশিক সহায়তা করিয়াছে। সঙ্কর বিবাহের প্রবর্তনে যে এ সমাজের উৎকর্ষলাভ অসম্ভব, বরং তাহাতে এদেশীয় সমাজের অধোগতি, ফিরিঙ্গী ও আমেরিকার মিশ্র জাতির ন্যায় অবশ্যম্ভাবী, তাহা মহামনীষী সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক স্পেন্সার মহোদয়ের কথায় প্রতিপন্ন হয়। পণ্ডিতপ্রবরের এতদ্বিষয়ক পত্র অল্পদিন পূর্বে সমস্ত সংবাদ পত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে। এদেশবাসী হিন্দু মুসলমানের সামাজিক প্রকৃতি

হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; এই কারণে ইউরোপীয় সমাজকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সমাজ-সংস্কার প্রবৃত্ত হইলে এদেশবাসীর মঙ্গললাভের সম্ভাবনা অতি অল্প।*

আমরা যে পাশ্চাত্য নূতন সভ্যতার মোহে এরূপ অন্ধ, তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে কাউণ্ট টলস্টয় মহোদয়ের মত অনুধাবন করিবার যোগ্য। তিনি বলেন,—

---

* এই পত্রের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। জাপানী ব্যারন ক্যাণ্টারে কানেকো মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে স্পেন্সার মহোদয় ১৮৯২ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখের পত্রে বলিয়াছেন,—

"Respecting the further question you ask, let me, in the first place, answer generally that the Japanese policy should, I think, be that of "keeping Americans and Europeans as much as possible at arm's length." In presence of the more powerful races your position is one of chronic danger, and you should take every precaution to give as little foot-hold as possible to foreigners.

"It seems to me that the only forms of intercourse which you may with advantage permit are those which are indispensable for the exchange of commodities—importation and exportation of physical and mental products. *If you wish to see what is likely to happen study the history of India.* Once let one of the more powerful races gain a *point a' appui*, and there will inevitably in course of time grow up an aggressive policy which will lead to collision with the Japanese; these collisions will be represented as attacks by the Japanese which must be avenged, as the case may be, a portion of territory will be seized and required to be made over as a foreign settlement. and form this time there will grow eventually subjugation of the entire Japanese Empire.

ইহার পর জাপানী খনিসমূহে পাশ্চাত্যদিগকে নিযুক্ত করিতে ও উপকূল বাণিজ্য বিষয়ে তাহাদিগকে কোন প্রকার অধিকার দান করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া, তিনি বলেন,—

"To your remaining question, respecting the *inter-marriage of foreigners and Japanese* my reply is it *should be positively forbidden.* It is not at root a question of social philosophy. It is at root a question of biology. There is abundant proof, alike furnished by the *inter-marriage of human races* and by the interbreeding of animals, that when the varieties is mingled diverge beyond a certain slight degree, *the result is inevitably a bad one* in the long run.

"The physiological basis of this experience appears to be that any one variety of creatures *in course of many generations acquires a certain constitutional adaptation to its particular form of life* and every other variety similarly acquires its own special adaptation. The consequence in that, if you *mix the constitution* of two widely divergent varieties which have severally become adapted to widely divergent modes of life, *you get a constitution which is adapted to the mode of life of neither*—a constitution which will not work properly, because it is not fitted for any set condition whatever. *By all means, therefore peremptorily, interdict marriages of Japanese with foreigners.*"

Why should I place civilisation in Europe? Is it because the Europeans have created for themselves *artificial needs*, and because they have invented the railway, the telegraph, the telephone, and I do not know what beside? To me all these acquisitions of so-called civilisation seem the invention of barbarism. They serve and pander to all that is basest in man. I fail to see that they confer on him any sort of moral superiority, while I perceive that, on the other hand, the use he makes of his intelligence is most often for evil and not for good.

ইতঃপূর্বে The wonderful century ও Moral and Religious Crisis নামক গ্রন্থ হইতে ৫০।৫১ পৃষ্ঠে যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও এই মতের পরিপোষক। ফলতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার অকিঞ্চিৎকরতা এক্ষণে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই নব্য সভ্যতায় যেরূপ কুফল ফলিয়াছে, তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে একজন সহৃদয় ইংরাজ বলিয়াছেন,—

It is not more science, but more sympathy that is demanded of us by an ancient civilisation like that of Indian'......Wherever we have superseded, instead of *supervising*, native officials and headmen, wherever we have *poisoned* the social organism with English reforms, *instead of purifying* it by the light of the best native traditions, *there the seeds of demoralisation and disaster have been sown broadcast*. The wisest men in India are begining to recognise this fact.—A. K. Connel's *Paper on Indian pauperism, Free trade and Railways.* (1884)

রাজনীতিক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এই মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের পক্ষে স্বদেশপ্রীতিই একমাত্র মহৌষধ। পাশ্চাত্য সংস্রবে আমাদিগের সমাজ-শরীরে যে বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে জাতীয় ও নৈতিক অধঃপতনের বীজ সর্বত্র উপ্ত হইয়াছে, তাহার অনিষ্টকারিতা দূর করিবার পক্ষে স্বজাতিপ্রেমই একমাত্র উপায়।

"আমাদের জাতীয় জীবনের যে স্রোত এখন অল্প বেগে চলিয়াছে, সেই স্রোতে বেগ উৎপাদনের জন্য এইরূপ (দেশীয়) ভাবের উদ্দীপনা প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশ-বাৎসল্য সেই উদ্দীপনা প্রদানে সমর্থ। এবং এই স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশ-বাৎসল্য জন্মাইবার জন্য সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয় স্থাপন আবশ্যক। সমাজের কোথায় কি আছে, সমাজ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, কোথায় কয়খানা হাড় আছে, কোথায় কয়টা শিরা আছে, কোন্ খাতে রক্ত চলে, কোন্ স্নায়ু দিয়া চেষ্টা শক্তি পরিচালিত হয়, অনুরক্তভাবে সন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। কোথায় কোন্ ক্ষত আছে, কোথায় কোন্ ব্রণ আছে, তাহারও অনুসন্ধান চাই, কিন্তু বৃত্তিগ্রাহী মমত্ব-হীন সার্জনের অনুসন্ধানে চলিবে না, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত সকরুণ সপ্রেম অনুসন্ধান আবশ্যক। তাহার পর সেই সমাজ-শরীরের ভ্রূণাবস্থা হইতে শৈশব, শৈশব হইতে যৌবন, যৌবন হইতে প্রৌঢ় দশা, সমস্তেরই আনুপূর্বিক ধারাবাহিকভাবে তন্ন তন্ন করিয়া তত্ত্ব লইতে হইবে। সমাজের প্রাচীন ইতিহাস যথাসাধ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। তবেই সেই সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে, শ্রদ্ধা ভক্তিতে, ভক্তি প্রেমে ও প্রেম শেষ পর্যন্ত মহাভাবে পরিণত হইবে। সমাজের যাঁহারা নেতা, যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা চিন্তা-পটু, তাঁহারা সেই মহাভাবের উদ্বোধন করিবেন ও সেই মহাভাবকে শিরায় শিরায় সঞ্চালিত ও স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রবাহিত করিয়া দিবেন। এই মহাভাবের স্ফূর্তি লাভে সমাজ-শরীর কণ্টকিত হইবে, ধমনীতে রক্তপ্রবাহ বেগে ছুটিবে, হৃৎপিণ্ড মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত হইতে থাকিবে। নবজীবন সঞ্চারে হর্ষোদ্গত অশ্রু-প্রবাহে বন্যা আসিবে? সেই বন্যা-স্রোতে বিঘ্ন বিপত্তি কোন্ অকূলে ভাসিয়া যাইবে। ইহাই আমাদের সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা, ইহাই আমাদের সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার।"—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার।"

পরিশিষ্ট

কর্তৃপক্ষ মুদ্রাবিষয়ক বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় গবর্ণমেণ্টের কিয়ৎ পরিমাণে অর্থ-সাচ্ছল্য ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় কৃষি ও শিল্প-জীবীকে সে জন্য বৎসরে ২২ কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। সকলেই অবগত আছেন, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রৌপ্যের মূল্যের সহিত বিনিময়ের হার কমিয়া ১৩ পেন্সে এক টাকা হইয়াছিল। অতঃপর ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রৌপ্য মুদ্রার মূল্য ১৬ পেন্স স্থির করিয়া দেন।

এই অভিনব ব্যবস্থায় ভারত গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৫ কোটি টাকার ব্যয়-লাঘব হইল। হোমচার্জের জন্য তাঁহাদিগকে যে টাকা প্রতি বৎসর বিলাত পাঠাইতে হইত, তাহার পরিমাণ ৫ কোটি টাকা কমিয়া গেল। পূর্বে এদেশ হইতে এক টাকা পাঠাইলে বিলাতী কর্তৃপক্ষ ১৩ পেন্সের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেন, নূতন ব্যবস্থার পর

হইতে তাঁহারা এক টাকা পাইয়া ১৬ পেন্সের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন। এইরূপে ভারত গবর্ণমেণ্টের হোমচার্জের হিসাবে প্রতি বৎসর প্রায় ৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকিতেছে।

ইহার উপর বিগত ১৮৮৪ সাল হইতে নানা বিষয়ে প্রজার করবৃদ্ধি করিয়াও গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৮ কোটি টাকা আয় বাড়িয়াছে। অহিফেনের ব্যবসায়েও বিগত সাত বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্টের গড়ে বার্ষিক তিন কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সকল কারণে, রাজ্যের অতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও, রাজকোষে কয়েক বৎসর হইতে উপর্যুপরি ৫।৬ কোটি টাকা হিসাবে উদ্বৃত্ত হইতেছে। লর্ড কর্জনের পাঁচ বৎসরের শাসন কালেই সর্বশুদ্ধ ২১ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ইহাতে রাজস্ব-সচিব ও আমাদের বড়লাট কর্জন বাহাদুর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতেছেন, "ভারতবাসীর যে দিন দিন ধনবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা তাহারই নিদর্শন। প্রজার অবস্থা সচ্ছল না হইলে রাজকোষে সচ্ছলতা আসিল কোথা হইতে? ইংরাজের শাসনে ভারতবর্ষ দিন দিন দরিদ্র হইতেছে,—এ উপন্যাস নিতান্তই ভিত্তিহীন। প্রত্যুত বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষ ক্রমেই ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।"

বিগত ৩০শে মার্চ লর্ড কর্জন ভারতবাসীর এইরূপ সমৃদ্ধি-সঙ্গীতে দিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গীত মরীচিকার ন্যায় মোহপূর্ণ হইলেও নিতান্ত অন্তঃসার-শূন্য। তাই আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গীতের মোহ-ভঙ্গ করিতে হইল।

পাঠক অবগত আছেন, প্রতি বৎসর এদেশ হইতে প্রায় ১৪০ কোটি টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এই পণ্যের মধ্যে কৃষিজ পণ্যই অধিক; সুতরাং বহির্বাণিজ্যের ক্ষতি বৃদ্ধির সহিত আমাদিগের দেশের কৃষকদিগের শুভাশুভের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এখন বিনিময়ের হার ১৬ পেন্স নির্দিষ্ট হওয়ায় তাহাদিগের কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, দেখুন। মনে করুন, পূর্বে ১৩ পেন্স মূল্যে বিদেশে আমাদের যে মাল বিক্রীত হইত, এখনও ১৩ পেন্স নির্দিষ্ট মূল্যেই সেই মাল বিক্রীত হইতেছে। কিন্তু তখন ১৩ পেন্সের বিনিময়ে ভারতীয় কৃষক ১ টাকা পাইত, কিন্তু এখন ৮১ পয়সা মাত্র পাইতেছে। এইরূপ প্রতি টাকায় ১৯ পয়সা ক্ষতি হওয়ায় গড়ে বৎসরে আমাদের ২২ কোটি টাকা ক্ষতি হইতেছে।

বিদেশে অহিফেন বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্টের যে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে ভারতবাসী আন্তরিক আনন্দ লাভ করিয়াছে। কিন্তু কর-বৃদ্ধি করিয়া রাজকোষের আয় বাড়াইলে রাজপুরুষেরা কখনই প্রজার কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতে পারেন

না। বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট করায় হোমচার্জের পরিমাণ কার্যক্ষেত্রে পাঁচ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে, ইহাও আমাদিগের হোমচার্জের পরিমাণ হ্রাস হইত, তাহা হইলে আমরা আনন্দানুভব করিতে পারিতাম। কিন্তু হোমচার্জের ৫ কোটি টাকা কমাইতে গিয়া আমাদিগের ২২ কোটি টাকায় ঘা পড়িয়াছে।

রৌপ্যর মূল্য হ্রাসের সহিত বিনিময়ের হার যেরূপ কমিতেছিল, যদি সেইরূপ কমিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে হয়ত এতদিনে টাকার দর ১১ পেন্স দাঁড়াইত। তাহা হইলে আমরা ১৩ পেন্সের জিনিস দিয়া প্রায় উনিশ আনা পাইতাম। পক্ষান্তরে ১৩ পেন্স মূল্যের বিলাতী জিনিস ১ টাকা ১৯ পয়সা দিয়া কিনিতে হইত বলিয়া সস্তা দেশীয় মালের কাটৃতি বাড়িত। রৌপ্যর মূল্য হ্রাসের সহিত বিনিময়ের হার যতই কমিত, বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য ততই বাড়িত, দেশীয় শিল্পীগণ প্রতিযোগিতা করিবার ততই সুবিধা পাইতেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উচ্চহারে বিনিময়ের দর নির্দিষ্ট ও স্থায়ী করিয়া দেওয়ায় এই সুবিধা হইতে দেশীয় কৃষি ও শিল্পজীবীরা বঞ্চিত হইল। পরন্তু তাহাদিগের প্রভূত ক্ষতি ঘটিল। শুদ্ধ বহির্বাণিজ্যেই তাহাদিগের ২২ কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিদেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পীর যে অশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কে নির্দেশ করিবে। ফলতঃ মুদ্রার কৃত্রিম মূল্য নির্দেশ কোনওক্রমেই প্রকৃষ্ট অর্থ-নীতির অনুমোদিত নহে।

রাজপুরুষেরা বলেন, মুদ্রা-শাসনী ব্যবস্থার দ্বারা মুদ্রার মূল্য নির্ধারিত করায় কৃষিজীবী প্রজার যে ক্ষতির সম্ভাবনা হইয়াছিল, বিদেশের বাজারে তাহাদের পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় তাহা তিরোহিত হইয়াছে। পরন্তু তাহারা এক্ষণে পূর্বের অপেক্ষা অধিক মূল্য লাভ করিতেছে; সুতরাং অনুযোগের কোনও কারণ নাই। আমরা এ যুক্তি নিতান্তই অসার বলিয়া মনে করি। কৃষিজীবীদিগের ভাগ্যক্রমে যদি বিদেশের বাজারে তাহাদের মালের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিবার সুবিধা পাইবে, এরূপ ব্যবস্থা থাকাই উচিত ছিল। বিনিময়ের হার ১৬ পেন্স নির্দিষ্ট না করিলে এদেশের কৃষকদিগের যে আরও অধিক লাভ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া তাহাদের লভ্যাংশের কিয়দংশ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন, একথা কি অস্বীকার করা যায়? সকল দেশের কৃষিজীবীই শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সুবিধা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতেছে, কেবল ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের ভাগ্যেই তাহায় সম্পূর্ণ ফলভোগ ঘটিতেছে না। ইহা কি গভীর পরিতাপের বিষয় নহে? সেইরূপ ৬২ পয়সা মূল্যের রৌপ্যখণ্ড দিয়া প্রজার নিকট হইতে ১ টাকা আদায় করাও

কি নীতি-সঙ্গত কার্য ? বাজারে রৌপ্যের মূল্য হ্রাস হইয়াছে, অথচ আইনের মাহাত্ম্যে প্রজাপুঞ্জ তাহার সুফল ভোগ করিতে পাইতেছে না, ইহা কিরূপ প্রজা-বাৎসল্য, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

লর্ড কর্জন বলিয়াছেন, এই বিনিময় বিধানের জন্য গবর্ণমেণ্ট লাভের পৌনে দশ কোটি টাকা বিলাতে খাটাইবার সুবিধা পাইতেছেন। ইহাতে রাজকোষে বার্ষিক ২৯ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা আয় বাড়িয়াছে। বড়লাট বাহাদুরের এই উক্তিতে আমরা প্রীতিলাভ করিতে পারি নাই। দেশের লোকের বার্ষিক ২২ কোটি টাকা ক্ষতি করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে টাকা পাইয়াছেন, তাহা বিলাতে সুদে খাটান হইতেছে, অথচ এদেশের কৃষকেরা উচ্চ হারে সুদ দিয়াও টাকা ধার পায় না, এ দৃশ্য কি প্রীতিকর ?

গবর্ণমেণ্ট বিনিময়ের কৃত্রিম হার নির্দিষ্ট করিয়া দেশীয় রৌপ্য মুদ্রার মূল্য কমাইয়া ভারতীয় পণ্য উৎপাদনকারী কৃষি-শিল্পী-সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। এই অনিষ্টের আংশিক প্রতিবিধান-কল্পে টাকশাল বন্ধ করা হইয়াছে। ফলে প্রতি বৎসরই প্রয়োজনের অপেক্ষা অল্প সংখ্যক টাকা মুদ্রিত হইতেছে। রৌপ্য সস্তা হওয়ায়, দেশে টাকা সুলভ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাজপুরুষেরা বিদেশে দেশীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়াছেন--১৩ পেন্সের বিনিময়ে এক টাকার স্থলে ৮১ পয়সা পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং দেশে টাকশাল বন্ধ করিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের নিত্য ব্যবহার্য মুদ্রা দুর্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া তুলিয়াছেন। বাজারে প্রয়োজন মত টাকা না থাকায় ব্যবসায়ীদিগকে উচ্চ হারে সুদ দিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হইতেছে, যে সুবর্ণের বিনিময়ে পূর্বে ২২ টাকা পাওয়া যাইত, সেই সুবর্ণের পরিবর্তে এখন ১৫ টাকার অধিক পাওয়া যাইতেছে না। সভারিণ মুদ্রার পূর্বের মূল্যের সহিত বর্তমান মূল্যের তুলনা করিলেই পাঠক ইহা বুঝিতে পারিবেন।

কর্তৃপক্ষের অবলম্বিত কৃত্রিম উপায়ে দেশীয় টাকার বাজারে এরূপ দ্বিবিধ বিপ্লব ঘটায় ভারতীয় পণ্যোৎপাদক-সম্প্রদায়ের বার্ষিক ২২ কোটি টাকার ক্ষতি হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ক্ষতির বিষয় এদেশে কৃষক-সমাজের সম্পূর্ণ গোচর হয় নাই। কিন্তু শিল্পী-সমাজ এই ক্ষতির পরিণাম বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছে। বঙ্গীয় কয়লার ব্যবসায়ীদিগের কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা মাননীয় মিঃ কেবল সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাট বাহাদুরের সমক্ষেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন।—

The trade in coal at the present moment presents a very curious spectacle. On the one hand collieries in Bengal are with few exceptions being worked on the barest margin or being closed altogether, while on the other hand coal from abroad is being delivered almost at our doors.

অর্থাৎ বঙ্গের অধিকাংশ কয়লার খনি, হয় একরূপ বিনা লাভে চলিতেছে, না হয় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে বিলাতী বা বিদেশী কয়লা অতি সস্তা দরে একেবারে আমাদিগের গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

কর্তৃপক্ষ যদি মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা এক সভারিণ মূল্যের কয়লা এ দেশে ২২ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু স্বজাতি-বৎসল রাজার অনুগ্রহে তাহারা ঐ কয়লা এক্ষণে ১৫ টাকায় বিক্রয় করিতেছে। কাজেই দেশীয় কয়লার খনিওয়ালারা প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছেন তাঁহাদের প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইবার অন্যান্য কারণও আছে। কিন্তু যদি টাকশাল বন্ধ না হইত, তাহা হইলে সভারিণের (সুবর্ণের) বিনিময়ে এখানকার অপেক্ষা নিশ্চিত অধিক টাকা পাওয়া যাইত। বঙ্গীয় কয়লা ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের পণ্যের অধিকতর মূল্য পাইতেন।

অন্যান্য ব্যবসায়েরও দুর্গতি অল্প হয় নাই। প্রথমতঃ কার্পাস ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ১৮৯৮ সালে বোম্বাইতে ৮২টি কাপড়ের কল ছিল। এক্ষণে কমিয়া ৮০টি হইয়াছে। ঐ অব্দে সমগ্র ভারতে ১৮৫টি কাপড়ের কল ছিল, ১৯০০ সালে বাড়িয়া ১৯৩টি হয়। কিন্তু ১৯০৩ সালে কমিয়া ১৯২টি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি কলের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা হীন হইয়াছে। কল কারখানা করিবার দিকে লোকের প্রবৃত্তি বাড়িয়াছে, কিন্তু কলের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা হীনতর হইয়াছে। রাজশক্তির প্রতিকূলতায় ব্যবসায় বাণিজ্যে লোকের লাভ কমিতেছে, কৃত্রিম মুদ্রার জন্য ও টাকশাল বন্ধ হওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে। নীলের অবস্থাও এইরূপেই শোচনীয় হইয়াছে। স্যার এডোয়ার্ড ল বলিতেছেন, "তোমরা সুলভ পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা কর, সস্তায় মাল বেচিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই তোমাদিগের লাভ হইবে।" ব্যবসায়ীদের এ কথা অপরিজ্ঞাত নহে। তাহাদিগকে ব্যবসায়ের এই মূল তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্যার এডোয়ার্ড ল মহোদয়ের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না। তিনি টাকশালে পূর্বের ন্যায় অবাধে

টাকা তৈয়ার করিবার অনুমতি দান করুন, দেশীয় ব্যবসায়সমূহ বিনা আয়াসে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে—দেশীয় ব্যবসায়ীরা যেখানে এখন ৮১ পয়সা পাইতেছে, সেখানে ১ টাকা পাইবে, যেখানে ১৫ টাকা পাইতেছে, সেখানে সহজেই ২২ টাকা পাইবে। মিঃ জে. এন. টাটা মহাশয় দেখাইয়াছেন, ১৮৯৫ সালের তুলনায় "স্টকের কারবারে" ব্যবসায়ীদিগের এক্ষণে শতকরা প্রায় ৫০ টাকা ক্ষতি হইতেছে।

কর্তৃপক্ষ বলেন, বিলাতের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্‌গণের উপদেশ অনুসারেই মুদ্রার কৃত্রিম মূল্য অবধারিত হইয়াছে। এই কারণে তাঁহাদিগের ন্যায় বিজ্ঞ মহোদয়গণের ভ্রম প্রদর্শনে অগ্রসর হওয়া আমাদিগের শোভা পায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিলাতের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্‌গণ কি স্বেচ্ছায় ও সহজে এই ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছিলেন? লর্ড ল্যান্সডাউনের আমলে ভারত গবর্ণমেণ্ট কি মুদ্রা-সমিতির সদস্যদিগকে জ্ঞাপন করেন নাই যে, মুদ্রার কৃত্রিম মূল্য নির্দেশ না করিলে ভারত গবর্ণমেণ্টকে "দেউলিয়া" হইতে হইবে? ভয় প্রদর্শনের পর যদি সমিতির সদস্যেরা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেজন্য আমরা তাঁহাদিগকে দায়ী করিতে পারি না। গবর্ণমেণ্টের আগ্রহাধিক্য ও অলীক আতঙ্কই এই অসীম ক্ষতিকর মুদ্রাশাসন ব্যবস্থার মূলীভূত কারণ।

এই তর্কের উত্তরে অর্থসচিব স্যার এডওয়ার্ড ল মহোদয় বলেন, বহির্বাণিজ্যের প্রসার ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই, বরং নানা দিকে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৯৫ সালে পাটের ব্যবসায়ের যে অবস্থা ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা দ্বিগুণ উন্নতি হইয়াছে। পূর্বে ১০ হাজার পাটের তাঁত দেশে চলিত, এক্ষণে ২০ হাজার তাঁত চলিতেছে। ১৯০০ হইতে ১৯০২ সাল পর্যন্ত তিন বৎসরে আমদানি অপেক্ষা ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি ৭২ কোটি টাকার বাড়িয়াছে। সুতরাং কৃত্রিম মুদ্রার জন্য ব্যবসায়ের অবনতি হইতেছে, একথা যথার্থ নহে।

অর্থসচিব মহোদয়ের এই উত্তরে আমরা সন্তুষ্ট নহি। এক ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর কুত্রাপি পাটের তেমন চাষ হয় না। অথচ পাশ্চাত্য দেশে সর্বত্র পাটের আদর দিন দিন বাড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় এ দেশে পাটের ব্যবসায়ের উন্নতি অনিবার্য বলিয়া আমরা মনে করি তাহার পর রপ্তানি বৃদ্ধির কথা। অর্থসচিব তিন বৎসরে ৭২ কোটি টাকার অধিক মাল রপ্তানি হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তিনি যদি একবার অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশের বাণিজ্যবিস্তারের অনুপাতের বিষয় স্মরণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, এইরূপ আনন্দ প্রকাশে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইত। পাঠক, একবার আমেরিকার বাণিজ্যবৃদ্ধির অনুপাতে দৃষ্টিপাত করুন, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ১৮৯৭

সালে আমেরিকার রপ্তানি পণ্যের মূল্য আমদানি অপেক্ষা ৩৩,৯০,০০,০০০ টাকা অধিক ছিল। ১৯০০ সালে রপ্তানির মূল্য ১১৭,০০,০০,০০০ টাকা ও ১৯০১ সালে ২০৩,৭০,০০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অঙ্কের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের অঙ্কের তুলনা করাই বাহুল্য। (হিতবাদী ১১০৩ সালের এপ্রিল হইতে উদ্ধৃত।)

কল কারখানার অবনতি।

(From Statistical Abstract of British India)

পশমের কল	১৮৯৬ খৃঃ	৬	১৯০১ খৃঃ		৪
ময়দার কল	১৮৯৮ "	১০৩	"	"	৩২
লাক্ষার কারখানা	১৮৯৯ "	১৫৩	"	"	৫৩
তুলার গাঁইটের কল	১৯০০ "	৮১৩	"	"	?
তেলের কল	" "	২১২	"	"	৮৪
পাটের প্রেস	" "	১৬৮	"	"	১৩২
চিনির কারখানা	" "	২০৩	"	"	২৬
রেশমের কারখানা	" "	৬৬	"	"	৭১
লৌহ-পিত্তলের কারখানা	" "	১২৪	"	"	৭০
চর্ম পরিষ্করণ	" "	২০২	"	"	২৬

১৯০২।৩ সালের তালিকা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

১৯০১ সালের আদম-সুমারি।

জন-সংখ্যার তুলনা।

	১৮৯১ সালের গণনায়	১৯০১ সালের গণনায়
বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা	৭,১৩,৪৬,৯৬১	৭,৪৭,৪৪,৮৬৬
আসাম	অসম্পূর্ণ	৬১,২৬,৩৪৩
বেরার	২৮,৯৭,৪৯১	২৭,৫৪,০১৬
বোম্বাই	১,৮৮,৭৮,৩১৪	১,৮৫,৫৯,৫৬১
মধ্যপ্রদেশ	১,০৭,৮৪,২৯৪	৯৮,৭৬,৬৪৬
মান্দ্রাজ	৩,৫৬,৩০,৪৪০	৩,৮২,০৯,৪৩৬
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮,৫৭,৫০৪	২১,২৫,৪৮০

পঞ্জাব	২,০৮,৬৬,৮৪৭	২,০৩,৩০,৩৩৯
আগ্রা	৩,৪২,৫৩,৯৬০	৩,৪৮,৫৮,৭০৫
অযোধ্যা	১,২৬,৫০,৮৩১	১,২৮,৩৩,০৭৭

বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক সংখ্যা অধিক। খাস-বাঙ্গালা, আসাম, ব্রহ্মদেশ, কুর্গ, বেলুচিস্থান, পঞ্জাব, আজমীর, রাজপুতানা ও কাশ্মীরে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয়। কাশ্মীরে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের ৯ গুণ। ইউরোপে সর্বত্র পুরুষের সংখ্যা অল্প।

	মোট জনসংখ্যা	পল্লিগ্রাম-নিবাসী
বৃটিশ ভারতে	২৩,১৮,৯১,৫০৭	২০,৯৭,৭৫,১৪৭
তন্মধ্যে বেলুচিস্থান	৩,০৮,২৪৬	২,৬৮,২১৩
" ব্রহ্মদেশ	১,০৪,৯০,৬২৪	৯৫,০০,৬৮৬
	সহরের সংখ্যা	পল্লী-সংখ্যা
সমগ্র ভারতে	১,৪৫৩	৫,৫১,১৫১
বেলুচিস্থানে	৬	১,২৪৭
ব্রহ্মদেশে	৫২	৬১,৫১৮
বঙ্গদেশে	১৮২	২,০৩,৪৭৬
বোম্বাই	২০২	২৫,৬৯৯
মান্দ্রাজ	২৩৪	৫৪,৬১৫

বৃটিশ ভারতে বালক ও যুবকের সংখ্যা

৫ বর্ষ হইতে ১০ বর্ষ	১,৬৫,৯৫,৫৯৮	সমগ্র ভারতে
১০ " " ১৫	১,৪৭,১৬,৭৮১	১,৮৮,৮০,৬৫৮
১৫ " " ২০	৯৯,৯৮,২৬৪	১,২৯,৪২,৩২২
২০ " " ২৫*	৯১,৪৮,২৫৩	১,১৭,৫৭,৬৪৩
২৫ " " ৩০	১,০২,৮৪,৮০৯	১,৩১,৩৩,৪৩৭

* এই বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী।

সমগ্র ভারতে বিকলাঙ্গ লোকের সংখ্যা।

	পুরুষ	স্ত্রীলোক
পাগল	৪১,৩১৭	২৪,৮৮৮
কালা বোবা	৯২,৬৫৫	৬০,৫১৩

অন্ধ	১,৮০,৭৬২	১,৭৩,৩৪২
কুষ্ঠ রোগী	৭২,৪০৩	২৪,৯৩৭
পঞ্চাশোর্ধ অন্ধ	৭৩,৫০০	৮৮,০০০

মহাভারতে মহর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"অন্ধ, মূক পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধু-বিহীন, প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে পিতার ন্যায় পালন করেন ত ?"

সমগ্র ভারতে ভাষা অনুসারে জনসংখ্যা।

বঙ্গভাষা	৪,৪৬,২৪,০৪৮	রাজস্থানী	১,০৯, ৭,৭১২
পশ্চিম হিন্দী	৩,৯৩,৬৭,৭৭৯	কর্ণাটকী	১,০৩,৬৫,০৪৭
পূর্ব হিন্দী	২,০৯,৮৬,৩৫৮	গুজরাটী	৯২,৮৫,১০৯
বেহারী	৩,৭০,৭৬,৯৯০	উড়িয়া	৯৬,৮৭,৪২৯
অন্ধ্র	২,০৬,৯৬,৮৭২	মালয়	৬০,২৯,৩০৪
মারাঠী	১,৮২,৩৭,৮৯৯	সিন্ধি	৩০,০৬,৩৯৫
পঞ্জাবী	১,৬০,৭০,৯৬১	সাঁওতালী	১৭,৯০,৫২১
তামিল	১,৭৫,২৫,৫০০	আসামী	১৩,৫০,০২৯

দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা।

ইংরাজ শাসিত প্রদেশে		করদ রাজ্যে	
সমগ্র বৃটিশ ভারতে	১৬,৭৫,২৮৮	একুনে	৯,৮০,২০৫
বঙ্গদেশ	২,২৪,৭১০	বঙ্গদেশ	৩,০৫৩
আসাম	৩৩,৫৯৫	......	......
বোম্বাই	১,৭১,২১৩	বোম্বাই	১০,১০৫
মধ্যভারত	১৭,৭৯১	মধ্যভারত	৩,৭১৫
মান্দ্রাজ	৯,৮৩,৮৮৮	মান্দ্রাজ	৯,০৬,৭৮৯
যুক্তপ্রদেশ	৬৮,৮৪১	রাজপুতনা	১,৩৬৮
উত্তর পশ্চিম	৫৩৩	মহীশূর	৩৯,৫৮৫
পঞ্জাব	৩৭,৬৯৫	হায়দ্রাবাদ	১৫,৩৫৭
ব্রহ্মদেশ	১,২৯,১৯১	বরোদা	৭,৫৪৩
অন্যান্য প্রদেশ	৭,৮৩০	অন্যান্য প্রদেশ	১,৫১০

সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে য়ুরোপীয়ের সংখ্যা।	১,৬৯,৬৭৭
" " " ইউরেসিয়ন বা ফিরিঙ্গী	৮৯,২৫১

দেশীয় খৃষ্টানদিগের মধ্যে কোল, ভীল, সাঁওতাল, গোণ্ড, খসিয়া প্রভৃতি অনার্য, পার্বত্য অসভ্য জাতির সংখ্যা অল্প নহে।

বিলাতে খৃষ্টানেরা ২.২৭টি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

Those who are acquainted with the very numerous religious sects that exist in England and America, will not be disposed to be surprised at the length of the list given under the religion *Hindu*. Census Report (Bom. Pt. I.)

বৃটিশ ভারতে অপরাধীর সংখ্যা।

	পশু চুরি	সাধারণ চুরি
১৮৯৭ সালে	১৪,৪২৬	৭০,৫৮১
১৮৯৮ "	৮,৮৭৭	৪৩,১৫১
১৮৯৯ "	৮,০৬২	৪১,৫২৩
১৯০০ "	১৫,০০১	৫৯,৪৫৯
১৯০১ "	৯,৩০৭	৪৫,৫৬৬
	সিঁদ কাটিয়া চুরি	**বেত্রাঘাতের দণ্ড**
১৮৯৭ "	৩৪,১১৫	৬৪,০৮৭
১৮৯৮ "	১৭,০৫৪	২৫,৫৬৪
১৮৯৯ "	১৯,৪২২	২৮,৩১৭
১৯০০ "	২৫,০০২	৪৫,০৫৪
১৯০১ "	২৩,১৪৩	২৫,০৫৪

বৃটিশ ভারতে মৃত্যু-সংখ্যা।

১৮৮০ সালে	৩৭,২৮,৩৩১ জন
১৯০১ সালে	৬৫,৯৬,৩৭৭ "
১৯০২ "	৭১,২১,৬৩৬ "

বন্য জন্তুর আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা
(১৮৯২ সাল হইতে ১৯০১ সালের মধ্যে)

	সর্প দংশনে	হিংস্র পশুর আক্রমণে
মনুষ্য	২,১৭,৫৬০	৩২,৬৯২
গো মহিষাদি পশু	৬৩,৩২৮	৮৮৮,২২১

মদের দোকান।

১৮৯৪।৫ সালে	৮০,৫২১
১৯০১।২ "	৮৪,৯২৫

দেশীয় রাজ্যে উত্তমর্ণ

ভারতের সেন্সাস্ কমিশনার মিঃ বেন্স বলেন,—

It is a very curious feature in the Census returns that the proportion of money-lenders who combine that occupation with the possession of land is far greater in British territory, than in the Native State.

অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতে দেশীয় রাজ্য অপেক্ষা বৃটিশ শাসিত ভারতে কুশীদজীবী উত্তমর্ণদিগের সংখ্যা অনেক অধিক।

শিক্ষা-বিষয়ক তালিকা

গবর্নমেন্ট ও জনসাধারণের চেষ্টার ফলে এতদিনে ভারতবর্ষে ১৯১টি কলেজ, ৫,৪৯৩টি স্কুল ও ৯৭,৫৩৮টি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিল্প বিদ্যালয়, নর্মাল স্কুল প্রভৃতি সমেত এক্ষণে এদেশে সর্বশুদ্ধ ১,০৫,৩০৬টি বিদ্যালয় চলিতেছে, ছাত্রের সংখ্যাও ৩৮,৮৫,৪৯৩ জন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে সকল বিদ্যালয়ে গবর্নমেন্টের নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে শিক্ষা প্রদত্ত হয় না, এরূপ বিদ্যালয়ের ছাত্রসমেত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ। এই সকল বিদ্যালয়ের পরিচালনার্থ বৎসরে প্রায় চারি কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। তন্মধ্যে এক কোটি সাতাইশ লক্ষ টাকা ছাত্রদিগের প্রদত্ত বেতনে ও ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যক্তিগত দান প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হয়। এক কোটি একানব্বই লক্ষ টাকা সরকারী তহবিল হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই সরকারী ব্যয়ের মধ্যে এক কোটি চারি লক্ষ টাকা গবর্নমেন্টের রাজস্ব হইতে প্রদত্ত হয়। ৭৪ লক্ষ টাকা মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে এবং ১৩ লক্ষ টাকা দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজস্ব হইতে লব্ধ হইয়া থাকে।

সমগ্র ভারতে শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা

(১৯০২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত।)

	যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে।	যাহারা ইংরাজি জানে।
হিন্দু	৯৯,২২,২৭৬	৩,৭৫,৪২৯
মুসলমান	১৯,২৭,১৫১	১,০১,৭১৮
শিখ	১,২১,৫২০	৬,৪৫৮
জৈন	৩,২৫,২৯৮	৯,২৮৩
বৌদ্ধ	১৮,৭৯,৮৭৯	১১,১২৬
পার্শী	৩৬,৩৪৩	১৯,৫৯৬

খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী	৪,৩৯,৬১৩	১,৯৪,৩৯৫
অন্যান্য সম্প্রদায়	৩৮,০০০	৩,৩১৪
সমগ্র ভারতে ইংরাজি শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা		১০,২১,৩১৯

সমগ্র ভারতে শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা।

	যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে।	যাহারা ইংরাজি জানে।
হিন্দু	৪,৭৭,৩৮৭	৯,৪৪২
মুসলমান	৯১,০৫৯	১,৬৭৬
শিখ	৭,১১৫	৪১
জৈন	১১,৪৫৫	, , ৮১
বৌদ্ধ	২,০৩,৬৩০	৪৭৪
পার্শী	২৪,৩৬৯	৪,৫১১
খৃষ্টান	১,৭৭,০৩৪	৮৬,৮০৭
সমগ্র ভারতে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সংখ্যা		১,০৩,৯১২

বিদ্যালয়াদির সংখ্যা।

	১৮৯৬ খৃঃ	১৯০০ খৃঃ	১৯০১ খৃঃ
গবর্নমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত	১,১১০	১,০৮০	১,০৭৮
স্থানীয় চাঁদা ও মিউনিসিপাল বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত	১৮,৪০৪	১৭,৬৯৫	১৮,০৮০
মিত্র বা করদ রাজ্য	২,৭৩১	২,৫৭৭	৩,৬৩০
স্থানীয় বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত কিন্তু গবর্নমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত	৬৩,৫৯৮	৬২,৯৬৯	৬২,৯২২
[১৮৯৫ সালে]			
গবর্নমেণ্টের সাহায্যবিহীন	২৪,৬১০	১৯,৫৭৯	১৬,৫৭১ ?
প্রাইভেট	৪৪,৯৩২	৪২,৪৬০	৪৩,১০৬ ?

স্কুল কলেজের সংখ্যা।

	পুরুষের জন্য	স্ত্রীলোকের জন্য	মোট
আর্ট কলেজ	১৩৪	১২	১৪৬
ব্যবসায় শিক্ষা সম্বন্ধীয় কলেজ।	৪৬	—	৪৬
সেকেণ্ডারি স্কুল	৫,০৪৫	৪৬২	৫,৫০৭

প্রাইমারি স্কুল	৯২,৯০২	৫,৬৮০	৯৮,৫৮২
ট্রেনিং স্কুল	১৩৪	৪০	৭৪
মোট সংখ্যা	১,৭০,৯৫৩	৭,৫৯৪	১,৪৮,৫২৫

ছাত্রের সংখ্যা।

	১৮৯২ সালে	১৯০২ সালে ৩১ মার্চ
হিন্দু	২৫,৬১,২৩৬	৩০,১১,২২৭
মুসলমান	৮,৯৪,২৪১	৯,৭৮,৬২১
বৌদ্ধ ইত্যাদি	২,৮৫,৫১৫	৩,৬৮,৫৪৮
দেশীয় খৃষ্টান	৯৮,৪২৩	১,৩১,৮৬৪
বালিকা	১,৬৫,১৫৫	২,১৫,৩৭৪

মোট ছাত্র-সংখ্যা ১৮৯৬ খৃঃ ৪৩,৬৭,৫৫৪ ১৯০১ খৃঃ ৪৫,৯০,৪১২

	১৮৯২ সালে	১৯০১ সালে
গ্রাজুয়েট এবং আণ্ডার গ্রাজুয়েটের সংখ্যা	৫,৬০৯	৮,২৭০

	স্কুলের সংখ্যা	ছাত্রের সংখ্যা
শিল্প-শিক্ষা-বিষয়ক ১৯০১ সালে	৮৪	৪,৯৭৭ ?
বাণিজ্য-শিক্ষা-বিষয়ক	১০	৫৫২
কৃষি-শিক্ষা-বিষয়ক	৪	২১১

রেলের হিসাব।

	মাইল	আরোহীর সংখ্যা
১৮৭৩ সাল পর্যন্ত খোলা হয়	৫,৬৯৭	————
১৮৮০ ”	৯,১৬৭	৪,৯১,৫৫,৩৮০
১৮৮৫ ”	১২,৩৮৫	৮,০৮,৬৪,৭৭৯
১৮৯০ ”	১৬,৯৮৪	১১,৪০,৮২,২৪৬
১৮৯৫ ”	১৯,৭১৮	১৫,৩০,৮১,৪৭৭
১৮৯৯ ”	২৩,৭৮০	১৬,২৯,৪৪,৮৭৬
১৯১২ ”	২৫,৮৯৮	১৯,৬৬,৪০,০০০
১৯০৩ ” ৩১শে ” মার্চ পর্যন্ত	২৬,৪৭৪	————
” ” ব্যয়মঞ্জুর হইয়াছে	২,৩৬৪ মাইল	

১৯০১ সাল পর্যন্ত রেলে মোট ব্যয়—২৪৩,৩৩,৯৭,২৮৯ টাকা
তন্মধ্যে বৈদেশিক কোম্পানীর ১,৭৬,৩৪,৩৫২ ”
দেশীয় রাজ্য-সমূহে ১৭,১৩,৯৫,১১৬ ”

বঙ্গে পাশ্চাত্য বর্গী।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষে ও ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালীর সহিত ইংরাজের কিরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা লর্ড মেকলের নিম্নলিখিত উক্তি পাঠে হৃদয়ঙ্গম হইবে।—

The relations between the Bangalese and the English were such that the English were like wolves and the Bengalese like sheep, or the English were like demons and the Bengalese like men.

অর্থাৎ, ব্যাঘ্রের সহিত মেষের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালীদের সহিত ইংরাজদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল, অথবা বাঙ্গালীরা মানুষ হইলে ইংরাজেরা রাক্ষস বা দানব ছিল বলিতে হয়।

কৃষকের অবস্থা।

মাদ্রাজের কৃষিবিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মিঃ ডবলু আর রবার্টসন সাহেব বলেন,—

The condition of the agricultural labourers in India is a disgrace to any country calling itself civilised.

লর্ড কর্জনের মতে ভারতীয় কৃষকের আয় গড়ে প্রতিজনে বার্ষিক কুড়ি টাকা। এই আয়ে তাহাকে কৃষির ব্যয় নির্বাহ, রাজস্ব-দান ও সম্বৎসরের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হয়। কিন্তু কারাগারস্থিত বন্দীদিগের কেবল খাদ্য-সংগ্রহের জন্য সম্বৎসরে প্রতিজনে কুড়ি টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। সুতরাং ভারতে যাহারা জাল, দস্যুতাদি অপকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া জেলে যায়, তাহাদিগের অপেক্ষা অন্নবস্ত্র-বিষয়ে কৃষকদিগের অবস্থা অধিকতর হীন। কাজেই দশ কোটি লোককে নিত্য অর্দ্ধাশনে কালযাপন করিতে হয়।

ঐতিহাসিক হণ্টার বলেন, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে আকবরের আমলে প্রতি বিঘায় গড়ে চার মণ ত্রিশ সের গোধূম উৎপন্ন হইত। সরকারী রিপোর্টে দৃষ্ট হয়, ইদানীং ঐ প্রদেশে বিঘা প্রতি সাড়ে তিন মণের অধিক ফসল হয় না। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডে সাত মণের অধিক ফসল হয়।

মিশনরিদিগের কুসংস্কার।

জগতে সকল দেশেই মূর্খদিগের জন্য উপকথা দ্বারা ধর্ম শিখান হয়, খৃষ্টানেরা কিন্তু সেই উপকথা মনুষ্যের বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ঐসকল মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে, সে স্বর্গে যায়,—আর যে বিশ্বাস করে না, সে নরকে যায়; ইহাই সঙ্কীর্ণ-চিত্ত খৃষ্টানদিগের মূর্খতামূলক শিক্ষা। মানবজাতি এক মনুষ্য দম্পতির সন্তান, সাপে কথা কয়, মাছের পেটে মানুষ বাস করে, গর্দভে বাক্যালাপ করে, ভূতে শূকরের দেহে প্রবেশ করে, সূর্য গতি-শূন্য হয়, তারা মানুষের মাথায় দাঁড়ায়,—এই সকল গঞ্জিকা-সেবীর কল্পনা-প্রসূত গল্প বাইবেলে ঈশ্বরের তেজে লিপিবদ্ধ আছে—ইহা অনেকে হয়ত জানেন না। অথচ এইরূপ প্রাচীন উপকথা অন্যে বলিলে বা বিশ্বাস করিলে সে মিশনরিদিগের নিকট অসভ্যরূপে পরিগণিত হয়।

সামরিক ব্যয়।

১৮৮৪।৫ সালে	১৬,৯৬,০০,০০০ টাকা
১৮৮৭।৮ "	২০,৪১,০০,০০০ "
১৮৯০।১ "	২০,৬৯,০০,০০০ "
১৮৯৪।৫ "	২৪,০৯,০০,০০০ "
১৯০২।৩ "	২৫,৯১,০০,০০০ "
১৯০৩।৪ "	২৬,৭৮,০০,০০০ "
১৯০৪।৫ (বাজেট আনুমানিক)	২৮,৬৬,০০,০০০ "

স্যার চার্লস ট্রিবেলিয়ান পার্লামেণ্টের আদেশে রচিত ফাইন্যান্স কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদান-কালে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এই ব্যয় সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

We charge Canada, Australia, the Cape of Good Hope and the whole round of British Colonies, nothing, why should we charge India anything? The only real difference is that Canada or Australia would not hear of it; where as India is at our mercy and we can charge her what we like.

উপনিবেশ-সমূহের শাসন-কার্য-পরিদর্শনের জন্য বিলাতে যে "কলোনিয়াল আফিস" আছে, তাহার জন্য বার্ষিক পনের লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই টাকা ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়। কিন্তু ভারতীয় শাসন-কার্য পরিদর্শনের জন্য বিলাতের "ইণ্ডিয়া আফিসে" যে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে তাহার এক কপর্দকও প্রদত্ত হয় না, সমস্তই দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট

ভারতবাসীকে বহন করিতে হয়। ট্রান্সভালের যুদ্ধ-ব্যয় ইংলণ্ডীয় কর-দাতাদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইল, কিন্তু ভারতের সিপাহীবিদ্রোহ দমনের জন্য যে চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা ভারতবাসীর নিকট হইতেই আদায় করা হয়। অথচ, ইংরাজদিগের দোষেই এই বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল।

দেশীয় রাজন্যবৃন্দ।

দেশীয় নরপতিগণের সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ৬৮০; ইহার মধ্যে অনেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের অধিপতি—অনেকের রাজ্য ২।৪খানি গ্রামেই সীমাবদ্ধ। খ্যাতি ও প্রতিপত্তিশালী নরপতিদিগের সংখ্যা ২১৩। ইহাদিগের মধ্যে ১০৫ জন মাত্র কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃত রাজগৌরবের অধিকারী। নিম্নে ৪৪ জন রাজার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তালিকার আকারে প্রকাশ করা হইল। এতদ্ভিন্ন ৩৫ জন ক্ষুদ্র রাজা ১১টি তোপের ও ২৬ জন ৯টি তোপের সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। ছোট বড় কোনও করদ রাজারই কোনও রাজশক্তির সহিত সন্ধি বিগ্রহ করিবার অধিকার নাই। ভারতের বহির্ভূত কোনও রাজ্যে বা পরস্পরের রাজ্যে দূত রাখাও তাঁহাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। গবর্নমেণ্টের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন কোনও ইউরোপীয়কে তাঁহারা দরবারে স্থান দান করিতে পারেন না। রাজ্যশাসনে অমনোযোগী বা যথেচ্ছাচার বলিয়া সন্দেহ হইলে গবর্নমেণ্ট যে কোনও রাজাকে নির্বিচারে পদচ্যুত করিতে পারেন। অধিকাংশ বড় বড় দেশীয় রাজ্যেই আজকাল পাশ্চাত্য আদর্শে প্রধানতঃ কাউন্সিল বা ব্যবস্থাপক ও কার্যকরী সভার সাহায্যে রাজকার্য নির্বাহিত হইয়া থাকে। বৃটিশ ভারতের বিধিব্যবস্থা দেশীয় রাজ্যে প্রচলিত নহে। তত্রত্য বিচারালয় সমূহও বৃটিশ হাইকোর্টের অধীন নহে। কিন্তু পোলিটিক্যাল এজেণ্ট বা রেসিডেণ্ট নামধারী এক এক জন ইংরাজ কর্মচারী গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে সকল দেশীয় রাজ্যেই অবস্থান করেন। ইহাদিগের শক্তি অসীম। দেশীয় রাজন্যদিগকে ইহাদিগের ভয়ে সর্বদা কম্পিত থাকিতে হয়। করদ রাজ্যসমূহের মোট আয় বার্ষিক ২২৪০ কোটি টাকা, সৈন্য-সংখ্যা ৮৫ হাজার। এতদ্ভিন্ন এই সকল রাজ্যে দেশীয় নরপতিগণের ব্যয়ে ১৫ হাজার ইম্পিরিয়াল ট্রুপস (Imperial troops) নামক ভারত গবর্নমেণ্টের খাস সৈন্য পরিপোষিত হইয়া থাকে। দেশীয় সৈন্য অপেক্ষা গবর্নমেণ্ট সেনা উৎকৃষ্টতর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকে।

দেশীয় রাজগণের তালিকা।

	রাজ্যের পরিমাণ বর্গ মাইল	লোক-সংখ্যা	রাজস্ব টাকা
সম্মানচিহ্ন—২১ তোপ			
বরোদার মহারাজ (গয়কোয়াড়) জি.সি.এস.আই.	৮,০৯৯	১৯,৫২,৬৯২	১,২৩,০০,০০০
হায়দ্রাবাদের নিজাম জি.সি.বি, সি.এস.আই	৮২,৬৯৮	১,১১,৪১,১৪২	৩,৬০,০০,০০০
মহীশূরের মহারাজ	২৯,৪৪৪	৫৫,৩৯,৩৯৯	১,৮৭,৮০,০০০
—১৯ তোপ			
ভূপালের বেগম (কিংবা নবাব)	৬,৯৯৭	৬,৬৫,৯৬১	২৫,০৫,০০০
গোয়ালিয়রের মহারাজ (সিন্ধিয়া) জি সি.এস.আই., জি.সি.ভি.ও., এ.ডি.সি	২৯,০৪৭	২৯,৩৩,০০১	১,৩৭,৮৫,০০০
ইন্দোরের মহারাজ (হোলকার)	৯,৫০০	৮,৫০,৬৯০	৭৬,৫০,০০০
জম্মু এবং কাশ্মীরের মহারাজ জি.সি এস.আই.	৮০,৯০০	২৯,০৫,৫৭৮	৭৫,৯০,০০০
কালাটের খাঁ জি.সি.আই.ঈ.	৯০,০০০	৫,০৭,৪৭২	৭১,০৫,০০০
কোল্হাপুরের রাজা জি.সি.এস.আই, জি.সি.ভি.ও.	২,৮৫৫	৯,১০,০১১	৪৮,৪৫,০০০
মেওয়াড়ের মহারাণা (উদয়পুর) জি.সি এস.আই.	১২,৭৫৩	১০,১৮,৮০৫	১৯,৯৫,০০০
ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ জি.সি.এস.আই জি সি.আই.ঈ.	৬,৭৩০	২৯,৫১,০৩৮	৯৪,২০,০০০
—১৭ তোপ			
ভাওয়ালপুরের নবাব	১৫,০০০	৭,২০,৮৭৭	২৪,০০,০০০
ভরতপুরের মহারাজ	১,০৯২	৬,২৬,৬৬৫	৩৬.৬০,০০০
বিকানিরের মহারাজ কে.সি.আই ঈ	২৩,৩১১	৫,০৪,৬২৭	১৯,৯৫,০০০

	রাজ্যের পরিমাণ বর্গ মাইল	লোক-সংখ্যা	রাজস্ব টাকা
বুন্দির মহারাও রাজা জি.সি.আই.ঈ. কে.সি.এস.আই	২,২২০	১,৭১,২২৭	৭,৯৫,০০০
কোচিনের রাজা জি.সি.এস.আই.	১,৩৬২	৮,১২,০২৫	২১,৪৫,০০০
জয়পুরের মহারাজ জি.সি.এস.আই. জি.সি.আই.ঈ.	১৫,৫৭৯	২৬,৫৮,৬৬৬	৬২,১০,০০০
কেরোলির মহারাজ জি.সি আই.ঈ.	১,২৪২	১,৫৬,৭৮৬	৫,১০,০০০
কোটার মহারাও কে.সি.এস.আই.	৫,৬৮৪	৫,৪৪,৮৭৯	২৮,২০,০০০
কচ্ছের রাও জি.সি.আই.ঈ.	৬,৫০০	৪,৮৮,০২২	৩০,৪৫,০০০
মাড়োয়ারের (যোধপুর) মহারাজ	৩৪,৯৬৩	১৯,৩৫,৫৬৫	৪৯,৯৫,০০০
পাতিয়ালার মহারাজ	৫,৪১২	১৫,১৬,৬৯২	৫১,৬৫,০০০
রেওয়ার মহারাজ জি.সি.এস.আই.	১২,৬৭৬	১৩,২৫,৩০৭	১৮,০০,০০০
টঙ্কের নবাব জি সি.আই.ঈ.	২,৫৫৩	২,৭৩,২০১	১৫,০০,০০০
—১৫ তোপ			
আলোয়ারের মহারাজ	৩,১৪১	৮,২৮,৬৮৭	৩০,০০,০০০
বাঁশওয়াড়ার মহারাওয়াল	১,৯৪৬	১,৬৫,৩৫০	১,২৫,০০০
দতিয়ার মহারাজ কে.সি.এস.আই	৯১২	১,৭৩,৭৫৯	৪,০৫,০০০
দেওয়াসের বড় তরফ	৪৪৬	৬২,৩১২	৬০,০০০
দেওয়াসের ছোট তরফ	৪৪০	৫৪,৯০৪	৬০,০০০
ধারা নগরীর রাজা	১,৭৩৯	১,৪২,৭১৫	৮,৬৫,০০০
ঢোলপুরের মহারাজ রাণা	১,১৫৫	২,৭০,৯৭৩	৯,৯০,০০০
ডুঙ্গরপুরের মহারাওয়াল	১,৪৪৭	১,০০,১০৩	১,৩৫,০০০

	রাজ্যের পরিমাণ বর্গ মাইল	লোক-সংখ্যা	রাজস্ব টাকা
ইদরের মহারাজ জি সি.এস.আই. কে.সি.বি., এ.ডি সি.	১,৯০০	১,৬৮,৫৫৭	৪,৯৫,০০০
জসলমিরের মহারাওয়াল	১৬,০৬২	৭৩,৩৭০	১,০৫,০০০
খয়েরপুরের মির জি.সি.আই.ঈ.	৬,১০৯	১,৯৯,৩১৩	১২,৬০,০০০
কিষণগড়ের মহারাজ	৮৫৮	৯০,৯৭০	৫,৫৫,০০০
ওরছার মহারাজ জি.সি.আই.ঈ.	২,০৮০	৩,২১,৬৩৪	২,০০,০০০
প্রতাপগড়ের মহারাওয়াল	৮৮৬	৫২,০২৫	১,৮০,০০০
সিকিমের মহারাজ	২,৮১৮	৫৯,০১৪	৬০,০০০
সিরোহির মহারাও জি.সি.আই.ঈ. কে.সি.এস.আই.	১,৯৬৪	১,৫৪,৫৪৪	৩,৬০,০০০
—১৩ তোপ			
জাওরার নবাব	৬০৬	৮৪,১৮৫	৯৯,৬০,০০০
কুচবিহারের মহারাজ জি.সি.আই.ঈ. সি.বি	১,৩০৭	৫,৬৬,৯৭৪	২২,২০,০০০
রামপুরের নবাব	৮৯৩	৫,৩৩,২১২	৩১,৯৫,০০০
ত্রিপুরার রাজা	৪,০৮৬	১,৭৩,৬২৫	৬,৬০,০০০

নেপালের বর্তমান স্বাধীন নরপতির নাম—মহারাজাধিরাজ পৃথিবী-বীর-বিক্রম জঙ্গ বাহাদুর সাহেব বাহাদুর সমশের জঙ্গ। নেপাল রাজ্যের দৈর্ঘ্য ৫ শত মাইল, মোট পরিমাণ ৫৪ হাজার বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধ কোটি, রাজস্ব দেড় কোটি মুদ্রা, সৈন্য সংখ্যা ৩৫ হাজার, তোপের সংখ্যা ১ হাজার, বৃটিশ রাজ্যে সম্মানের তোপ ২১টি।

লবণের রাজস্ব।

স্বাস্থ্যের জন্য লবণের প্রয়োজনীয়তা কতদূর, তাহা শুধু যে চিকিৎসকের উক্তিমূলক ও বৈজ্ঞানিক মতানুসারে স্থিরীকৃত, তাহা নহে। কার্যক্ষেত্রে আমরা ইহার প্রমাণও যথেষ্ট পাইয়াছি। রাজপুতনার লবণময় হ্রদের সমীপে গবর্নমেণ্ট প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, চারিদিকে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব-সত্ত্বেও ঐসকল হ্রদের

উপকূলে উক্ত সংক্রামক রোগের চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হয় নাই। লবণ ব্যবহারের প্রাচুর্য যে এই সুফলের কারণ, গবর্নমেন্টকে তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। এমন প্রয়োজনীয় দ্রব্য যদি শুল্ক রাজস্বের জন্য অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় হইতেছে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। (হিতবাদী)

I believe, myself, that a great deal of the loss of cattle from murrain in India has arisen from want of salt. I have a very strong opinion on the subject.—Lord Lawrence.

দেশের আয়-ব্যয়।

সরকারি পক্ষসমর্থক মিঃ জে. এম. ম্যাকলীন বলেন—

It is literally true that at the present moment out of the fifty millions of nett revenue of India, half comes, to England to pay the Home Charges, while probably another third is spent on the army, which is mainly employed in guarding the frontier. Very little of the Indian revenue is spent in fact in India at all.